গ্রন্থাবলী সিরিজ

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

(নবম ভাগ)

১। ধর্ম্মতত্ত্ব, ২। বিবিধ প্রবন্ধ, ৩। সাম্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত



শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

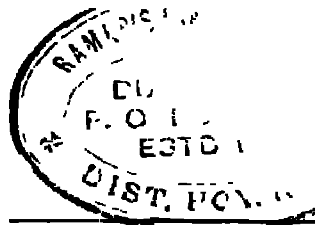
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[মূল্য ১৷০ টাকা

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

অনুশীলন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত



ভূমিকা

গ্রন্থের ভূমিকায় যে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সকলই আমি গ্রন্থের মধ্যে বলিয়াছি। যাহারা কেবল ভূমিকা দেখিয়াই পুস্তক পাঠ করা না করা স্থির করেন, তাঁহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করার সম্ভাবনা অল্প। এজন্য ভূমিকায় আমার অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিশেষ গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়ই একপ্রকার ভূমিকা মাত্র। আমার কথিত অনুশীলনতত্ত্বের প্রধান কথা যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। অন্য ভূমিকায় কোন ফল নাই।

এই দশ অধ্যায় নীরস এবং মধ্যে মধ্যে দুরূহ, এই দোষ স্বীকার করাই আমার এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীরস ও দুরূহ। শ্রেণীবিশেষের পাঠক, সপ্তম অধ্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন।

প্রধানতঃ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এজন্য সকল কথা সকল স্থানে বিশদ করিয়া বুঝান যায় নাই, এবং সেই জন্য স্থানে স্থানে ইংরেজি ও সংস্কৃতের অনুবাদ দেওয়া যায় নাই।

এই গ্রন্থের কিয়দংশ নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়।

—:০:—

দুঃখ কি ?

গুরু। বাচস্পতি মহাশয়ের সংবাদ কি, তাঁর পীড়া কি সারিয়াছে ?

শিষ্য। তিনি ত কাশী গেলেন।

গুরু। কবে আসিবেন ?

শিষ্য। আর আসিবেন না। একেবারে দেশ-ত্যাগী হইলেন।

গুরু। কেন ?

শিষ্য। কি সুখে আর থাকিবেন ?

গুরু। দুঃখ কি ?

শিষ্য। সবই দুঃখ—দুঃখের বাকি কি ? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি, ধর্ম্মেই সুখ। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। অথচ তাঁহার মত দুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত।

গুরু। হয় তাঁর কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্ম্মিক নন।

শিষ্য। তাঁর কোন দুঃখ নাই ? সে কি কথা ? তিনি চিরদরিদ্র, অন্ন চলে না। তার পর এই কঠিন রোগে ক্লিষ্ট, আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে বলে ?

গুরু। তিনি ধার্ম্মিক নহেন।

শিষ্য। সে কি ? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ এ সকলই অধর্ম্মের ফল ?

গুরু। তা বলি।

শিষ্য। পূর্ব্বজন্মের ?

গুরু। পূর্ব্বজন্মের কথায় কাজ কি ? এ জন্মেরই অধর্ম্মের ফল।

শিষ্য। আপনি কি ইহাও মানেন যে, এ জন্মে আমি অধর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া আমার রোগ হয় ?

গুরু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মান না যে, হিম লাগাইলে সর্দ্দি হয়, কি গুরুভোজন করিলে অজীর্ণ হয় ?

শিষ্য। হিম লাগান কি অধর্ম্ম ?

গুরু। অন্য ধর্ম্মের মত একটা শারীরিক ধর্ম্ম আছে। হিম লাগান তাহার বিরোধী, এই জন্য হিম লাগান অধর্ম্ম।

শিষ্য। এখানে অধর্ম্ম মানে hygiene ?

গুরু। যাহা শারীরিক নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা শারীরিক অধর্ম্ম।

শিষ্য। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তিতা আর নিয়মাতিক্রম ?

গুরু। ধর্ম্মাধর্ম্ম অত সহজে বুঝিবার কথা নহে। তাহা হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিকের হাতে রাখিলেই চলিত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বলিলেই চলিতে পারে।

শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাচস্পতির দারিদ্র্য-দুঃখ কোন্ পাপের ফল ?

গুরু। দারিদ্র্য-দুঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা যাউক। দুঃখটা কি ?

শিষ্য। খাইতে পায় না।

গুরু। বাচস্পতির সে দুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। কেন না, বাচস্পতি খাইতে না পাইলে এত দিন মরিয়া যাইত।

শিষ্য। মনে করুন, সপরিবারে বুকড়ি চালের ভাত আর কাঁচকলা ভাতে খায়।

গুরু। তাহা যদি শরীরপোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দুঃখ বটে। কিন্তু যদি শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে দুঃখ বোধ করা ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ। পেটুক অধার্ম্মিক।

শিষ্য। ছেঁড়া কাপড় পরে।

গুরু। বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হইলেই ধার্ম্মিকের পক্ষে যথেষ্ট। শীতকালে শীতনিবারণও চাই। তাহা

মোটা করলেও হয়। তাহা বাচস্পতির ঘুটে না কি?

শিষ্য। ঘুটিতে পারে। কিন্তু তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়।

গুরু। শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম। যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধার্ম্মিক। আমি এমন বলিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে ধনোপার্জ্জনে যত্নবান্, সে অধার্ম্মিক। বরং যে সমাজে থাকিয়া ধনোপার্জ্জনে যথাবিহিত যত্ন না করে, তাহাকে অধার্ম্মিক বলি। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে দারিদ্র্য-পীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা এবং কুবাসনা—অর্থাৎ অধর্ম্মের সংস্কার তাহাদিগের কষ্টের কারণ। অনুচিত ভোগলালসা অনেকের দুঃখের কারণ।

শিষ্য। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ?

গুরু। অনেক—কোটি কোটি। যাহারা শরীররক্ষার উপযোগী অন্নবস্ত্র পায় না—আশ্রয় পায় না—তাহারা যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বটে।

শিষ্য। এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের এই জন্মকৃত অধর্ম্মের ভোগ?

গুরু। অবশ্য। *

শিষ্য। কোন্ অধর্ম্মের ভোগ দারিদ্র্য?

গুরু। ধনোপার্জ্জনের উপযোগী অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার সংগ্রহের উপযোগী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। যাহারা তাহার সম্যক্ অনুশীলন করে নাই বা সম্যক্ পরিচালনা করে না, তাহারাই দরিদ্র।

শিষ্য। তবে বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম্ম।

গুরু। ধর্ম্মতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব, তাহা এত অল্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু মনে কর, যদি তাই বলা যায়?

শিষ্য। এ যে বিলাতী Doctrine of Culture!

গুরু। Culture বিলাতী জিনিস নহে। ইহা হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ।

শিষ্য। সে কি কথা? Culture শব্দের একটা প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় নাই।

গুরু। আমরা কথা খুঁজিয়া মরি, আসল জিনিসটা খুঁজি না, তাই আমাদের এমন দশা। বিজাতির চতুরাশ্রম কি মনে কর?

শিষ্য। System of Culture?

গুরু। এমন যে তোমার Matthew Arnold প্রভৃতি বিলাতী অনুশীলনবাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ। সধবার পতিদেবতার উপাসনায়, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে, সমস্ত ব্রতনিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, এই অনুশীলনতত্ত্ব অন্তর্নিহিত। যদি এই তত্ত্ব কখন তোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা এই অনুশীলনতত্ত্বের উপর গঠিত।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট অনুশীলন-তত্ত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু আমি যতদূর বুঝি, পাশ্চাত্য অনুশীলনতত্ত্ব ত নাস্তিকের মত। এমন কি, নিরীশ্বর কোম্‌ৎধর্ম্ম অনুশীলনের অনুষ্ঠানপদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়।

গুরু। এ কথা অতি যথার্থ। বিলাতী অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর, এইজন্য উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত অথবা উহা অসম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর—ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অনুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বর-পাদপদ্মেই সমর্পিত।

শিষ্য। কেন না, উদ্দেশ্য মুক্তি। বিলাতী অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য সুখ। এই কথা কি ঠিক?

গুরু। সুখ ও মুক্তি, পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত কি না? মুক্তি কি সুখ নয়?

শিষ্য। প্রথমতঃ মুক্তি সুখ নয়—সুখদুঃখ মাত্রেরই অভাব। দ্বিতীয়তঃ মুক্তি যদিও সুখবিশেষ বলেন, তথাপি সুখমাত্র মুক্তি নয়। আমি দুইটা মিঠাই খাইলে সুখী হই, আমার কি তাহাতে মুক্তিলাভ হয়?

গুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে। সুখ এবং মুক্তি এই দুইটা কথা আগে বুঝিতে হইবে, নহিলে অনুশীলনতত্ত্ব বুঝা যাইবে না। আজ আর সময় নাই—আইস, একটু ফুলগাছে জল দিই, সন্ধ্যা হইল। কাল সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাইবে।

---

* মানুষের যে সকল সুখ-দুঃখ আছে, মানুষের স্বকৃত কর্ম্ম ভিন্ন তাহার অন্য কারণও আছে। সে কথা স্থানান্তরে বলিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:*:—

সুখ কি?

শিষ্য। কাল আপনার কথায় এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি-সকলের সম্যক্ অনুশীলনের অভাবই আমাদের দুঃখের কারণ। বটে?

গুরু। তার পর?

শিষ্য। বলিয়াছি যে, বাচস্পতির নির্ব্বাসনের একটি কারণ এই যে, তাঁহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। আগুন কাহার দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না—কিন্তু বাচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। তাঁহার কোন্ অনুশীলনের অভাবে গৃহ দগ্ধ হইল?

গুরু। অনুশীলনতত্ত্বটা না বুঝিয়াই আগে হইতে কি প্রকারে সে কথা বুঝিবে? সুখদুঃখ মানসিক অবস্থা মাত্র—সুখদুঃখের কোন বাহ্য অস্তিত্ব নাই। মানসিক অবস্থামাত্রেই যে সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের অধীন, তাহা তুমি স্বীকার করিবে * এবং ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, মানসিক শক্তিসকলের যথাবিহিত অনুশীলন হইলে গৃহদাহ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে—হইবে না। কি ভয়ানক!

গুরু। সচরাচর যাহাকে বৈরাগ্য বলে, তাহা ভয়ানক ব্যাপার হইলে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার কথা হইতেছে কি?

শিষ্য। হইতেছে বৈ কি! হিন্দুধর্ম্মের টান সেই দিকে। সাংখ্যকার বলেন, তিন প্রকার দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি পরমপুরুষার্থ। তার পর আর এক স্থানে বলেন যে, সুখ এত অল্প যে, তাহাও দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করিবে। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ সব ত্যাগ করিয়া জড়পিণ্ডে পরিণত হও। আপনার শীতোষ্ণ ধর্ম্মও তাই বলেন। শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বসকল তুল্য জ্ঞান করিবে। যদি সুখে সুখী না হইবে—তবে জীবনে কাজ কি? যদি ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সুখ-পরিত্যাগ, তবে আমি সে ধর্ম্ম চাই না, এবং অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য যদি ঈদৃশ ধর্ম্মই হয়, তবে আমি অনুশীলনতত্ত্ব শুনিতে চাই না।

গুরু। অত রাগের কথা কিছু নাই—আমার এই অনুশীলনতত্ত্বে তোমার দুইটা মিঠাই খাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি হইবে না—বরং বিধিই থাকিবে। সাংখ্য-দর্শনকে তোমাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বসম্বন্ধীয় যে উপদেশ, তাহারও এমন অর্থ নহে যে, মনুষ্যের সুখভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। উহার অর্থ কি, তাহার কথায় এখন কাজ নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, বিলাতী অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ, ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য মুক্তি। আমি তদুত্তরে বলি, মুক্তি সুখের অবস্থাবিশেষ। সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ। যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্যও সুখ।

শিষ্য। অর্থাৎ ইহাকালে দুঃখ ও পরকালে সুখ।

গুরু। না, ইহকালে সুখ ও পরকালে সুখ।

শিষ্য। কিন্তু আমার আপত্তির উত্তর হয় নাই—আমি ত বলিয়াছিলাম যে, জীব মুক্ত হইলে সে সুখ-দুঃখের অতীত হয়। সুখশূন্য যে অবস্থা, তাহাকে সুখ বলিব কেন?

গুরু। এই আপত্তি-খণ্ডন জন্য, সুখ কি ও মুক্তি কি, তাহা বুঝা প্রয়োজন। এখন মুক্তির কথা থাক। আগে সুখ কি, তাহা বুঝিয়া দেখা যাক।

শিষ্য। বলুন।

গুরু। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, দুইটা মিঠাই খাইতে পাইলে তুমি সুখী হও। কেন সুখী হও, তাহা বুঝিতে পার?

শিষ্য। আমার ক্ষুধানিবৃত্তি হয়।

গুরু। এক মুঠা শুক্না চাউল খাইলেও তাহা হয়—মিঠাই খাইলে ও শুক্না চা'ল খাইলে কি তুমি তুল্যসুখী হও?

শিষ্য। না, মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই।

গুরু। তাহার কারণ কি?

শিষ্য। মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মনুষ্যরসনার এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, সেই সম্বন্ধ জন্যই মিষ্ট লাগে।

গুরু। মিষ্ট লাগে, সে জন্য বটে, কিন্তু তাহা

---

* সত্য বটে যে, সুখদুঃখের বাহ্য অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, উভয়ই বাহ্য অস্তিত্বযুক্ত কারণের অধীন। তাহা হইলেও সুখদুঃখরূপ মানসিক অবস্থা যে অনুশীলনের অধীন, এ কথা অপ্রমাণ হইতেছে না।

ত জিজ্ঞাসা করি নাই। মিঠাই খাওয়ায় তোমার সুখ কি জন্য? মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই। তুমি একজন আসল বিলাতী সাহেবকে একটা বড়-বাজারের সন্দেশ কি মিহিদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, তুমি একটুকরা রোষ্ট্ বীফ খাইয়া সুখী হইবে না। "রবিন্সন্ ক্রুশো" গ্রন্থের ফ্রাইডে নামক বর্ব্বরকে মনে পড়ে? সেই আম-মাংসভোজী বর্ব্বরের মুখে সলবণ সুসিদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা রসনার সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধ বশতঃ নহে। তবে কি?

শিষ্য। অভ্যাস।

গুরু। তাহা না বলিয়া অনুশীলন বল।

শিষ্য। অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক?

গুরু। এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে, অভ্যাস না বলিয়া অনুশীলনই বল।

শিষ্য। উভয়ে প্রভেদ কি?

গুরু। এখন তাহা বুঝাইবার সময় নহে। অনুশীলনতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাহা বুঝিতে পারিবে না। তবে কিছু শুনিয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে? কখন সুখদ হয় কি?

শিষ্য। বোধ করি, কখন সুখদ হয় না। কিন্তু ক্রমে তিক্ত সহ্য হইয়া যায়।

গুরু। সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শক্তির অনুকূল, অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা। এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। এখানে তোমার চেষ্টা স্বাভাবিকী রসাস্বাদিনী শক্তির অনুকূল, এজন্য তোমার সে শক্তি অনুশীলিত হইয়াছে—মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। ঐরূপ অনুশীলনবলে তুমি, রোষ্ট বীফ খাইয়াও সুখী হইতে পার। অন্যান্য ভক্ষ্য-পেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ।

এ গেল একটা ইন্দ্রিয়ের সুখের কথা। আমাদের আর আর ইন্দ্রিয় আছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনেও ঐরূপ সুখোৎপত্তি।

কতকগুলি শারীরিক শক্তিবিশেষের নাম দেওয়া গিয়াছে—ইন্দ্রিয়। আরও অনেকগুলি শারীরিক শক্তি আছে। যথা—শীতবাতের তাপবোধ হয় যে শক্তির অনুশীলনে, তাহাও শারীরিক শক্তি। সাহেবেরা তাহার নাম দিয়াছেন muscular sense। এইরূপ আর আর শারীরিক শক্তি আছে। এ সকলের অনুশীলনেও ঐরূপ সুখ।

তা ছাড়া আমাদের কতকগুলি মানসিক শক্তি আছে। সেগুলির অনুশীলনের যে ফল, তাহাও সুখ। ইহাই সুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সুখ নাই। ইহার অভাব দুঃখ। বুঝিলে?

শিষ্য। না। প্রথমতঃ শক্তি কথাটাতেই গোল পড়িতেছে। মনে করুন, দয়া আমাদিগের মনের একটি অবস্থা। তাহার অনুশীলনে সুখ আছে। কিন্তু আমি কি বলিব যে, দয়া-শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে?

গুরু। শক্তি কথাটা গোলের বটে। তৎপরিবর্ত্তে অন্য শব্দের আদেশ করার প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই। আগে জিনিসটা বুঝ, তার পর যাহা বলিবে, তাহাতেই বুঝা যাইবে। শরীর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে, এবং কাজেই সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাদনকারিণী বিশেষ বিশেষ শক্তি কল্পনা করা অবৈজ্ঞানিক হয় না। কেন না, আদৌ এই সকল শক্তির মূল এক হইলেও কার্য্যতঃ ইহাদিগের পার্থক্য দেখিতে পাই। যে অন্ধ, সে দেখিতে পায় না, কিন্তু শব্দ শুনিতে পায়, যে বধির, সে শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু চক্ষুতে দেখিতে পায়, কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না, কিন্তু সে হয় ত সুকল্পনা-বিশিষ্ট কবি। আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বড় মেধাবী। কেহ ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য, কিন্তু লোককে দয়া করে, আবার নির্দ্দয় লোককেও ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে। * সুতরাং দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে কতকগুলি শক্তি, যথা—স্নেহ, দয়া ইত্যাদিকে শক্তি বলা ভাল শুনায় না। কিন্তু অন্য ব্যবহার্য্য শব্দ কি আছে?

শিষ্য। ইংরেজি শব্দটা faculty, অনেক বাঙ্গালী লেখক বৃত্তি শব্দের দ্বারা তাহার অনুবাদ করিয়াছেন।

গুরু। পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে বৃত্তি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত। বৃত্তি শব্দ চলিয়াছে।

---

* উদাহরণ—বিলাতের সপ্তদশ শতাব্দীর Puritan সম্প্রদায়। অপিচ, Inquisition অধ্যক্ষেরা।

গুরু। তবে বৃত্তিই চালাও। বুঝিলেই হইল। যখন তোমরা morals অর্থে "নীতি" শব্দ চালাইয়াছ, Science অর্থে "বিজ্ঞান" চালাইয়াছ, তখন faculty অর্থে বৃত্তি শব্দ চালাইলে দোষ ধরিব না।

শিষ্য। তার পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি বলিলেন, বৃত্তির অনুশীলনে সুখ—কিন্তু জল বিনা তৃষ্ণার অনুশীলনে দুঃখ।

গুরু। রও। বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি, চরমে পরিণতাবস্থা, তার পর উদ্দিষ্ট বস্তুর সম্মিলনে পরিতৃপ্তি। এই স্ফূর্ত্তি এবং পরিতৃপ্তি উভয়ই সুখের পক্ষে আবশ্যক।

শিষ্য। ইহা যদি সুখ হয়, তবে বোধ হয়, এরূপ সুখ মনুষ্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে।

গুরু। কেন?

শিষ্য। ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনুশীলনে ও পরিতৃপ্তিতে সুখ। তাই কি তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত?

গুরু। না, তাহা নহে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-প্রবলতাহেতু মানসিক বৃত্তিসকলের অস্ফূর্ত্তি এবং ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে স্থূল নিয়ম হইতেছে সামঞ্জস্য। ইন্দ্রিয় সকলেরও সম্পূর্ণ বিলোপ ধর্ম্মানুমত নহে। তাহাদের সামঞ্জস্যই ধর্ম্মানুমত। বিলোপে ও সংযমে অনেক প্রভেদ। সে কথা পশ্চাৎ বুঝাইব। এখন স্থূল কথাটা বুঝিয়া রাখ যে, বৃত্তি সকলের অনুশীলনের স্থূল নিয়ম পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্য কি, তাহা সবিস্তারে একদিন বুঝাইব। এখন কথাটা এই বুঝাইতেছি যে, সুখের উপাদান কি?

প্রথম। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অনুশীলন। তজ্জনিত স্ফূর্ত্তি, অবস্থার উপযোগী প্রয়োজনসিদ্ধি ও পরিণতি।

দ্বিতীয়। সেই সকলের পরস্পর অবস্থোপযোগী সামঞ্জস্য।

তৃতীয়। তাদৃশ অবস্থার কার্য্যসাধন দ্বারা সেই সকলের পরিতৃপ্তি।

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই। আমি সময়ান্তরে তোমাকে বুঝাইতে পারি, যোগীর যোগজনিত যে সুখ, তাহাও ইহার অন্তর্গত। ইহার অভাবই দুঃখ। সময়ান্তরে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি যে, বাচস্পতির গৃহদাহজনিত যে দুঃখ অথবা তদপেক্ষাও হতভাগ্য ব্যক্তির পুত্রশোকজনিত যে দুঃখ, তাহাও এই দুঃখ। আমার অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিলে তুমি আপনি তাহা বুঝিতে পারিবে, আমাকে বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। মনে করুন, তাহা যেন বুঝিলাম, তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বুঝিলাম না। কথাটা এই হইতেছিল যে, আমি বলিয়াছিলাম যে, বাচস্পতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি, তথাপি দুঃখী। আপনি বলিলেন যে, যখন সে দুঃখী, তখন সে কখনও ধার্ম্মিক নহে।* আপনার কথা প্রমাণ করিবার জন্য আপনি সুখ কি, তাহা বুঝাইলেন, এবং সুখ বুঝাতে বুঝিলাম যে, দুঃখ কি। ভাল, তাহাতে যেন বুঝিলাম যে, বাচস্পতি যথার্থ দুঃখী নহেন, অথবা তাঁহাকে যদি দুঃখী বলা যায়, তবে তিনি নিজের দোষে অর্থাৎ নিজ শারীরিক বা মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ত্রুটি করাতে এই দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কিছুই বুঝা গেল না যে, তিনি অধার্ম্মিক। এ অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, তাহা ত কিছুই বুঝা গেল না। যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে সে এই যে, অনুশীলনই ধর্ম্ম।

গুরু। এক্ষণে তাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর কথা আছে, তাহা না বুঝাইলে অনুশীলনের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু সেটা আমাকে সর্ব্বশেষে বলিতে হইবে, কেন না, অনুশীলন কি, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে, সে তত্ত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

শিষ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম্ম। এ সকল নূতন কথা।

গুরু। নূতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:o:—

ধর্ম্ম কি?

শিষ্য। অনুশীলনকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। অনুশীলনের ফল সুখ, ধর্ম্মের ফলও কি সুখ?

গুরু। না ত কি ধর্ম্মের ফল দুঃখ? যদি তা

---

* পূর্ব্বপুরুষকৃত কর্ম্মের ফলাফল বাদ দিয়া এ কথা বলিতে হয়, দেশকালপাত্রভেদ বাদ দিয়াও এ কথা বলিতে হয়। সে সকল কথার মীমাংসা দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব জটিল করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই।

হইত, তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত লোককে ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম।

শিষ্য। ধর্মের ফল পরকালে সুখ—হইতে পারে; কিন্তু ইহকালেও কি তাই?

গুরু। তবে বুঝাইলাম কি! ধর্মের ফল ইহকালে সুখ, ও যদি পরকাল থাকে, তবে পরকালেও সুখ। ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্য উপায় নাই।

শিষ্য। তথাপি গোল মিটিতেছে না। আমরা বলি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম,বৌদ্ধধর্ম,বৈষ্ণবধর্ম—তৎপরিবর্তে কি খ্রীষ্টীয় অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে পারি?

গুরু। ধর্ম কথাটার অর্থটা উল্টাইয়া দিয়া তুমি গোলযোগ উপস্থিত করিলে। ধর্ম শব্দটা নানাপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। * তুমি যে অর্থে এখন ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিলে,উহা, ইংরেজি Religion শব্দের আধুনিক তর্জমা মাত্র, দেশীয় জিনিস নহে।

শিষ্য। ভাল, religion কি,তাহাই না হয় বুঝান।

গুরু। কি জন্য? religion পাশ্চাত্য শব্দ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহা নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন। কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না। †

শিষ্য। কিন্তু রিলিজনের ভিতরে এমন কি নিত্য বস্তু কিছুই নাই, যাহা সকল রিলিজনে পাওয়া যায়?

গুরু। আছে। কিন্তু সেই নিত্য পদার্থকে রিলিজন বলিবার প্রয়োজন নাই; তাহাকে ধর্ম বলিলে আর কোন গোলযোগ হইবে না।

শিষ্য। তাহা কি?

গুরু। সমস্ত মনুষ্যজাতি—কি খ্রীষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই পক্ষে যাহা ধর্ম।

শিষ্য। কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়?

গুরু। মনুষ্যের ধর্ম কি, তাহার সন্ধান করিলেই পাওয়া যায়।

শিষ্য। তাহাই ত জিজ্ঞাস্য।

গুরু। যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ—না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়—তাহাই মানুষের ধর্ম।

শিষ্য। তাহার নাম কি?

গুরু। মনুষ্যত্ব।

* ক চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

† খ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

চতুর্থ অধ্যায়।

—:০:—

মনুষ্যত্ব কি?

শিষ্য। কাল আপনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ হয়, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম। এ একটা কথার মার-পেঁচ বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না, মানুষ জন্মিলেই মানুষ,মরিলেই আর মানুষ নয়—ভস্মরাশি, ধূলারাশি মাত্র। অতএব আমি বলিব যে, জীবন থাকিলেই মানুষ মানুষ, নহিলে মানুষ মানুষ নয়। বোধ, হয়, তাহা আপনার উদ্দেশ্য নহে।

গুরু। দুগ্ধপোষ্য শিশুরও জীবন আছে, সে কি মানুষ?

শিষ্য। নয় কেন? কেবল বয়স কম। ছোট মানুষ।

গুরু। মানুষে যা পারে, সে সব পারে?

শিষ্য। কোন মনুষ্যই কি তা পারে? ঐ ভারীর কাঁধে যে জলের ভার, তাহা মনুষ্য বহিতেছে। উক্তলিজ বা লিউথেনের রণজয় মনুষ্যে করিয়াছিল। লিয়র বা কুমারসম্ভব মনুষ্যে প্রণীত করিয়াছে। আপনি মনুষ্য—আপনি কি এ সকল পারেন? অথবা অন্য কোন মনুষ্যের নাম করিতে পারেন যে, এই সকল কার্য্যগুলিই পারে?

গুরু। আমি পারি না। আমি এমন কোন মানুষের নাম করিতে পারিতেছি না, যে পারে। তবে এ কথা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি যে, কোন মনুষ্য কখন জন্মিবে না,যে একা এ সকল কাজ পারিবে না; অথবা এমন কোন মনুষ্য কখন জন্মে নাই যে, মনুষ্যের সাধ্য সমস্ত কাজ একা পারিত না।

শিষ্য। পারিত যদি—ত পারে নাই কেন?

গুরু। আপনার ক্ষমতার অনুশীলনের অভাবে।

শিষ্য। ইহাতেও কিছুই বুঝিলাম না, কি থাকিলে মানুষ মানুষ হয়। আপনার শক্তির অনুশীলনে? বর্বর, যাহার কোন শক্তিই অনুশীলিত হয় নাই, তাহাকে কি মানুষ বলিবেন না?

গুরু। এমন কোন বর্বর পাইবে না, যাহার কোন শক্তি অনুশীলিত হয় নাই। প্রস্তরযুগের মানুষদিগেরও কতকগুলি শক্তি অনুশীলিত হইয়াছিল; নহিলে তাহারা পাথরের অস্ত্র গড়িতে পারিত না। তবে কথাটা এই যে, তাহাদের মনুষ্য বলিব কি না?

সে কথার উত্তর দিবার আগে বৃক্ষ কি বুঝাই। মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব কি বুঝ, এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বটগাছ দেখিতেছ—দুইটিই কি একজাতীয়?

শিষ্য। হাঁ, এক হিসাবে একজাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ্।

গুরু। দুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। না; বটকেই বৃক্ষ বলিব—ওটি তৃণ মাত্র।

গুরু। এ প্রভেদ কেন?

শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল এই লইয়া বৃক্ষ। বটের এ সব আছে, ঘাসের এ সব নাই।

গুরু। ঘাসেরও সব আছে—তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত। ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না?

শিষ্য। ঘাস আবার বৃক্ষ?

গুরু। যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া পরিণত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত্ত্ব আছে, একজন হটেণ্টট্ বা চিপেবারও সেইরূপ মনুষ্যত্ব আছে, কিন্তু যে উদ্ভিত্ত্বকে বৃক্ষত্ব বলি,সে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ব মনুষ্যধর্ম্ম, হটেণ্টট বা চিপেবার সে মনুষ্যত্ব নাই।

শিষ্য। বংশ বা বীজ কি তাহার একটা প্রধান কারণ নহে?

গুরু। সে কথা এখন থাক। যাহা অমিশ্র, তাহা বুঝ। তার পর যাহা বিমিশ্র, তাহা বুঝিও। বৃক্ষত্বের উদাহরণ ছাড়িও না, তাহা হইলেই বুঝিবে। ঐ বাঁশঝাড় দেখিতেছ, উহাকে বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। বোধ হয়, বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা ও পল্লব আছে; কিন্তু কৈ? উহার ফুল-ফল হয় না, উহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি নাই, উহাকে বৃক্ষ বলিব না।

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে এক একবার উহার ফুল হয়; ফুল হইয়া ফল হয়, তাহা চালের মত। চালের মত তাহাতে ভাতও হয়।

শিষ্য। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব।

গুরু। অথচ বাঁশ তৃণ মাত্র। একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাঁশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ—মিলিবে। উদ্ভিত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃণশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখ,স্ফূর্ত্তিগুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ, অথচ বাঁশের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি নাই। যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।

শিষ্য। এইরূপ পরিণতি কি ধর্ম্মের আরম্ভ?

গুরু। উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষের পরিণতি কতকগুলি চেষ্টার ফল; লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণে বুঝাইব; তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া বলেন যে, বৃক্ষ আর ঘাস, এই দুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না, হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাহিবে?

শিষ্য। বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল-গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঁটাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব।

গুরু। মূর্খ! তৃণজাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলে অন্নাভাবে মারা যাইবে যে? জান না যে,ধানও তৃণজাতীয়? যে ভাঁটুই দেখিতেছ, উহা ভাল করিয়া দেখিয়া আইস, ধানের পাট হইবার পূর্ব্বে ধানও ঐরূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্য জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। গমও ঐরূপ। যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিক্তস্বাদ কদর্য্য উদ্ভিদ ছিল—কর্ষণে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই; এজন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম Cultnre। এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, "The Substance of Religion is Culture." "মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম।"

শিষ্য। তাহা হউক। স্থূল কথাও কিছুই বুঝিতে পারি নাই—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহাকে বলে?

গুরু। অঙ্কুরের পরিণাম মহামহীরুহ। মাটী খোঁড়, হয় ত একটি অতি ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য অঙ্কুর দেখিতে পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কুর এই প্রকাণ্ড বৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ—কৃষকেরা যাহাকে গাছের পা'ট বলে, তাহা চাই। সরস মাটী চাই—জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই—বৃক্ষের জাতিবিশেষে মাটীতে সার দেওয়া চাই। বেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্কুর বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যেরও এইরূপ।" যে শিশুর কথা বলিলে, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে

অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্ব্বগুণযুক্ত সর্ব্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্ব্বসুখী, সর্ব্বগুণযুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে পারে?

গুরু। কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার। তবে ইহা স্বীকার করিব যে, এ পর্য্যন্ত কেহ হইয়াছে, এমন কথা আমরা জানি না, আর সহসা কেহ হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে আমি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই হইবে যে, লোকে সর্ব্বগুণ অর্জ্জনের জন্য যত্নে বহুগুণ-সম্পন্ন হইতে পারিবে, সর্ব্বসুখলাভের চেষ্টায় বহুসুখ লাভ করিতে পারিবে।

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহাকে বলে, তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ,—এক শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, যথা—হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়; চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক, হৃৎ, বায়ুঃকোষ, অন্ত্র প্রভৃতি জীবনসঞ্চালক প্রত্যঙ্গ, অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শোণিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এ সকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ—

শিষ্য। মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব, এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বাহু বয়োগুণে আপনিই বর্দ্ধিত ও বলশালী হইবে, তাহা ছাড়া আবার কি চাই?

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, তাহার দুইটি কারণ। আমিও সেই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছি। সেই দুইটি কারণ পোষণ ও পরিচালনা। তুমি কোন শিশুর একটি বাহু কাঁধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে পারে। তাহা হইলে ঐ বাহু আর বাড়িবে না, হয় ত অবশ, নয় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না। আবার বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে ঐ হাত অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্তসঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা দৈবকার্য্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। ঊর্দ্ধবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত?

শিষ্য। বুঝিলাম, অনুশীলনগুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহু পরিণতবয়স্ক মানুষের বাহুর বিস্তার, বল ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই হয়। আর কি চাই?

গুরু। তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি তোমার বাহুস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয়াছ যে, এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু ঐ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মত একটি "ক" লিখিতে পারিবে না। তুমি যে না ভাবিয়া, না যত্ন করিয়া অবহেলায় যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন, তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা উহার পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর, ভাবিয়া সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই জন্য সভ্যসমাজে লিপিবিদ্যা বিস্ময়কর অনুশীলন বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই লিপিবিদ্যা ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অনুশীলনফল। দেখ, একটি শব্দ লিখিতে গেলে,—মনে কর, এই অনুশীলন শব্দ লিখিতে গেলে, প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে—বিশ্লেষণে পাইতে হইবে, অ, ন, উ, শ, ঈ, ল, ন। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষদ্রষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে। এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক একটি কাগজে আঁকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শীঘ্র লিখিবে যে, তাহাতে বুঝাইবে যে, তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছ না, অনুশীলনগুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী। অনুশীলনজনিত আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুমি যেমন পাঁচ মিনিটে দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী তেমনই পাঁচ মিনিটে এক কাঠা জমীতে কোদালি দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায়, হয় ত দুই প্রহরেও তাহা পারিয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে তোমার বাহু উপযুক্তরূপে চালিত অর্থাৎ অনুশীলিত হয় নাই,—সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত, সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। আবার একজন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয় ত শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল না।

অনেক গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ সুকণ্ঠ নহে। কিন্তু অনুশীলনগুণে গায়ক সুকণ্ঠ হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে। আবার দেখ—বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ হাঁটিতে পার?

শিষ্য। আমি বড় হাঁটিতে পারি না, বড় জোর এক ক্রোশ।

গুরু। তোমার পদদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই, দেখ, তোমার হাত, পা, গলা তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে—কিন্তু একেরও সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গমাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি না হইলে শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না; কেন না, ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে পুরা টাকাটাতেই কমতি হয়। যেমন শরীর-সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন-সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, সেগুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে। কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জ্জন ও বিচার। কতকগুলির কাজ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়া—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন। এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি।

শিষ্য। অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জ্জুন আর শ্রীরামলক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখনও এরূপ হইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই।

গুরু। যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমন কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা ইতিহাস-পুরাণাদির রচয়িতৃগণের কপোল-কল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগুণ-বর্ণনা যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় যে, এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে। ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা, ইহা বুঝে না, সে টাকার মূল্য-স্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে।

শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ত দেখি না।

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ব্বগুণের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এই জন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে ধর্ম্ম সম্যক্ ধর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, কেন না, যিনি নির্গুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" চৈতন্য অথবা যাহাকে হর্বর্ট স্পেন্সর "Inscrutable power in nature" বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্ম্মের মূল, কেন না, তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে "Impersonal God" বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল; যাঁহাকে "Personal God" বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।

শিষ্য। মানিলাম, সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শস্বরূপ মানিতে হইবে। কিন্তু উপাসনার প্রয়োজন কি?

গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা। তবে বেগারটালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সমাধীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতিঃ আমাদের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার

নির্মলতার মত নির্মলতা, তাঁহার অনুকারী সর্ব্বত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামনা-করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য্যঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব,—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

শিষ্য। আমি এতদিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোঁটা জল তাহাতে গিয়া মিশিব।

গুরু। উপাসনা-তত্ত্বের সার মর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনা-পদ্ধতি একদিকে আত্ম-পীড়নে আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে।

শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। মনুষ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়?

গুরু। এই জন্য ধর্ম্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্ম্মেতিহাসে (Religious History) প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যিশুখ্রীষ্ট খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ এককালে ছিলেন, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ ছিলেন। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকে নাই,—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ। খ্রীষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী, নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা, কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, ইঁহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্মুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা, রাজা হইয়াও পণ্ডিত, শক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমময় চরিত্র কখনও মনুষ্যভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।

শিষ্য। সে কি? কৃষ্ণ?

গুরু। তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন—তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পশ্চাতে ঈশ্বরের সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র কীর্ত্তিত আছে, তাহার কিছুই জান না। তাঁহার শারীরিক বৃত্তি সকল সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত, তাঁহার মানসিক বৃত্তি-সকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন—

> "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ব্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্যস্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন, "বেদে ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম

লোকহিতে"—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, খিশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

পঞ্চম অধ্যায়।

—•—

অনুশীলন।

শিষ্য। অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি।

গুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়াছি কেবল দুইটা কথা ;—(১) মানুষের সুখ মনুষ্যত্বে, (২) এই মনুষ্যত্ব সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ। একণে এই বৃত্তিগুলি কি প্রকার, তাহার কিছু পর্য্যালোচনার প্রয়োজন।

বৃত্তিগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) শারীরিক ও (২) মানসিক। মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জ্জন করে, কতকগুলি কাজ করে, বা কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জ্জন করে না, কোন বিশেষ কার্য্যের প্রবর্ত্তকও নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেগুলিকে জ্ঞানার্জ্জনী বলিব। যেগুলির প্রবর্ত্তনায় আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, সেগুলিকে কার্য্যকারিণী বৃত্তি বলিব। আর যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম্ম, আনন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির ত্রিবিধ ফল; সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য।

শিষ্য। এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ? সকল বৃত্তির পরিতৃপ্তিতেই ত আনন্দ।

গুরু। তা বটে। কিন্তু এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যাহাদিগের পরিতৃপ্তির ফল কেবল আনন্দ—আনন্দ ভিন্ন অন্য ফল নাই। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলাভ, গৌণ ফল আনন্দ। কার্য্যকারিণী বৃত্তির মুখ্য ফল কার্য্যে প্রবৃত্তি, গৌণ ফল আনন্দ। কিন্তু এগুলির মুখ্য ফলই আনন্দ—অন্য ফল নাই। পাশ্চাত্যেরা ইহাকে Asthetic Faculties বলেন।

শিষ্য। পাশ্চাত্যেরা Asthetic ও Intellectual বা Emotinal মধ্যে ধরেন; কিন্তু আপনি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি পৃথক করিলেন।

গুরু। আমি ঠিক পাশ্চাত্যদিগের অনুসরণ করিতেছি না। ভরসা করি, অনুসরণ করিতে বাধ্য নহি। সত্যের অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখন মানুষের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল;—(১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জ্জনী, (৩) কার্য্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।

শিষ্য। ক্রোধাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তি এবং কামাদি শারীরিকী বৃত্তি। এগুলিরও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি কি মনুষ্যত্বের উপাদান?

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলনসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া সে আপত্তির মীমাংসা করিতেছি।

শিষ্য। কিন্তু অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে ত নূতন কিছু পাইলাম না; সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি হয়। অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষম, তাহারা পোষ্যগণকে সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়া থাকে—তাই সভ্যজগতে এত বিদ্যালয়। তৃতীয়তঃ—কার্য্যকারিণী বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাদৃশ ঘটিয়া উঠে না বটে, তবু তাহার ঔচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ—চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফুরণও কতক বাঞ্ছনীয় বলিয়া যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সূক্ষ্ম শিল্পের অনুশীলন। নূতন আমাকে কি শিখাইলেন?

গুরু। এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি যে কোন নূতন সংবাদ লইয়া স্বর্গ হইতে সদ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ আমি ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। ধর্ম্ম পুরাতন, নূতন নহে। আমি নূতন ধর্ম্ম কোথায় পাইব?

শিষ্য। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্ম্মের অংশ বলিয়া খাড়া করিতেছেন, ইহাই দেখিতেছি নূতন।

গুরু। তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অঙ্গ, ইহা চিরকাল হিন্দুধর্ম্মে আছে। এই জন্য সকল হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রেই শিক্ষা-প্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠ্যাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত বিধান হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রমও শিক্ষানবিশী মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন; গার্হস্থ্যে কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন। এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধিসংস্থাপনের জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ব্যস্ত। আমিও সেই আর্য্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যান পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন, "না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্ম্মের মর্ম্মের বিপরীতাচরণ হইবে।" হিন্দুধর্ম্মের সেই মর্ম্মভাগ অমর, চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিতসাধন করিবে, কেন না, মানব-প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধি-সকল সকল ধর্ম্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য্য বা পরিবর্ত্তনীয়। হিন্দুধর্ম্মের নবসংস্কারের এই মূল কথা।

শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথা আনিয়া ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অঙ্গ, ইহা কোম্‌তের মত।

গুরু। হইতে পারে, এখন হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্‌তমতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইণ্টিস্থ সেঞ্চুরিতে হর্ব্বর্ট স্পেন্সর কোম্‌ত-মত-প্রতিবাদে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতঃ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ। স্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্তমতের সাদৃশ্য আছে। বেদান্তের সঙ্গে হর্ব্বর্ট স্পেন্সরের বা স্পিনোজার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদান্তটা হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বা স্পিনোজীয় বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব না—বরং স্পিনোজা বা স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়া হিন্দুমধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্ম্মের যাহা স্থূলভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার একটু আধটু ছুঁইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ইহা সামান্য প্রমাণ নহে।

শিষ্য। যাহা হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি ধর্ম্মের শাসনাধীন হইলে, তবে ধর্ম্ম ছাড়া কি?

গুরু। কিছুই ধর্ম্ম ছাড়া নহে। ধর্ম্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম্ম কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম। অন্যধর্ম্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্যধর্ম্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সামঞ্জস্য।

শিষ্য। বৃত্তির অনুশীলন কি, তাহা বুঝিলাম। এখন সে সকলের সামঞ্জস্য কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। শারীরিক প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কি সকলই তুল্যরূপে অনুশীলিত করিতে হইবে? কাম, ক্রোধ বা লোভের যেরূপ অনুশীলন, ভক্তি, প্রীতি, দয়ারও কি সেইরূপ অনুশীলন করিব? পূর্ব্বগামী ধর্ম্মবেত্তৃগণ বলিয়া থাকেন যে, কাম-ক্রোধাদির দমন করিবে এবং ভক্তি-প্রীতিদয়াদির অপরিমিত অনুশীলন করিবে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে সামঞ্জস্য কোথায় রহিল?

গুরু। ধর্ম্মবেত্তৃগণ যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত এবং তাহার বিশেষ কারণ আছে। ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবৃত্তিগুলির সম্প্রসারণশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে। সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য যাহাকে বলিয়াছি, তাহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে সুরম্য উদ্যান হয়, কিন্তু এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ

রহে যে, তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণশক্তি, সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামঞ্জস্যের হানি হইল। মনুষ্যচরিত্রেও সেইরূপ। কতকগুলি বৃত্তি—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া ইহাদিগের সম্প্রসারণশক্তি অন্য অন্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। পক্ষান্তরে, আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে, প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি,—সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণশক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন হয়। সুতরাং সেগুলি যতদূর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, ততদূর স্ফূর্ত্তি পাইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। সেগুলি তেঁতুলগাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে। আমি এমন বলিতেছি না যে, সেগুলি বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহা অকর্ত্তব্য কেন না, অন্যে প্রয়োজন আছে—নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে সকল কথা সাবস্তারে পরে বলিতেছি। তেঁতুলগাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থান এক কোণে। বড় বাড়িতে না পায়—বাড়িলেই ছাঁটিয়া দিবে। দুই একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল—তার বেশী আর না বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী স্ফূর্ত্তি হইলেই হইল। তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য বলিয়াছি।

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে, এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে—যথা কামাদি, যাহার দমনই সমুচিত ।

গুরু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের ধ্বংসে মনুষ্যজাতির ধ্বংস ঘটিবে; সুতরাং এই অতি কদর্য্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। আমাদের পরম রমণীয় হিন্দুধর্ম্মেরও এই বিধি। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ইহার ধ্বংস বিহিত করেন নাই; বরং ধর্ম্মার্থ তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্ম্মের অংশ। তবে ধর্ম্মের প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে স্ফূর্ত্তি, তাহা হিন্দুশাস্ত্রানুসারেও নিষিদ্ধ—এবং তদনুগামী এই ধর্ম্মব্যাখ্যা যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহা দ্বারাও নিষিদ্ধ হইতেছে। কেন না, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যৎটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যে স্ফূর্ত্তি, তাহা সামঞ্জস্যের বিঘ্নকর এবং উচ্চতর বৃত্তি-সকলের স্ফূর্ত্তি-রোধক। যদি অনুচিত স্ফূর্ত্তি-রোধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমুচিত অনুশীলন। এই অর্থে ইন্দ্রিয়দমনই পরমধর্ম্ম।

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোকরক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য আপনি এ সকল কথা বলিতে পারিলেন, কিন্তু অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তি-সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না।

গুরু। সকল অপকৃষ্ট বৃত্তি-সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে। কোন্‌টির সম্বন্ধে খাটে না?

শিষ্য। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি না।

গুরু। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দণ্ডনীতি—বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দণ্ডনীতির উচ্ছেদে সমাজের উচ্ছেদ।

শিষ্য। দণ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না; বরং দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না, সর্ব্বলোকের মঙ্গল-কামনা করিয়াই দণ্ডশাস্ত্র-প্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভূত করিয়াছেন এবং সর্ব্বলোকের মঙ্গল-কামনা করিয়াই রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাকেন।

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়া দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্টকারীর বিরোধী হই। এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে যে, আমরা কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে পারি যে, অনিষ্টকারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যে প্রেরিত হইলে, ক্রুদ্ধের যে ক্ষিপ্রকারিতা এবং আগ্রহ, তাহা আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মনুষ্য পরকে আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পর-রক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়া দাঁড়ায়। পর-রক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহা বিধিবদ্ধ হইলেই দণ্ড-নীতি হইল।

শিষ্য। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম্ম দেখি না।

গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত স্ফূর্ত্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত বা সমঞ্জসীভূত স্ফূর্ত্তি—ধর্ম্মসঙ্গত অর্জ্জন স্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয় এবং আমার উপর যাহাদের

রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্ম যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য-কর্ত্তব্য। এইরূপ পরিমিত অর্জ্জনে—কেবল ধনার্জ্জনের কথা বলিতেছি না,—ভোগ্য বস্তুমাত্রেরই অর্জ্জনের কথা বলিতেছি—কোন দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সদ্বৃত্তি, লোভে পরিণত হইল। অনুচিত স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা তখন মহাপাপ হইয়া দাঁড়াইল। দুইটি কথা বুঝ। যেগুলিকে আমরা নিকৃষ্টবৃত্তি বলি, তাহাদের সকলগুলিই উচিত মাত্রায় ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম। আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজস্বিনী যে, যত্ন না করিলে এগুলি সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, এজন্য দমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন। এই দুটি কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলন-তত্ত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রকৃত অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব মন্মথের অনুচিত স্ফূর্ত্তি দেখিয়া, তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু লোক-হিতার্থ আবার তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে হইল।* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণের যে উপদেশ, তাহাতেও ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে। সংযত হইলে সে সকল আর শান্তির বিঘ্নকর হইতে পারে না। যথা—

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্,
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ২।৬৪॥"

শিষ্য। যাই হউক, এ তত্ত্ব লইয়া আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবৃত্তি-সকলের অনুশীলনসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন্।

গুরু। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছা ছিল না দুই কারণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম, তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে হইল। আর আজকাল যোগধর্ম্মের একটা হুজুগ উঠিয়াছে, তাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। এই ধর্ম্মের ফলাফল-সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার যে সুমহৎ ফল আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? তবে যাঁহারা এই হুজুগ লইয়া বেড়ান, তাঁহাদের মত এই দেখিতে পাই যে, কতকগুলি বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ—ইহাই যোগের উদ্দেশ্য। এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য ধর্ম্ম হয়, তবে তাঁহাদিগের এই ধর্ম্ম অধর্ম্ম। বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্ম্মিক, কেন না, তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীরাও অধার্ম্মিক, কেন না, তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট-উৎকৃষ্টবৃত্তিভেদে না হয় লম্পট বা উদরম্ভরীকে নীচ শ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম এবং যোগীদিগকে উচ্চশ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম, কিন্তু উভয়কেই অধার্ম্মিক বলিব। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাঁহার কাছে নিকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট-ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা স্ব স্ব কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন। কার্য্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে, জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে। জগতত্ত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই বুঝিবে যে, আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সংবদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই অনুকূল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। তাই যুগপরম্পরায় মনুষ্যজাতির মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্ম্মই এই উন্নতির কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না যে, তাঁহার বিজ্ঞানও এই ধর্ম্মের এক অংশ, তিনিও একজন ধর্ম্মের আচার্য্য। তিনি যখন "Low"র মহিমাকীর্ত্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, দুই জন একই কথা বলি।

---

* মন্মথধ্বংস হইল, অথচ তাহা হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না; এজন্য মন্মথের পুনর্জ্জীবন। পক্ষান্তরে, আবার রতি কর্ত্তৃক পুনর্জ্জন্মলব্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন। এ কথাটাও যেন মনে থাকে, অনুচিত অনুশীলনেই অনুচিত স্ফূর্ত্তি। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির এইরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য অনুভূত করিতে পারিলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম আর উপধর্ম্মসঙ্কুল বা Silly বলিয়া বোধ হইল না। সময়ান্তরে দুই একটা উদাহরণ দিব।

দুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করি। মনুষ্যমধ্যে ধর্ম্ম লইয়া এত বিবাদ-বিসংবাদ না করিলেও চলে।

সপ্তম অধ্যায়।

—:*:—

সামঞ্জস্য ও সুখ।

গুরু। একণে নিকৃষ্ট পর্য্যাকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া, যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল, সে সকলের কথা বলি, শুন।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি, অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম এবং তাহাদিগের অধিক সম্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে,যথা কামাদি, সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে সামঞ্জস্যের ধ্বংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে সামঞ্জস্য, কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামঞ্জস্য, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি বলিয়াছেন যে,কামাদির অধিক স্ফুরণে অন্যান্য বৃত্তি,—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এ সকলের উত্তম স্ফূর্ত্তি হয় না, এই জন্য অসামঞ্জস্য ঘটে। কিন্তু ভক্তি, প্রীতি, দয়াদির অধিক স্ফুরণেও কাম-ক্রোধাদির উত্তম স্ফূর্ত্তি হয় না, ইহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে না কেন?

গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে সহজেই বুঝা যায়, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত—অনুশীলনসাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হয় না। দেখিও, স্বতঃস্ফূর্ত্তে ও সহজে গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জন্মিয়াছে, তাহা সহজ। সকল বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহাই বা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইবে কেন?

গুরু। অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয়। (১) সময়, (২) শক্তি, (Energy), (৩) যাহা লইয়া বৃত্তির অনুশীলন করিব—অনুশীলনের উপাদান। এখন আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সংকীর্ণ। মনুষ্যজীবন কয়েক বৎসরমাত্র পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্যের পর বৃত্তির অনুশীলনজন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয় যে, যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলনসাপেক্ষ, তাহার অনুশীলনে সকল সময়টুকু দিব। যদি তাহা না করিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়াভাবে অন্য বৃত্তিগুলির উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। কাজেই সে সকলের খর্ব্বতা বা বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ, শক্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তিটুকু আছে, তাহাও পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ পাশববৃত্তির সমধিক অনুশীলন শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়তঃ,স্বতঃস্ফূর্ত্ত পাশববৃত্তির অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান, পরস্পর বড় বিরোধী। যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাসিনী-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তীর হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব, এবং ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসম্ভব। আর শেষ কথা এই যে, পাশববৃত্তিগুলি শরীর ও জাতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া,পুরুষ-পরম্পরাগতস্ফূর্ত্তিজন্যই হউক বা জীবরক্ষাভিলাষী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী যে, অনুশীলনে তাহারা সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। এইটি বিশেষ কথা।

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও জীবিকানির্ব্বাহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির আবশ্যকীয় স্ফূর্ত্তির কোন বিঘ্ন হয় না। কেন না, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। কিন্তু উপাদানবিরোধহেতু তাহাদের দমন হইতে পারে বটে; কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন।

শিষ্য। কিন্তু যোগীরা অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা—কিংবা উপায়ান্তরের দ্বারা, পাশব বৃত্তিগুলির ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি সত্য নয়?

গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। কিন্তু সে ব্যবস্থা অনুশীলন-ধর্ম্মের নহে, সন্ন্যাসধর্ম্মের। সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম্ম বলি না—অন্ততঃ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম। ভগবান্ স্বয়ং কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনুশীলন কর্ম্মাত্মক।

শিষ্য। যাক্। তবে আপনার সামঞ্জস্যতত্ত্বের স্থূল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম যে, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহা বাড়িতে দিতে পারি। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা (Genious) কি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে? প্রতিভা একটি বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা আমি জানি। কিন্তু কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তিমতী বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্যা ভাল।

গুরু। ইহা যথার্থ।

শিষ্য। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন করিব? কোন্ কষ্টিপাতরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি সোনা, এইটি পিতল?

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাতর।

শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা! আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা বলিতে পার না। কেন না, সুখ কি, তাহা বুঝাইয়াছি। আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।

শিষ্য। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ, না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। সমবায়ই সুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তি সুখের অংশ মাত্র।

শিষ্য। তবে কষ্টিপাতর কোন্‌টা। সমবায়, না অংশ?

গুরু। সমবায়ই কষ্টিপাতর।

শিষ্য। এ ত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন, আমি ছবি আঁকিতে পারি। কতকগুলি বৃত্তিবিশেষের পরিমার্জ্জনে এ শক্তি জন্মে। কথাটা এই যে, সেই বৃত্তিগুলির সম্যক্ সম্প্রসারণ আমার কর্ত্তব্য কি না? আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন, "সকল বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও চরিতার্থতার সমবায়ে যে সুখ, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে কি না, এ কথা বুঝিয়া তবে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন কর।" অর্থাৎ আমার তুলি ধরিবার আগে আমাকে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরাধমনীর স্বাস্থ্য, চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রুতি—আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, দীনে দয়া, সত্যে অনুরাগ—আমার অপত্যে স্নেহ, শত্রুতে ক্রোধ—আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক ধৃতি,—আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা, কোন দিকে কিছুর কোন বিঘ্ন হয় কি না। ইহাও কি সাধ্য?

গুরু। কঠিন বটে, নিশ্চিত জানিও, ধর্ম্মাচরণ ছেলেখেলা নহে। ধর্ম্মাচরণ অতি দুরূহ ব্যাপার। প্রকৃত ধার্ম্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল, তাহার কারণই তাই। ধর্ম্ম সুখের উপায় বটে, কিন্তু সুখ বড় আয়াসলভ্য। সাধনা অতি দুরূহ। দুরূহ, কিন্তু অসাধ্য নহে।

শিষ্য। কিন্তু ধর্ম্ম ত সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হওয়া উচিত।

গুরু। ধর্ম্ম যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, তবে না হয় তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম। ফরমায়েস মত জিনিস গড়িয়া দিতাম, কিন্তু ধর্ম্ম তোমার আমার গড়িবার নহে। ধর্ম্ম ঐশিক নিয়মাধীন। যিনি ধর্ম্মের প্রণেতা, তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্ম্মকে সাধারণের অনুপযোগীও বলা উচিত নহে। চেষ্টা করিলে অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা সকলেই ধার্ম্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস্ যে, এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্ম্মিক হইবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক। আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে।

শিষ্য। আমি যদি বলি যে, আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এবং দুষ্প্রাপ্য সুখ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, সুখের উপায় ধর্ম্ম নহে, সুখের উপায় অধর্ম্ম।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে? উহাও বৃত্তির স্ফুরণ ও চরিতার্থতা বটে। আমি ইন্দ্রিয়গণকে

খর্ব্ব করিয়া কেন দয়াদাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনু-
শীলন করিব? আপনি তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। আপনি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে যে, ইন্দ্রিয়াদির অধিক অনুশীলনে দয়াদাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা, কিন্তু উত্তরে আমি যদি বলি যে, ধ্বংস হউক, আমি ইন্দ্রিয়সুখে বঞ্চিত হই কেন?

গুরু। তাহা হইলে, আমি বলিব, তুমি কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছ। যাহা হউক, তোমার কথার আমি উত্তর দিব, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি সুখ? ভাল, তাই হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেছি। আমি খত লিখিয়া দিতেছি যে, এই ইন্দ্রিয়পরি-
তৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ নিন্দা করিবে না—যদি কেহ করে, আমি গুণাগারি দিব। কিন্তু তোমাকেও একখানি খত লিখিয়া দিতে হইবে। তুমি লিখিয়া দিবে যে,"আর ইহাতে সুখ নাই" বলিয়া তুমি ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। শ্রান্তি, ক্লান্তি, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুঃক্ষয়, পশুত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোনরূপ ওজর-আপত্তি করিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন, রাজি আছ?

শিষ্য। দোহাই মহাশয়ের! আমি নই। কিন্তু এমন লোক কি সর্ব্বদা দেখা যায় না, যাহারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিই সার করে? অনেক লোকই ত এইরূপ।

গুরু। আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। কিন্তু ভিতরের খবর রাখি না। ভিতরের খবর এই– যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্টা এত প্রবল। অনু-
শীলনের দোষে হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে, দাহনিবা-
রণের জন্য তারা জল খুঁজিয়া বেড়ায়, জানে না যে, অগ্নিদগ্ধের ঔষধ জল নয়।

শিষ্য। কিন্তু এমনও দেখি যে, অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ ইন্দ্রিয়বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। অনেক মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই, তাহারা ত মদ ছাড়ে না—ছাড়িতে চায় না।

গুরু। একে একে বাপু, আগে "ছাড়ে না" কথাটাই বুঝ। ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে না, কেন না, এটি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির লালসামাত্র নহে—এ একটি পীড়া। ডাক্তারেরা ইহাকে Dipsomania বলেন। ইহার ঔষধ আছে—চিকিৎসা আছে। রোগী মনে করি সেই রোগ ছাড়িতে পারে না। সেটা চিকিৎসকের হাত। চিকিৎসা নিষ্ফল হইলে রোগের যে অবশ্য-
ম্ভাবী পরিণাম, তাহা ঘটে,—মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই। "ছাড়িতে চায় না"—এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহা বলুক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে একদিন মদ খায়, সেই আজিও বলে, "মদ ছাড়িব কেন?" তাহার মদ্য-
পানের আকাঙ্ক্ষা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই—তৃষ্ণা এখনও আছে। কিন্তু যাহার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে, পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আর নাই। এ সকল কথা মদ্য-সম্বন্ধেই যে খাটে, এমত নহে,—সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-
পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অনুচিত অনু-
শীলনের ফলও একটি রোগ। তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকালমৃত্যু আছে। এইরূপ একটি রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিলাম যে, তাহাকে হাঁস-
পাতালে লইয়া গিয়া তাহার হাত-পা বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল এবং সে ইচ্ছামত অঙ্গসঞ্চালন করিতে না পারে, এজন্য নাইকরসিটী দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে ঘা করিয়া দিতে হইয়াছিল। ঔদরিকের কথা সকলেই জানে। আমার নিকটে একজন ঔদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ঔদরিকতার অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, দুষ্পাচনীয় দ্রব্য আহার করিলেই তাঁহার পীড়াবৃদ্ধি হইবে। সে জন্য লোভসংবরণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে, তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! এই সকল কি সুখ? ইহার আবার প্রমাণ-
প্রয়োগ চাই?

শিষ্য। এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন, তাহা বুঝিয়াছি। ক্ষণিক যে সুখ, তাহা সুখ নহে।

গুরু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি

একবার একটি গোলাবফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্তু সে সুখ কি সুখ নহে? তাহা সত্যই সুখ।

শিষ্য। যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী দুঃখ, তাহা সুখ নহে, দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। এখন বুঝিয়াছি কি?

গুরু। এখন পথে আসিয়াছ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সবটুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে—

শিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন, কোন ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিতেছে। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক?

গুরু। প্রথমতঃ সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহূর্ত্ত মাত্র। তুমি পরকাল মান, না মান, আমি মানি। অনন্তকালের তুলনায় পাঁচ বৎসর কতক্ষণ? কিন্তু আমি পরকালের ভয়ই দেখাইয়া কাহাকেও ধার্ম্মিক করিতে চাহি না। কেন না, অনেক লোক পরকাল মানে না—মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না; মনে করে, ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শান্ত করিবার একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আজিকালি অনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহা এইজন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্ব্বত্র বলবান্ হয় না। "আজিকার দিনে" বলিতেছি, কেন না, এক সময়ে এ দেশে সে ধর্ম্ম বড় বলবান্ই ছিল বটে, এক সময়ে ইউরোপেও বড় বলবান্ ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্তমাংস-পূতিগন্ধশালিনী, কামান-গোলাবারুদব্রীচ-লোডর-টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী,—এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তাহা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ারমুখী এ দেশে আসিয়াও কালামুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম্মব্যাখ্যায় যত পারি পরকালকে বাদ দিতেছি। তাহার কারণ এই যে, যাহা তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই তাহার উপর ভিত্তি, সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্ম্মের মন্দির গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায় পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম্ম ভিত্তিশূন্য হইল না। কেন না, ইহলোকের সুখও কেবল ধর্ম্মমূলক, ইহকালের দুঃখও কেবল অধর্ম্মমূলক। এখন ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে। ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। * এজন্য ইহকালের সুখদুঃখের উপরও ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই দুই কারণে, অর্থাৎ ইহকাল সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং পরকাল সর্ব্ববাদিসম্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকালের উপরই ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। কিন্তু "স্থায়ী সুখ কি?" যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয় যে, অনন্তকালস্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয়কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে।

শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একটা কথার মীমাংসা করুন। মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও কি তাই সুখ? ইহকালে যাহা দুঃখ, পরকালেও কি তাই দুঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহকালপরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ—একজাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে পারে?

গুরু। অন্য প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। কিন্তু এ কথার উত্তর জন্য দুই প্রকার বিচার আবশ্যক। যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে এক প্রকার, আর যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে আর এক প্রকার। তুমি কি জন্মান্তর মান?

শিষ্য। না।

গুরু। তবে আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে অথচ জন্মান্তর মানিলে না, তখন দুইটি কথা স্বীকার করিলে;—প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারীরিকী-বৃত্তিনিচয়-জনিত যে সকল সুখদুঃখ, তাহা পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীরব্যতিরিক্ত যাহা, তাহা থাকিবে অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে; সুতরাং মানসিক বৃত্তিজনিত যে সকল সুখদুঃখ, তাহা পরকালেও থাকিবে।

* "ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা।" গীতা, ৪।১২।

পরকালে এইরূপ সুখের আধিক্যকে স্বর্গ বলা যাইতে পারে, এইরূপ দুঃখের আধিক্যকে নরক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্ম্মব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য অন্যান্য ধর্ম্মব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে। আপনি পরকাল মানিয়াও যে উহা ধর্ম্মব্যাখ্যায় বর্জ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা করি।

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বা না হউক, কিন্তু ভ্রান্ত নহে। কেন না, সুখের উপায় যদি ধর্ম্ম হইল, আর ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদি সেই সুখই সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম্ম, পরকালেরও সেই ধর্ম্ম। পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকেও সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক হওয়া যায়। ধর্ম্ম নিত্য। ধর্ম্ম ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ। তুমি পরকাল মান আর না মান—ধর্ম্মাচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, পরকালেও সুখী হইবে।

শিষ্য। আপনি নিজে পরকাল মানেন কিছু প্রমাণ আছে বলিয়া মানেন, না কেবল মানিতে ভাল লাগে, তাই মানেন?

গুরু। যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে বলিয়াই পরকাল মানি।

শিষ্য। যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ বুঝাইতেছেন না কেন?

গুরু। আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে প্রমাণগুলি বিবাদের স্থল। প্রমাণগুলির এমন কোন দোষ নাই যে, সে সকল বিবাদের সুমীমাংসা হয় না, বা হয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার বশতঃ বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই, এই জন্য বলিতেছি যে, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধর্ম্মাত্মা হও, ইহাই যথেষ্ট। আমরা এই ধর্ম্মব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব যে, এক্ষণে যাহাকে সমুদ। চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষফল পবিত্রতা—চিত্তশুদ্ধি।* তুমি পরকাল বলিয়াও মান, তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইলে, নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সুখী হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকেই স্বর্গ হইল। তখন পরলোকে স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে পরকাল মানা না মানাতে বড় আসিয়া গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষে সহজ হইল; যে ধর্ম্ম তাহারা পরকালমূলক বলিয়া একদিন অগ্রাহ্য করিত, তাহারা এখন সেই ধর্ম্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে। আর যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে, তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই; তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামনা করি।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন যে, ইহকাল-পরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ। একজাতীয় সুখ উভয়কালব্যাপী হইতে পারে। যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে এই তত্ত্ব যে কারণে গ্রাহ্য, তাহা বুঝাইলেন। যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে কি?

গুরু। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ। অনুশীলনের পূর্ণমাত্রায় আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। ভক্তিতত্ত্ব যখন বুঝাইব, তখন এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

শিষ্য। কিন্তু অনুশীলনের পূর্ণমাত্রা ত সচরাচর কাহার কপালে ঘটা সম্ভব নহে। যাহাদের অনুশীলনের সম্পূর্ণতা ঘটে নাই, তাহাদের পুনর্জ্জন্ম ঘটিবে। এই জন্মের অনুশীলনের ফলে তাহারা কি পরজন্মে কোন সুখ প্রাপ্ত হইবে?

গুরু। জন্মান্তরবাদের স্থূল মর্ম্মই এই যে, এ জন্মের কর্ম্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়। সমস্ত কর্ম্মের সমবায় অনুশীলন। অতএব এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভ ফল, তাহা অনুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ কথা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন:—

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্" ইত্যাদি গীতা, ৬।৪৩।

শিষ্য। এক্ষণে আমরা স্থূলকথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী সুখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকালে ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি?

* সকল কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইবে।

গুরু। দ্বিতীয় উত্তর, যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য। ইহজীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে যে সুখ সেই অন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ। যদি পরকাল না থাকে, তবে ইহজীবনে যাহা চিরকাল থাকে, তাহাই স্থায়ী সুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে। যে পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয়পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। তিনটির একটি না একটি কারণে অবশ্য অবশ্য তাহার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। (১) অতি ভোগজনিত গ্লানি বা বিরাগ—অতি-তৃপ্তি, কিংবা (২) ইন্দ্রিয়াসক্তিজনিত অবশ্যম্ভাবী রোগ বা অসামর্থ্য, অথবা (৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এ সকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে।

শিষ্য। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা যায়, সেগুলির অনুশীলনে যে সুখ, তাহা কি ইহজীবনে চিরস্থায়ী?

গুরু। তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, দয়াবৃত্তির কথা হইতেছে। পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির দোষ এই যে,যে ইহার অনুশীলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ইহা যে অনুশীলিত করিয়াছে, সে জানে, দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে এমন তীব্রসুখ আছে যে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঐন্দ্রিয়িকেরা সর্ব্বলোক-সুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে পারে না। এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার সুখজনকতা বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্যায় ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা দৌর্ব্বল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে। ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। ঐন্দ্রিয়িক দিবসে দুইবার, তিনবার, না হয় চারিবার আহার করিতে পারে। অন্যান্য ঐন্দ্রিয়িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক লোক মরণকালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, ধার্ম্মিক (Christian) কেমন সুখে মরে।"

তার পর পরকালের কথা বলি। যদি জন্মান্তর না মানিয়া পরকাল স্বীকার করা যায়, তবে ইহা বলিতে হইবে যে, পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং এ দয়াবৃত্তিটিও থাকিবে। আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলৌকিক প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব, কেন না, হঠাৎ অবস্থান্তরের উপযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা উত্তমরূপে অনুশীলিত ও সুখপ্রদ অবস্থায় লইয়া যাই, তবে উহা পরলোকেও আমার পক্ষে সুখপ্রদ হইবে। সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চরিতার্থ করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব।

শিষ্য। এ সকল সুখ স্বপ্নমাত্র—অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতা কর্ম্মাধীন। পরোপকার কর্ম্ম মাত্র। আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি আমি শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়া গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম্ম করিব?

গুরু। কথাটা কিছু নির্ব্বোধের মত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে, যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের কর্ম্ম কর্ম্মেন্দ্রিয়সাধ্য। কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বদ্ধ নহে, তাহারও কর্ম্ম যে কর্ম্মেন্দ্রিয়সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

শিষ্য। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতাকারণত্বম্। কর্ম্ম অন্যথাসিদ্ধিশূন্য। কোথাও আমরা দেখি নাই যে, কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য যে, সে কর্ম্ম করিয়াছে।

গুরু। ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল, ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। আর যদি বল,ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও স্বীকার কর। যদি তাহা কর, তবে,কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য নিরাকারের কর্ম্মকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে। কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বস্রষ্টা।

পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র। অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব।

শিষ্য। হইলে হইতে পারে, কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথা। আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই।

গুরু। আন্দাজি কথা, ইহা আমি স্বীকার করি, বিশ্বাস করা না করার পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া আসি নাই,ইহা বোধ করি বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথার একটু মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে আর যদি (Low of continuity) অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয়ভাব সত্য হয়, তবে পরকালসম্বন্ধে যে অন্ত কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখিতেছি না। এই ক্রমান্বয় ভাবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দু, খ্রীষ্টীয় বা ইস্‌লামী যে স্বর্গনরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ।

শিষ্য। যদি পরকাল মানিতে পারি, তবে এটুকুও না হয় মানিয়া লইব। যদি হাতীটা গিলিতে পারি, তবে হাতীর কানের ভিতর যে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের শাসনকর্ত্তৃত্ব কই?

গুরু। যাহারা স্বর্গের দণ্ডধর গড়িয়াছে, তাহারা পরকালের শাসনকর্ত্তা গড়িয়াছে, আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই। আমি মনুষ্যজীবনের সমালোচনা করিয়া ধর্ম্মের যে স্থূল মর্ম্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা ছাড়িল, সেই দিনই একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সদ্বৃত্তিগুলি মার্জ্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব। * আর যে সদ্বৃত্তিগুলির অনুশীলন অভাবে অপক্কাবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে,তাহার পরলোকে কোন সুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অসদ্বৃত্তিগুলি স্ফূরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ। জন্মান্তর যদি না মানা যায়, তবে এইরূপ স্বর্গনরক মানা যায়। কৃমিকীটসঙ্কুল অবর্ণনীয় হ্রদরূপ নরক বা অপ্সরঃকণ্ঠনিনাদমধুরিত, উর্ব্বশীমেনকারম্ভাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দনকাননকুসুমসুবাস-সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্দুধর্ম্ম মানি, হিন্দুধর্ম্মের "বকামি"গুলা মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি।

শিষ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার সূত্র পুনর্গ্রহণ করুন।

গুরু। বোধ হয়, এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব যে, পরকাল বাদ দিয়া কথা কহিলেও কোন কোন সুখকে স্থায়ী, কোন কোন সুখের স্থায়িত্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। বোধ হয়, কথাটা এখনও বুঝি নাই। আমি একটা টপ্পা শুনিয়া আসিলাম, কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে কিছু আনন্দলাভও করিলাম। সে সুখ স্থায়ী, না ক্ষণিক?

গুরু। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী সুখ। সেই স্থায়ী সুখের অংশ বা উপাদান বলিয়া, ঐ আনন্দটুকুকে স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। সুখ যে বৃত্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এখন, বলিয়াছি যে, কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলনজনিত যে সুখ, তাহা অস্থায়ী। শেষোক্ত সুখও আবার দ্বিবিধ :—

(১) যাহার পরিণামে দুঃখ, (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও পরিণামে দুঃখশূন্য। ইন্দ্রিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তিসম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্য বুঝিয়াছ যে, এই বৃত্তিগুলির পরিমিত অনুশীলনে দুঃখশূন্য সুখ, এবং এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনে যে সুখ, তাহারই পরিণাম দুঃখ। অতএব সুখ ত্রিবিধ।

(১) স্থায়ী।

(২) ক্ষণিক, কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য।

(৩) ক্ষণিক, কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ।

শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,—উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে (১) হয় যাহা

* প্রাচীন বয়সে যে কাহারও কাহারও অনুশীলিত বৃত্তিরও দুর্ব্বলতা দেখা যায়, প্রায় তাহার তাহা শারীরিক দুরবস্থাপ্রযুক্ত। শারীরিক বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হয় নাই। নহিলে সকলের হয় না কেন?

স্থায়ী, (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে দুঃখশূন্য। আমি যখন বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম, তখন এই অর্থেই সুখ-শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহা বস্তুতঃ দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত বা পশুবৃত্তিদিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরে, জলের স্নিগ্ধতা বশতঃ তাহার প্রথম নিমজ্জনকালে কিছু সুখোপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থা তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জন-দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। তেমনি দুঃখপরিণাম সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা, নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, "এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন করিব? কোন্ কষ্টিপাতরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি পিতল?" এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে অধিক বাড়িতে দেওয়াই কর্ত্তব্য—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর যেগুলির অনুশীলনে ক্ষণিক সুখ,তাহা বাড়িতে দেওয়া অকর্ত্তব্য, কেন না, এ সকল বৃত্তির অধিক অনুশীলনের পরিণাম সুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অনুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহে, কেন না, তাহাতে পরিণামে দুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ, যেরূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাতর?

অধ্যায়।

—:০:—

শারীরিকী বৃত্তি।

শিষ্য। যে পর্য্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, অনুশীলন কি। আর বুঝিয়াছি, সুখ কি। বুঝিয়াছি, অনুশীলনের উদ্দেশ্য সেই সুখ, এবং সামঞ্জস্য তাহার সীমা। কিন্তু বৃত্তিগুলির অনুশীলনসম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কিছু এখনও পাই নাই। কোন্ বৃত্তির কি প্রকার অনুশীলন করিতে হইবে, তাহার কিছু উপদেশের প্রয়োজন নাই কি?

গুরু। ইহা শিক্ষাতত্ত্ব। শিক্ষাতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্গত। আমাদের এই কথাবার্ত্তার প্রধান উদ্দেশ্য তাহা নহে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝি। তজ্জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই আমি বলিব।

বৃত্তি চতুর্ব্বিধ বলিয়াছি; (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জ্জনী, (৩) কার্য্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী। আগে শারীরিকী বৃত্তির কথা বলিব,—কেন না, উহাই সর্ব্বাগ্রে স্ফুরিত হইতে থাকে। এ সকলের স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে সুখ আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

শিষ্য। তাহার কারণ, বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম্ম কেহ বলে না।

গুরু। কোন ইউরোপীয় অনুশীলনবাদী বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মস্থানীয় কোন একটা জিনিস বিবেচনা করেন, কিন্তু তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়। *

শিষ্য। আপনি কেন বলেন?

গুরু। যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম্ম। কিন্তু সে কথা না হয় ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ-ব্রতানুষ্ঠান-ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম বল, যদি দয়া,দাক্ষিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম্ম বল, যদি কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম্ম বল, না হয়, খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্মকে ধর্ম্ম বল, সকল ধর্ম্মের জন্যই শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের বিঘ্ননাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্ম্মবেত্তা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

শিষ্য। ধর্ম্মের বিঘ্ন বা কিরূপ, এবং শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া দিন।

---

* Herbert Spencer বলেন। গ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

গুরু। প্রথম ধর, রোগ। রোগ ধর্ম্মের বিঘ্ন। যে গোঁড়া হিন্দু রোগে পড়িয়া আছে, সে যাগযজ্ঞ, ব্রত-নিয়ম, তীর্থদর্শন কিছুই করিতে পারে না। যে গোঁড়া হিন্দু নয়,কিন্তু পরোপকার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলিয়া মানে,রোগ তাহারও ধর্ম্মের বিঘ্ন। রোগে যে নিজে অপটু,সে কাহার কি কার্য্য করিবে? যাহার বিবেচনায় ধর্ম্মের জন্য এ সকল কিছুরই প্রয়োজন নাই,কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম্ম, রোগ তাহারও ধর্ম্মের বিঘ্ন। কেন না, রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না, অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না; কেন না, চিত্তকে শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে। রোগ কর্ম্মীর কর্ম্মের বিঘ্ন, যোগীর যোগের বিঘ্ন, ভক্তের ভক্তিসাধনের বিঘ্ন। রোগ ধর্ম্মের পরম বিঘ্ন

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে,শারীরিকী বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবই প্রধানতঃ রোগের কারণ

শিষ্য। যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল, তাহাও কি অনুশীলনের অভাব?

গুরু। ত্বগিন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাঘাত। শারীরতত্ত্ববিদ্যাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলন না হইলে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন হয় না।

গুরু। না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশীলনের সাপেক্ষ। কেবল শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ, এমত নহে। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ। কোন্ কার্য্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন্ বৃত্তির কিসে অনুশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

শিষ্য। এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পর-সাপেক্ষ, তবে কোন্‌গুলির অনুশীলন আগে আরম্ভ করিব?

গুরু। সকলগুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে, অর্থাৎ শৈশবে।

শিষ্য। আশ্চর্য্য কথা! শৈশবে আমি জানি না যে, কি প্রকারে কোন্ বৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব?

গুরু। এই জন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক, শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না, সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য হিন্দুধর্ম্মে গুরুর এত মান। আর গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না। ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথা যখন বলিব, তখন এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলি।

(২) বৃত্তিসকলের এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের দ্বিতীয় প্রয়োজন, অথবা ধর্ম্মের দ্বিতীয় বিঘ্নের কথা পাওয়া যায়। যদি অন্যান্য বৃত্তিগুলি শারীরিকী বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানার্জ্জনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের জন্য শারীরিকী বৃত্তিসকলের সম্যক্ অনুশীলন চাই। বাস্তবিক ইহা প্রসিদ্ধ যে, শারীরিক শক্তিসকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে, মানসিক শক্তিসকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা অসম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালেজি শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে, ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক স্ফূর্ত্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে, কাজে কাজেই ধর্ম্মেরও অধোগতি ঘটে।

(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ত্ব বা তৃতীয় বিঘ্ন আরও গুরুতর। যাহার শারীরিক বৃত্তি-সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম,তাহার নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ কোথায়? সকলেরই শত্রু আছে, দস্যু আছে। ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন করে। তদ্ভিন্ন অনেক সময়ে যে বলে শত্রু দমন করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর্ম্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন অলঙ্ঘনীয় যে, পরম ধার্ম্মিকও এমন অবস্থায় অধর্ম্ম

অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাভারতকার, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ"* ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা করিয়াছেন। বলে দ্রোণাচার্য্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পরম ধার্ম্মিকও মিথ্যা প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। প্রাচীনকালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে; কিন্তু এখনকার সভ্যসমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া তাদৃশ প্রয়োজনীয়?

গুরু। রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে এত খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা, মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিসের বিজ্ঞাপন-সকল পড়িলে জানিতে পারিবে যে, যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার শরীর বা সম্পত্তিরক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুঝা কর্ত্তব্য। যখন তোমাকে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কথা বলিব, তখন বুঝিবে যে, আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, আপনার স্ত্রীপুত্র, পরিবার, স্বজন, কুটুম্ব, প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। যে ইহা করে না, সে পরম অধার্ম্মিক। অতএব যাহার তদুপযোগী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্ম্মিক।

(৪) আত্মরক্ষা বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্ম্মের চতুর্থ বিঘ্নের কথা উঠিতেছে। এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুতর; ধর্ম্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত, প্রাণ কি, সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথা বলিতেছি।

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম্ম। সমাজস্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্ব্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্ম্মের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। তেমনি বিবিধ সমাজের উপর কেহ একজন রাজা না থাকাতে, যে সমাজ বলবান্, সে দুর্ব্বল সমাজের কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। আজ ফ্রান্স জর্ম্মাণির কাড়িয়া খাইতেছে, কাল জর্ম্মাণি ফ্রান্সের কাড়িয়া খাইতেছে, আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রুস তুর্কের কাড়িয়া খায়, আজ Rhenish Fronteer, কাল পোলণ্ড, পরশু বুলগেরিয়া, আজ মিশর, কাল টুনিস। এই সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্যজাতিগণ কুকুরের মত হুড়াহুড়ি কামড়া-কামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন হাটের কুকুরেরা যে যার পায়, সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। দুর্ব্বল সমাজকে বলবান্ সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্ব্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম্ম, কেন না, এ স্থলে আপন ও পর উভয়ের রক্ষার কথা এবং ধর্ম্মোন্নতির পথ মুক্ত রাখিবারও কথা। তাহা বুঝাইতেছি।

সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্ম্মের উপযোগী আর কতকগুলি অনুপযোগী। কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির অনুকূল। আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির প্রতিকূল। অধিকাংশ সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায় প্রটেষ্টাণ্টদিগকে রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ। ঔরঙ্গজেবের হিন্দুধর্ম্মে বিদ্বেষ আর একটি উদাহরণ। সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা, নহে, বিলাতী আমদানী। লিবার্টী শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন, তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য।

* "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এমন কথাটা মহাভারতে নাই। "হতঃ কুঞ্জরঃ" এই কথাটা আছে।

শিষ্য। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই?

গুরু। তাহার অর্থ এমন নহে যে, সকলকে যুদ্ধ-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সকলের প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয় যে, বৃহৎ রাজ্য সে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে সকলকেই এই জন্য যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে যুদ্ধ, শ্রেণী-বিশেষের কাজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা ইহার উদাহরণ। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে, সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্ত্তৃক বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতিসকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সে দুর্দ্দশা হইত না। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণ করিয়া সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল। যদি তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় দুর্দ্দশা হইত।

শিষ্য। কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে?

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি, মাংস, পেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্য ব্যায়াম চাই। এ দেশে ডন, কুস্তী, মুগুর প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ইংরেজি সভ্যতা শিখিতে গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের বর্ত্তমান বুদ্ধিবিপর্য্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ।

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ অস্ত্রশিক্ষা। সকলেরই সর্ব্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত।

শিষ্য। কিন্তু এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ।

গুরু। সেটা একটা আইনের ভুল। আমরা মহারাণীর রাজভক্ত প্রজা। আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিব, ইহাই বাঞ্ছনীয়। আইনের ভুল পশ্চাৎ সংশোধিত হইতে পারে।

তার পর তৃতীয়তঃ অস্ত্রশিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা, শারীরিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণ জন্য প্রয়োজনীয়। যথা অশ্বারোহণ। ইউরোপে যে অশ্বারোহণ করিতে পারে না এবং যাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাসাস্পদ। বিলাতী স্ত্রীলোকদিগেরও এ সকল শক্তি হইয়া থাকে। আমাদের কি দুর্দ্দশা!

অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্ম্মশিক্ষা, পদব্রজে দূরগমন এবং সন্তরণও তাদৃশ। যোদ্ধার পক্ষে ইহা নহিলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়, এমন বিবেচনা করিও না। যে সাঁতার না জানে, সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু, যুদ্ধে কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও পরের রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয়, এমন নহে; আক্রমণ, নিক্রামণ ও পলায়ন জন্য অনেক সময় ইহার প্রয়োজন হয়। পদব্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য। মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। অতএব যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে সুপটু—

গুরু। এই ব্যায়ামমধ্যে মল্লযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষার ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল।*

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পদব্রজে দূরগমন—

গুরু। আরও চাই সহিষ্ণুতা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি সকলই সহ্য করিতে পারা চাই। ইহা ভিন্ন যুদ্ধার্থীর আরও চাই, প্রয়োজন হইলে মাটী কাটিতে পারিবে—ঘর বাঁধিতে পারিবে—মোট বহিতে পারিবে। অনেক সময়ে যুদ্ধার্থীকে দশ বার দিনের খাদ্য আপনার পিঠে বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। মূল কথা, যে কর্ম্মকার আপনার কর্ম্ম জানে, সে যেমন অস্ত্রখানি তীক্ষ্ণধার ও শাণিত করিয়া সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে, দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে—যেন তদ্দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে?

---

* লেখক-প্রণীত দেবী চৌধুরাণী নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণস্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এজন্য সে স্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে।

গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (৪) ইন্দ্রিয়সংযম। চারিটিই অনুশীলন।

শিষ্য। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, শুনিয়াছি। কিন্তু আহারসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কাঁচকলা-ভাতে ভাতের কথাটা স্মরণ করুন। তত্টুকু মাত্র আহার করাই কি ধর্ম্মানুমত? তাহার বেশী আহার কি অধর্ম্ম? আপনি ত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

গুরু। আমি বলিয়াছি, শরীররক্ষা ও পুষ্টির জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক কামনা করা অধর্ম্ম। শরীররক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন। ধর্ম্মোপদেষ্টার সে কাজ নহে। বোধ করি, তাঁহারা বলিবেন যে, কাঁচকলা-ভাতে ভাত শরীররক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নহে। কেহ বা বলিতে পারেন, বাচস্পতির ন্যায় যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই—বৈজ্ঞানিকের কর্ম্ম বৈজ্ঞানিক করুক। আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ, যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত—গীতা হইতে তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব।

আয়ুঃসত্ত্ব-বলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

যে আহার আয়ুর্বৃদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদবৃদ্ধিকারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া যায়, অর্থাৎ Nutritious এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাত্ত্বিকের প্রিয়।

শিষ্য। ইহাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য বিহিত, না নিষিদ্ধ হইল?

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্য্য। শারীরতত্ত্ববিৎ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিও যে, ইহা আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতিবর্দ্ধন ইত্যাদি গুণযুক্ত কি না।

শিষ্য। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ত এ সকল নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

গুরু। আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আসনে অবতরণ করা ধর্ম্মোপদেশকের বা ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অনুশীলনতত্ত্ব তাঁহাদের বিধি সকলের মূল ছিল, তাহা বুঝা যায়। মদ্য যে অনিষ্টকারী, অনুশীলনের হানিকর, এবং যাহাকেই তুমি ধর্ম্ম বল, তাহারই বিঘ্নকর, এ কথা বোধ করি, তোমাকে কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না। মদ্য নিষেধ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ভালই করিয়াছেন।

শিষ্য। কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহার্য্য নহে?

গুরু। যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়া মদ্য ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে বা অন্য দেশে শৈত্যাধিক্যনিবারণ জন্য ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদকালে ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে—ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট নহে। কিন্তু একটি এমন অবস্থা আছে যে, সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার।

শিষ্য। এমন কি অবস্থা আছে?

গুরু। যুদ্ধ। যুদ্ধকালে মদ্য সেবন করা ধর্ম্মানুমত বটে। তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তিতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মদ্যসেবনে সে সকলের বিশেষ স্ফূর্ত্তি জন্মে। এ কথা হিন্দুধর্ম্মের অননুমোদিত নহে। মহাভারতে আছে যে, জয়দ্রথবধের দিন অর্জ্জুন একাকী ব্যূহভেদ করিয়া শত্রুসেনামধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যকি ভিন্ন আর কেহই এমন বীর ছিল না, সে ব্যূহভেদ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে যায়। এ দুষ্কর কার্য্যে যাইতে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অনুমতি করিলেন। তদুত্তরে সাত্যকি উত্তম মদ্য চাহিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মদ্য দিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে পড়া যায় যে, স্বয়ং কালিকা অসুরবধকালে সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে চিনহটের যুদ্ধে ইংরেজ সেনা হিন্দু মুসলমান কর্ত্তৃক পরাভূত হয়। স্বয়ং Sir Henry Lowrence সে যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাসলেখক সার জন কে, ইহার একটি

কারণ এই নির্দ্দেশ করেন যে, ইংরেজসেনা সে দিন মদ্য পায় নাই। অসম্ভব নহে।

যাই হৌক, মদ্যসেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে, (১) বৃদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার, (২) পীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য কোন সময় সেবন করা অবিধেয়।

শিষ্য। মৎস্য-মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত?

গুরু। মৎস্য-মাংস শরীরের অনিষ্টকারী, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং উপকারী হইতে পারে। কিন্তু সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে। ধর্ম্মবেত্তার বক্তব্য এই যে, মৎস্য-মাংস প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কিয়ৎপরিমাণে বিরোধী। সর্ব্বভূতে প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব। অনুশীলনতত্ত্বেও তাই। অনুশীলন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত—ভিন্ন নহে। এই জন্যই বোধ হয়, হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা মৎস্য-মাংস-ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। মৎস্য-মাংস বর্জ্জিত করিলে শারীরিক বৃত্তি-সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি-রোধ হয় কি না? এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচার্য্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে যে, সমুচিত স্ফূর্ত্তিরোধ হয় বটে, তাহা হইলে প্রীতিবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইল। এমত অবস্থায় মৎস্যমাংস ব্যবহার্য্য। কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মোপদেষ্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয়মধ্যে (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা এবং (৩) আহারের কথা বলিলাম। এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয়সংযম সম্বন্ধেও একটা কথা বলা আবশ্যক। শারীরিক বৃত্তির সদনুশীলন জন্য ইন্দ্রিয়সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বোধ করি, বুঝাইতে হইবে না। ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষা নিষ্ফল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহা পরিপাকও হয় না। আর ইন্দ্রিয়ের সংযমই যে ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতে বলি যে, ইন্দ্রিয়সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন, মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছ যে, মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, তেমনি এখন দেখিতেছ যে, শারীরিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট, একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কথিত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না, এবং কতকগুলা বহি পড়িলে পণ্ডিত হয় না। পাণ্ডিত্যসম্বন্ধে এই প্রথাটা বড় অনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে।

নবম অধ্যায়।

—:০:—

জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি।

শিষ্য। শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলনসম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহা এই যে, অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এ সকল বৃত্তির অনুশীলনে যে সুখ, ইহাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইবে।

গুরু। ইহা প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপার্জ্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করা যায় না। শারীরিক বৃত্তির উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছি। ইহা ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে। তাহা বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না। ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করা যায় না।

শিষ্য। তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই? ঈশ্বর কি কেবল পণ্ডিতের জন্য?

গুরু। মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই। মূর্খের ধর্ম্ম নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতে যত জ্ঞানকৃত পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একটা ভ্রমসংশোধন করিয়া দিই। যে লেখাপড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে লেখাপড়া করিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান, পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে উপার্জ্জিত হইতে পারে, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র

হইতে পারে। আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাঁহারা প্রায় কেহই লেখা-পড়া জানিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের মত ধার্ম্মিকও পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু তাঁহারা বহি না পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে জ্ঞানোপার্জ্জনের কতকগুলি উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কথকতা ইহার মধ্যে একটি। প্রাচীনারা কথকের মুখে পুরাণেতিহাস শ্রবণ করিতেন। পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার নিহিত আছে। তচ্ছ্রবণে তাঁহাদিগের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকল পরিমার্জ্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত। তদ্ভিন্ন আমাদিগের দেশে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যে পুরুষপরম্পরায় একটি অপূর্ব্ব জ্ঞানের স্রোত চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহারা তাহার অধিকারিণী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাঁহারা শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় ভাল বুঝিতেন। উদাহরণস্বরূপ অতিথিসৎকারের কথাটা ধর। অতিথিসৎকারের মাহাত্ম্য জ্ঞানলভ্য, জাগতিক সত্যের সঙ্গে ইহা সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় অতিথির নামে জ্বলিয়া উঠেন, ভিখারী দেখিলে লাঠি দেখান। কিন্তু যে জ্ঞান ইঁহাদের নাই, প্রাচীনাদের ছিল, তাঁহারা অতিথিসৎকারের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, সে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী এবং আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় অজ্ঞানী, ইহাই বলিতে হইবে।

শিষ্য। ইহা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয়, ইংরেজি শিক্ষা-প্রণালীর দোষ।

গুরু। সন্দেহ নাই। আমি যে অনুশীলনতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইলাম, অর্থাৎ সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য পূর্ব্বক অনুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটি না বুঝাই এ দোষের কারণ।

কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য, এরূপ লোক-প্রতীতি আছে এবং তদনুরূপ কার্য্য হইতেছে। এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী। সেই শিক্ষাপ্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। এই মনুষ্যত্বতত্ত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতীকার করা যায়।

শিষ্য। সে সকল দোষ কি?

গুরু। প্রথম জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ; কার্য্যকারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ।

এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এ দেশে বাঙ্গালীরা অমানুষ হইতেছে; তর্ককুশল, বাগ্মী বা সুলেখক—ইহাই বাঙ্গালীর চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর হইতেছে, কোন দেশে রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী, পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, দুর্ব্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিকী বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকলগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, তাহাই মঙ্গলকর। সেগুলির অবহেলা আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত স্ফূর্ত্তি মঙ্গলদায়ক নহে। আমাদিগের সাধারণ লোকের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস এরূপ নহে। হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবান্ চন্দ্রে বা বলবান্ কার্ত্তিকেয়ে নিহিত হয় নাই, বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রহ্মায় অর্পিত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধর্ব্বরাজ বা বাগ্দেবীতে নহে। কেবল সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন—অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতিবিশিষ্ট ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিষ্ণুতে নিহিত হইয়াছে; অনুশীলন-নীতির মূলগ্রন্থি এই যে, সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।

শিষ্য। এই গেল একটি দোষ। আর?

গুরু। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয়ে শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদগ্ধপ্রাণ, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে অজ্ঞ—সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন, সুতরাং ধর্ম্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ—কিন্তু রাজধর্ম্মে অনভিজ্ঞ—অথবা যে

ক্ষত্রিয় রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ, কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি ধর্ম্মচ্যুত—এই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম।

শিষ্য। আপনার ধর্ম্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে।

গুরু। না, ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংবর্দ্ধিত করিতে হইবে।

শিষ্য। তাই হউক—কিন্তু সকলের কি তাহা সাধ্য? সকলের সকল বৃত্তিগুলি তুল্যরূপে তেজস্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক তেজস্বিনী, সাহিত্যানুযায়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে সে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে; কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না। এ স্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত?

গুরু। প্রতিভার বিচারকালে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। সেই কথায় ইহার উত্তর। তার পর তৃতীয় দোষ শুন।

জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, সংবর্দ্ধন অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন, বৃত্তির স্ফুরণ নহে। যদি কোন বৈদ্য রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি বা পরিপাকশক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি,—তেমনি এই জ্ঞানার্জ্জনবাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল মানসিক অজীর্ণ—বৃত্তি সকলের অবনতি। মুখস্থ কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট করিয়া বলিতে পার। তার পর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশক্ত্যবলম্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্ত্তারূপ বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের আঁচল ধরিয়া চলিল, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি বুড়োখোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহারার্জ্জনে সক্ষম হইল, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দ্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়—বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া তার নামাইয়া লইলে, তাহারা পালে-মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।

শিষ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত কোপদৃষ্টি কেন?

গুরু। আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কথা বলিতেছিলাম না। এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ। আমরা যে মহাপ্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিব মনে করি, তাঁহাদিগেরও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক।

শিষ্য। ইংরাজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হইয়া এত বড় কথা বলিতে সাহস করেন? আবার জ্ঞান পীড়াদায়ক?

গুরু। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হইয়াও বলি। আমি গোষ্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে, স্বীকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই—তিক্ত হইয়া উঠিবে। তবে ইংরেজের অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ পথে বাঙ্গালীর বুদ্ধি চলিতেছে; ইহা আমি না হয় স্বীকার করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা হয় ত আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। একটা আপত্তি মিটিল ত?

শিষ্য। জ্ঞান পীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজীর্ণ হইলে পীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান পীড়াদায়ক অর্থাৎ কতকগুলা কথা জানিয়াছি, কিন্তু যাহা যাহা জানিয়াছি, সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকলগুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই জানি না। গৃহে অনেক আলো জ্বলিতেছে, কেবল সিঁড়িটুকু অন্ধকার। এই জ্ঞানপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানে না। একজন ইংরেজ স্বদেশ হইতে নূতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোব্‌ড়া খাইয়া তাহা অখাদ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ দিল, "সাহেব, ছোবড়া খাইতে

নাই—আঁটি খাইতে হয়।" তার পর শাঁস আসিল। সাহেব মালীর উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া ছোব্ড়া ফেলিয়া দিয়া আঁটি খাইলেন। দেখিলেন, এবারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, "সাহেব, কেবল খোসাখানা ফেলিয়া দিয়া শাঁসটা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।" সাহেবের সে কথা স্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল। সাহেব তাহার খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহার পূর্ব্বক আধা কড়িতে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারীর ভোগে হয় না। তিনি ছোব্ড়ার জায়গায় আঁটি, আঁটির জায়গায় ছোব্ড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এরূপ জ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র।

শিষ্য। তবে কি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন?

গুরু। পাগল। ক্ষুরখানা শাণাইতে গেলে কি শূন্যের উপর শাণ দেওয়া যায়? জ্ঞেয় বস্তু ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে? জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জ্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, জ্ঞানার্জ্জন যেরূপ উদ্দেশ্য, বৃত্তির বিকাশও সেইরূপ মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জ্জনেই জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জনই বটে। কিন্তু যে অনুশীলন-প্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার ঠুসিয়া দেওয়া হইতে থাকে। পাকশক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধাবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, আধার-বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—ঠুসে গেলা। যেমন কতকগুলি অবোধ মাতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক অবনতি সংসাধিত করিয়া থাকে, তেমনই এখনকার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন।

জ্ঞানার্জ্জন ধর্ম্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক পাপ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষারূপ পাপ সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে।

দশম অধ্যায়।

—:*:—

মনুষ্যে ভক্তি।

শিষ্য। সুখ, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, পরিণতি, সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতা। বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, পরিণতি এবং সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। বৃত্তিগুলি শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী। ইহার মধ্যে শারীরিকী ও জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলনপ্রথা-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্টা কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন কি, সামঞ্জস্য বুঝিবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির উদাহরণে বুঝিয়াছি। নিকৃষ্টা কার্য্যকারিণী বৃত্তিসম্বন্ধে বোধ করি, আপনার আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, তাহাও বুঝিয়াছি। কিন্তু অনুশীলনতত্ত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। অবশিষ্ট যাহা শ্রোতব্য, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। এক্ষণে যাহাকে কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দ্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই দুইটি বৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ভক্তি ও প্রীতি।

শিষ্য। ভক্তি, প্রীতি, এ দুইটি কি একই বৃত্তি নহে? প্রীতি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই সে ভক্তি হইল না কি?

গুরু। যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপত্তি নাই; কিন্তু অনুশীলন জন্য দুটিকে পৃথক্ বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ ঈশ্বরে ন্যস্ত যে প্রীতি, সেই ভক্তি, এমন নহে। মনুষ্য—যথা রাজা, গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র। আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল প্রীতি জন্মিতে পারে।

কিন্তু ঈশ্বরভক্তির কথা এখন থাক্। আগে মনুষ্যে ভক্তির কথা বলা যাউক। যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না। (২) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না।

দেখা যাউক, মনুষ্যমধ্যে কে ভক্তির পাত্র।

(১) পিতা-মাতা ভক্তির পাত্র। তাঁহারা যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্বই অসম্ভব। ইহা শারীরিকী বৃত্তি আলোচনাকালে বুঝাইয়াছি। এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বতত্ত্বদর্শী, এজন্য হিন্দুধর্ম্মে গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি। পুরোহিত অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গলকামনা করেন, সর্ব্বথা আমাদের হিতানুষ্ঠান করেন এবং আমাদের অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা ও পবিত্রস্বভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র। যিনি কেবল চাল-কলার জন্য পুরোহিত, তিনি ভক্তির পাত্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম্মে ইহাও বলে যে, স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত; কেন না, হিন্দুধর্ম্ম বলে যে, স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্ম্মের অপেক্ষা কোম্‌ৎ-ধর্ম্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগ্য। যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্ম্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। গৃহধর্ম্মে ইঁহারা ভক্তির পাত্র; যাঁহারা ইঁহাদের স্থানীয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। গৃহমধ্যে যাহারা নিম্নস্থ, তাহারা যদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না করে, যদি পিতামাতাকে পুত্র, কন্যা বা বধূ ভক্তি না করে, যদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে, যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘৃণা করে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই—সে গৃহ নরকবিশেষ। এ কথা কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির উদ্রেক অনুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্ম্মেরও সেই উদ্দেশ্য বরং অন্যান্য ধর্ম্মের অপেক্ষা এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রাধান্য আছে। হিন্দুধর্ম্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, ইহা তদ্বিষয়ে অন্যতর প্রমাণ।

(২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ-পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্ত্তার ন্যায়, পিতা-মাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে, সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান্—নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। লর্ড রীপণ সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য সদুপায় দ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দু-ধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধর্ম্মে হউক বা না হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজভক্তির সে স্থান নাই। যেখানে আছে—যথা জর্ম্মাণি বা ইতালি, সেখানে রাজ্য উন্নতিশীল।

শিষ্য। সেই ইউরোপীয় রাজভক্তিটা আমার বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। লোকে রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে, ইহা বুঝিতে পারি, আক্‌বর বা অশোকের উপর ভক্তিও না হয় বুঝিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস বা পঞ্চদশ লুইর মত রাজার উপরে যে রাজভক্তি হয়, ইহার পর মনুষ্যের অধঃপতনের আর গুরুতর চিহ্ন কি হইতে পারে?

গুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু। যে দেশে একজন রাজা নাই—যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার কথা মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, রাজভক্তি কোন মনুষ্যবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। আমেরিকার কংগ্রেসের বা বৃটিশ পার্লিমেণ্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস ও পার্লিমেণ্ট ভক্তির পাত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন; কিন্তু তত্তৎসময়ের ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের রাজা তত্তৎপ্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র।

শিষ্য। তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা ঔরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে?

গুরু। কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্ত্তব্য। কেন না, রাজার স্বেচ্ছাচারিতার সমাজের অমঙ্গল। কিন্তু সে সকল কথা ভক্তিতত্ত্বে উঠিতেছে না, প্রীতিতত্ত্বের অন্তর্গত। আর একটা কথা বলিয়া রাজভক্তি সমাপ্ত করি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজপুরুষগণও

যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন-আপন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্ম্মতঃ সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পাত্র। তার পর তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য।

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে—কেন না, বেশী মাত্রা অসামঞ্জস্যের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের ভৃত্য—এ কথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা বিস্মৃত হইয়া রাজপুরুষের অপরিমিত তোষামোদ করিয়া থাকেন।

(৩) রাজার অপেক্ষাও যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, তাঁহারা ভক্তির পাত্র। গৃহস্থ গুরুর কথা গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুগণ কেবল গার্হস্থ্য গুরু নহেন, সামাজিক গুরু। যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিবলে পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা; তাঁহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্ম্মবেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেত্তা, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইঁহাদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইঁহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইঁহারা রাজাদিগেরও গুরু। রাজগণ ইঁহাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তবে সমাজশাসনে সক্ষম হয়েন। এ হিসাবে ভারতবর্ষ ভারতীয় ঋষিদিগের সৃষ্ট—এই জন্য ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু,যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গৌতম সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেও গলিলীও, নিউটন, কান্ত, কোম্‌ৎ, দান্তে, সেক্ষপীয়র প্রভৃতি সেই স্থানে।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য্য কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যাঁহার দ্বারা আমি যে পরিমাণে উপকৃত, তাঁহার প্রতি সেই পরিমাণে ভক্তিযুক্ত হইব?

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটেও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষকদিগের প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহরণস্বরূপ লইয়া বুঝিয়া দেখ। তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোনরূপ শাসিত হইবে না। তাহার মর্ম্মার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সহৃদয়তা না থাকিলে, তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। অতএব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইঁহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তির অনুশীলন পরম ধর্ম্ম।

শিষ্য। কৈ, এ ধর্ম্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধর্ম্মে শিখায় না?

গুরু। এটা অতি মূর্খের মত কথা। বরং হিন্দুধর্ম্মে ইহা যে পরিমাণে শিখায়, এমন আর কোন ধর্ম্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা,তাঁহারাই পুরাণবেত্তা,তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাঁহারাই কবি। তাই হিন্দুধর্ম্মের অনন্তজ্ঞানী উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছিল, বলিয়াই সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

শিষ্য। আধুনিক মত এই যে, ভণ্ড ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের চাল-কলার পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই দুর্জ্জয় ব্রহ্মভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে।

গুরু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, যাঁহারা তাহা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা তাঁহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। দেখ, বিধি-বিধান, ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার উপর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—

ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলের আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাণারিস জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য বাছিয়া বাছিয়া ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ঐশ্বর্য্যসম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে। একমন একধ্যান হইয়া লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে। তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজ-শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সে জন্য ব্রাহ্মণভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য; ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজনমধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ—সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য-নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক জর্ম্মাণি বা ইংলণ্ডবাসী—কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্ম্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক ছিল না।

শিষ্য। তা যাক্। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটিও বেচেন, কালী খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে?

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এইটুকু না বুঝাই ভারতবর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ভক্তি করিব।

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দুয়ানীতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম। মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য এইরূপ আছে,—"পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" পুনশ্চ বনপর্ব্বে অজগরপর্ব্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন,—"বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, অনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি শূদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—"অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্রবংশে হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশে হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।" এরূপ কথা আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধ গৌতমসংহিতায় ২১ অধ্যায়ে—

> ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
> তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥
> অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
> উপবাসরতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥
> ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
> চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে

শূদ্র। যাঁহারা অগ্নিহোত্রতৎপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

শিষ্য। যাক্। এক্ষণে বুঝিতেছি, মনুষ্যমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ভক্তি অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা এবং (৩) সমাজশিক্ষক। আর কেহ?

গুরু। (৪) যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে না আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধার্ম্মিক নীচজাতীয় হইলেও ভক্তির পাত্র।

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, বা অবস্থাবিশেষে ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা বা সম্মান বলিলেও চলে। যে কোন কার্য্য-নির্ব্বাহার্থে অপর ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি তাহার ভক্তির, নিতান্ত পক্ষে তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজীতে ইহার একটি বেশ নাম আছে—Subordination; এই নামে আগে Official Subordination মনে পড়ে। এ দেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই—কিন্তু যাহা আছে, তাহা বড় ভাল জিনিস নহে। ভক্তি নাই; ভয় আছে। ভক্তি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ভয় নিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে। ভক্তিশূন্য ভয়ের মত মানসিক অবনতির কতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, তাঁহাকে সম্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ অকারণ ভয় করিবে না। কিন্তু Official Subordination ভিন্ন অন্য একজাতীয় আজ্ঞাকারিতা প্রয়োজনীয়। সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা। ধর্ম্মকর্ম্ম অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। সে সকল কাজ সচরাচর পাঁচজনে মিলিয়া করিতে হয়—একজনে হয় না। যাহা পাঁচজনে মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে ঐক্য চাই। ঐক্যজন্য ইহাই প্রয়োজনীয় যে, একজন নায়ক হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্যের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে হইবে। এখানেও Subordination প্রয়োজনীয়। কাজেই ইহা একটি গুরুতর ধর্ম্ম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই। যে কাজ দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় সব বৃথা হয়। এমন অনেক সময় হয় যে, নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। এ স্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন—নহিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার করেন না। তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি এত অল্প।

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, সে বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিবে।

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান্ হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোম্‌ৎ "মানব-দেবীর" পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন ভক্তির অভাবে আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখ। হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা এই বিকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি সর্ব্বত্র সর্ব্বথাই সমান—কেহ কাহাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহা মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন "my dear father" অথবা বুড়ো বেটা। মাতা বাপের পরিবার। বড় ভাই জ্ঞাতিমাত্র। শিক্ষক মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চালকলালোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন,—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র—কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করিতে পারি না—কেন না, লক্ষ্মী আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ অত্যাচারকারী রাক্ষস। সমাজশিক্ষকেরা কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল—গালি ও বিদ্রূপের স্থান। ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া

কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধার্ম্মিককে "গো-বেচারা" বলিয়া দয়া করি—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব না, কাজেই ঐক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমাজের ভয়ে জড়সড় থাকি, কিন্তু সমাজকে ভক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য। উন্নতির জন্য ভক্তির যে এত প্রয়োজন, তাহা আমি কখন মনে করি নাই।

গুরু। তাই আমি ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মনুষ্যভক্তির কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়।

—:০:—

ঈশ্বরে ভক্তি।

শিষ্য। আজ ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি।

গুরু। যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই ঈশ্বরভক্তি-সম্বন্ধীয় উপদেশ; কেবল বলিবার এবং বুঝিবার গোল আছে। "ভক্তি" কথাটা হিন্দুধর্ম্মে বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং হিন্দুধর্ম্মে ইহা বড় প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবেত্তারা ইহা নানাপ্রকারে বুঝাইয়াছেন, এবং খৃষ্টাদি আর্য্যেতর ধর্ম্মবেত্তারাও ভক্তিবাদী। সকলের উক্তির সংশ্লেষ এবং অত্যুন্নত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, আমি ভক্তির যে স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাহা এক কথায় বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর এবং যত্ন পূর্ব্বক স্মরণ রাখিও নহিলে আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে।

শিষ্য। আজ্ঞা করুন।

গুরু। যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।

শিষ্য। বুঝিলাম না।

গুরু। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। অথবা—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়াছে।

শিষ্য। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ পর্য্যন্ত ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল বৃত্তির সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন।

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকল বৃত্তিগুলিই এই এক ভক্তিবৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি হইল। এই কথার দ্বারা বৃত্তিমধ্যে ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। ভক্তি ঈশ্বরার্পিতা হইলে আর সকল বৃত্তিগুলি উহার অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, ইহাই আমার কথার স্থূল তাৎপর্য্য। এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তির সমষ্টি ভক্তি।

শিষ্য। কিন্তু তাহা হইলে সামঞ্জস্য কোথা গেল? আপনি বলিয়াছেন যে, সকল বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফূর্ত্তিই মনুষ্যত্ব। সেই সমুচিত স্ফূর্ত্তির এই অর্থ করিয়াছেন যে, কোন বৃত্তির সমধিক স্ফূর্ত্তির দ্বারা অন্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই যদি এই এক ভক্তিবৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যদি অন্য বৃত্তিগুলিকে শাসিত করিতে লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রহিল?

গুরু। ভক্তির অনুবর্ত্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন করে না। মনুষ্যের বৃত্তিমাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃত্তির যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবর্ত্তী হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য, অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি, অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—তাহার আবার

অবরোধ কোথায়? ভক্তিশাসিশাসবহাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য।

শিষ্য। তবে আপনি যে মনুষ্যত্বতত্ত্ব এবং অনুশীলনধর্ম্ম আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য কি এই যে, ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরে ভক্তি?

গুরু। অনুশীলনধর্ম্মের মর্ম্মে এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম, ইহাই স্থায়ী সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ "ভক্তি", "প্রীতি", "শান্তি।" ইহাই ধর্ম্ম—ইহা ভিন্ন ধর্ম্মান্তর নাই। আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্তু তুমি এমন মনে করিও না যে, এই কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলনধর্ম্ম বুঝিলে।

শিষ্য। আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহা আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি। অনুশীলনধর্ম্মে এই তত্ত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আপনি বৃত্তি যে ভাগে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক বল, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা Faculty না হউক, একটা বৃত্তি বটে। অনুশীলনধর্ম্মের বিধানানুসারে ইহার সমুচিত অনুশীলন চাই। মনে করুন, রোগ, দারিদ্র্য, আলস্য বা তাদৃশ অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তির এই বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তি হয় নাই। তাহার কি ঈশ্বরভক্তি ঘটিতে পারে না?

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, তাহাই ভক্তি। ঐ ব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক, অল্প থাক, যতটুকু আছে, তাহা যদি ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানুমত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—আর অন্য বৃত্তিগুলিও সেইরূপ হয়, তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। তবে অনুশীলনের অভাবে ঐ ভক্তির কার্য্যকারিতার সেই পরিমাণে ত্রুটি ঘটিবে। একজন দস্যু একজন ভালমানুষকে পীড়িত করিতেছে। মনে কর, দুই ব্যক্তি তাহা দেখিল। মনে কর, দুই জনেই ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত; কিন্তু একজন বলবান্, অপর দুর্ব্বল। যে বলবান্, সে ভাল মানুষকে দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করিল। কিন্তু যে দুর্ব্বল, সে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। এই পরিমাণে, বৃত্তিবিশেষের অনুশীলনের অভাবে, দুর্ব্বল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ত্রুটি বলা যায় না। বৃত্তিসকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই, এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী না হইলেও মনুষ্যত্ব নাই। উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব। ইহাতে বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে। তাই বলিতেছিলাম যে, বৃত্তিগুলির ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মনুষ্যত্ব বুঝিলে না, তাহার সঙ্গে এটুকুও বুঝা চাই।

শিষ্য। এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ অনুসারে কার্য্য হইতে পারে না, তাহা উপদেশই নহে। সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ একটা বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায়?

গুরু। জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার কি স্মরণ হয়?

> ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি,
> যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
> তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা,
> ভস্মাবশেষং মদনঞ্চকার॥

এই ক্রোধ মহা পবিত্র ক্রোধ—কেন না, যোগভঙ্গকারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচবৃত্তি যে, ব্যাসদেবে ঈশ্বরানুবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্তু তুমি ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না।

শিষ্য। আরও আপত্তি আছে—

গুরু। থাকাই সম্ভব। "যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।" এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর তত্ত্ব নিহিত আছে যে, ইহা তুমি যে একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলযোগ ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র দেখিবে, হয় ত পরিশেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর, এই তত্ত্বের চিন্তা করিও, কার্য্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির ন্যায় ইহা ক্রমশঃ তোমার চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল বিবেচনা করিবে। মনুষ্যের শিক্ষণীয় এমন গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। একজন মনুষ্যের সমস্ত জীবন সৎশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া সে যদি শেষে এই তত্ত্বে

আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে।

শিষ্য। যাহা এরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহা আপনিই বা কোথায় পাইলেন?

গুরু। অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব?" "লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি, যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা-সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। "জীবন লইয়া কি করিব?" এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল, এই একমাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ত্ব কোথায় পাইলাম? সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি একদিনে ইহার কি বুঝিবে?

শিষ্য। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি যে, ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনার নিজের মত। আর্য্য ঋষিরা এ তত্ত্ব অনবগত ছিলেন।

গুরু। মূর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, যাহা আর্য্য ঋষিগণ জানিতেন না—আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি? আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি। তবে আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে কথায়, তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝান নাই। তোমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক, ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য। ভক্তি শাণ্ডিল্যের সময়ে যাহা ছিল, তাহাই আছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা আর্য্য ঋষিদিগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রত্নের যথার্থ স্বরূপ ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্র হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরে ডুব না দিলে, তদন্তর্নিহিত রত্নসকল চিনিতে পারা যায় না।

শিষ্য। আমার ইচ্ছা, আপনার নিকট তাঁহাদের কৃত ভক্তি-ব্যাখ্যা শুনি।

গুরু। শুনা নিতান্ত আবশ্যক, কেন না, ভক্তি হিন্দুরই জিনিস। খ্রীষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ আছে বটে, কিন্তু হিন্দুরই নিকট ভক্তির যথার্থ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা সবিস্তারে বলিবার বা শুনিবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলন-ধর্ম্ম বুঝা। তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই, স্থূল কথা তোমাকে বলিয়া যাইব।

শিষ্য। আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দুধর্ম্মের অংশ?

গুরু। না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্ম্মে ভক্তি নাই। বেদের ধর্ম্মের পরিচয়, বোধ হয়, তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য-দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্ম্মে উপাস্য-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর, হবিঃ ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ্ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, 'আমার পাপ ধ্বংস কর।' দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্যবস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্ম্ম বলে। কাম্যাদি কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, অতএব কাজ করিতে হইবে —এইরূপে ধর্ম্মার্জ্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগ-যজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথা ধর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না, ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে কর্ম্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন—সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়া-প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। এক দল চার্ব্বাক—তাঁহারা বলিলেন, কর্ম্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নেতা শাক্যসিংহ—তিনি বলিলেন, কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম্ম হইতে পুনর্জ্জন্ম, অতএব কর্ম্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্তসংযম পূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্তকারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে—সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা জানা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম—জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্ত্তি। ব্রহ্মনিরূপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক। দর্শনের মধ্যে কেবল পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্মবাদী—আর সকলই জ্ঞানবাদী।

শিষ্য। জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে পারি বটে, কিন্তু জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি পাওয়া যায়? ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন, বুঝিতে পারিলাম—বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত হইলাম? দুইকে এক করিয়া মিলাইয়া দিবে কে?

গুরু। যে না পারে, তাহার জন্য ভক্তিমার্গ। ভক্তিবাদী বলেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কিন্তু জানিতে পারিলে কি তাঁহাকে পাইলাম? অনেক জিনিস আমরা জানিয়াছি—জানিয়াছি বলিয়া কি তাহা পাইয়াছি? আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহাকেও ত জানি, কিন্তু তাহার সঙ্গে কি আমরা মিলিত হইয়াছি? আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ করি, তবে কি তাঁহাকে পাইব? বরং যাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা। যে শরীরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যিনি অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাঁহাকে পাইব, সেই প্রকার অনুরাগের নাম ভক্তি। শাণ্ডিল্যসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র এই—"সা (ভক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

শিষ্য। ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। ইহা না শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। শুনিয়া আর একটা কথা মনে উদয় হইতেছে। সাহেবেরা এবং দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এ দেশীয় পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া থাকেন, এবং পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দুধর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথা অতিশয় অযথার্থ। ভক্তিশূন্য যে ধর্ম্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম—অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্ম্মই নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা আধুনিক বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁহারা এ সকল ধর্ম্মের লোপ করিয়া, বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি।

গুরু। কথা যথার্থ, তবে ইহাও বলিতে হয় যে, বেদে যে ভক্তিবাদ কোথাও নাই, ইহাও ঠিক নহে। শাণ্ডিল্যসূত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত না থাকিলেও ভক্তিবাদের সার মর্ম্ম তাহাতে আছে। বচনটি এই—'আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতীতি।'

ইহার মর্ম্ম এই যে, আত্মা এই সকলই (অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে)। যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ (আপনার রাজা বা আপনার দ্বারা রঞ্জিত) হয়। ইহা যথার্থ ভক্তিবাদ।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তি।

ঈশ্বরে ভক্তি।—শাণ্ডিল্য।

গুরু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই ভক্তিতত্ত্বের প্রধান গ্রন্থ। কিন্তু গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইবার আগে ঐতিহাসিক প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু ভক্তিতত্ত্ব আছে, তাহা তোমাকে শুনান ভাল। বেদে এ কথা প্রায় নাই,ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা বলিয়াছি। যাহা আছে, তাহার সহিত শাণ্ডিল্য মহর্ষির নাম সংযুক্ত।

শিষ্য। যিনি ভক্তিসূত্রের প্রণেতা?

গুরু। প্রথমে তোমাকে আমার বলা কর্ত্তব্য যে, দুই জন শাণ্ডিল্য ছিলেন, বোধ হয়, একজন উপনিষদুক্ত এই ঋষি, আর একজন শাণ্ডিল্যসূত্রের প্রণেতা। প্রথমোক্ত শাণ্ডিল্য প্রাচীন ঋষি, দ্বিতীয় শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত। ভক্তিসূত্রের ৩১ সূত্রে প্রাচীন শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সূত্রকার প্রাচীন ঋষির নামে আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়াছেন। একণে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন।

গুরু। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন ঋষিপ্রণীত কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। বেদান্ত-সূত্রের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে সূত্রবিশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে কোলব্রুক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন,পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য। তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে ; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা যায় না যে, শাণ্ডিল্যই পঞ্চরাত্রের প্রণেতা। ফলে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য যে ভক্তিধর্ম্মের একজন প্রবর্ত্তক,—তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। কথিত ভাষ্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভক্তিবাদী শাণ্ডিল্যের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন,—

"বেদপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োহলব্ধা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্ ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ। তস্মাদসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধঃ।"

অর্থাৎ ইহাতে বেদের বিপ্রতিষেধ হইতেছে। চতুর্ব্বেদে পরং শ্রেয়ঃ লাভ না করিয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র অধিগমন করিয়াছিলেন। এই সকল বেদ-নিন্দা দর্শন করায় সিদ্ধ হইতেছে যে, এ সকল কল্পনা অসঙ্গত।

শিষ্য। কিন্তু এই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য ভক্তি-বাদে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু উপায় আছে কি?

গুরু। কিছু আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর।

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদ-মভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্-ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাঽস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ।"

অর্থাৎ, "সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্যবিহীন এবং আপ্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না। এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই ব্রহ্ম। এই লোক হইতে অপসৃত হইয়া,ইহাকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাঁহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন।"

এ কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপ-নিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া থাকেন। "শ্রদ্ধা" কথা ভক্তিবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে সংশয় থাকে না, এ সকল ভক্তির কথা বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদান্তসারে পাওয়া যায়, বেদান্তসার-কর্ত্তা সদানন্দাচার্য্য উপাসনা শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়া-ছেন—"উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপার-রূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি।"

এখন একটু অনুধাবন করিয়া বুঝ। হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে—অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা দুই রকমে বুঝিয়া থাকে। ঈশ্বর নির্গুণ এবং ঈশ্বর সগুণ। তোমাদের ইংরেজীতে যাহাকে "absolute" বা "unconditioned" বলে, তাহাই নির্গুণ। যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন উপাসনা হইতে পারে না,যিনি নির্গুণ,তাঁহার কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না, যিনি নির্গুণ,তাঁহার কোন Conditions of existence নাই বা বলা যাইতে পারে না—তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিয়া তাঁহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতে পারে। নির্গুণবাদে উপাসনা নাই। সগুণ বা ভক্তিবাদী, অর্থাৎ শাণ্ডিল্যাদিই উপাসনা করিতে পারেন।

অতএব বেদান্তসারের এই কথা হইতে দুইটি বিষয় সিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম সগুণবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য। আর ভক্তি সগুণবাদেরই অনুসারিণী।

শিষ্য। তবে কি উপনিষৎ-সমুদয় নির্গুণবাদী?

গুরু। ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নির্গুণবাদী আছে কি না সন্দেহ। যে প্রকৃত নির্গুণবাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয়। তবে জ্ঞানবাদীরা মায়া নামে ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন। সেই মায়াই এই জগৎসৃষ্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং ব্রহ্মে লীন হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। এই জ্ঞান ঠিক জানা নহে। সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, এবং শ্রদ্ধা এই ছয় সাধনা। ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন,অথবা বিধিপূর্ব্বক বিহিত-কর্ম্মের পরিত্যাগই উপরতি। শীতোষ্ণাদি-সহন তিতিক্ষা। মনের একাগ্রতা সমাধান। গুরুবাক্যাদিতে বিশ্বাস শ্রদ্ধা। সর্ব্বত্র এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে। কিন্তু ধ্যান-ধারণা-তপস্যাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত; অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাসনা আছে। উহা অনুশীলন বটে। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, উপাসনাও অনুশীলন। অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনুশীলনকে তুমি উপাসনা বলিতে পার। কিন্তু সে উপাসনা যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে। যথার্থ উপাসনা ভক্তি-প্রসূত। ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইতে হইবে, সে সময়ে এ কথা আর একটু স্পষ্ট হইবে।

শিষ্য। এক্ষণে আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে,সেই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্যই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্ত্তক?

গুরু। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শাণ্ডিল্যের নাম আছে, তেমনি দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরও নাম আছে। অতএব কৃষ্ণ আগে কি শাণ্ডিল্য আগে, তাহা আমি জানি না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি শাণ্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্ত্তক, তাহা বলিতে পারি না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—:০:—

ভগবদ্গীতা—স্থূল উদ্দেশ্য।

শিষ্য। এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্বের কথা শুনিবার বাসনা করি।

গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। কিন্তু প্রকৃত ভক্তির ব্যাখ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে অতি অল্পই আছে। দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত সকল অধ্যায়গুলির পর্য্যালোচনা না করিলে,গীতোক্ত প্রকৃত ভক্তিতত্ত্ব বুঝা যায় না। যদি গীতার ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে চাও, তাহা হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে। এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তি, তিনেরই কথা আছে,—তিনেরই প্রশংসা আছে। যাহা আর কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি। এইজন্য গীতা প্রকৃতপক্ষে ভক্তিশাস্ত্র।

শিষ্য। কথাগুলি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ করিয়া, রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, ইহাই গীতার বিষয়। অতএব ইহাকে ঘাতক শাস্ত্র বলাই বিধেয়, উহাকে ভক্তিশাস্ত্র বলিব কি জন্য?

গুরু। অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাঁহারা গ্রন্থের একখানা পাতা পড়িয়া মনে করেন, আমরা এই গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা এই শ্রেণীর পণ্ডিত,তাঁহারাই ভগবদ্গীতাকে ঘাতক শাস্ত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। স্থূল কথা এই যে, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। যুদ্ধ মাত্র যে পাপ নহে, এ কথা তোমাকে পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি।

শিষ্য। বুঝাইয়াছেন যে, আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মমধ্যে গণ্য।

গুরু। এখানে অর্জ্জুনে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত। কেন না, আপনার সম্পত্তি উদ্ধার—আত্মরক্ষার অন্তর্গত।

শিষ্য। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়,সেই এই কথা বলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নরপিশাচ-প্রধান

প্রথম নেপোলেয়ন ফ্রান্স রক্ষার ওজর করিয়া ইউরোপ নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছিল।

গুরু। তাঁহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখকের দ্বারা লিখিত হইবে, তখন জানিতে পারিবে, নেপোলেয়নের কথা মিথ্যা নহে। নেপোলেয়ন নরপিশাচ ছিলেন না। যাক্—সে কথা বিচার্য্য নহে। আমাদের বিচার্য্য এই যে, অনেক সময় যুদ্ধও পুণ্যকর্ম্ম।

শিষ্য। কিন্তু সে কখন্?

গুরু। এ কথার দুই উত্তর আছে। এক, ইউরোপীয় হিতবাদীর উত্তর। সে উত্তর এই যে, যুদ্ধে যেখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট করিয়া, কোটি কোটি লোকের হিতসাধন করা যায়, সেখানে যুদ্ধ পুণ্যকর্ম্ম। কিন্তু কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ লোককেই বা সংহার করিবার আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারতবর্ষীয়। এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক। হিন্দুর সকল নীতির মূল আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক। সেই মূল, যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদরূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্ত্বের উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় না। তাই গীতাকার অর্জ্জুনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কল্পিত করিয়া তদুপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্ম্মের আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শিষ্য। কথাটা কিরূপে উঠিতেছে?

গুরু। ভগবান্ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। প্রথমে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা প্রভৃতি, যাহা জ্ঞানের বিষয়। ইহা জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন;—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩।৩॥

ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া কর্ম্মযোগ সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। এই জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে পারিবে যে, গীতা ভক্তিশাস্ত্র—তাই এত সবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায় গীতার পরিচয় দিতেছি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

—:০:—

ভগবদ্গীতা—কর্ম্ম।

গুরু। এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কর্ম্মযোগ বুঝাইতেছি; কিন্তু তাহা শুনিবার আগে ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মনুষ্যের যে অবস্থায় সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাভিমুখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা ঘটে, তাহাই ভক্তি। এক্ষণে শ্রবণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়া অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥৩।৫॥

কেহই কখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে প্রকৃতিজাত গুণসকলের দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব কর্ম্ম করিতেই হইবে। কিন্তু সে কি কর্ম্ম?

কর্ম্ম বলিলে বেদোক্ত কর্ম্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার প্রসাদার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য-কর্ম্ম বুঝাইত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীতোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরম্ভ। সেই বেদোক্ত কাম্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন
বিধীয়তে॥ ২।৪২।৪৪॥

"যাহারা বক্ষ্যমাণরূপ শ্রুতিসুখকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশূন্য। যাহারা বেদবাক্যে রত হইয়া, ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছু নাই, ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা কামপরবশ হইয়া স্বর্গই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া, জন্মই কর্ম্মের ফল, ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা (কেবল) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্যমাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা

অতি মূর্খ। এইরূপ বাক্যে অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না।"

অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্ম বা কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নহে। অথচ কর্ম্ম করিতেই হইবে। তবে কি কর্ম্ম করিতে হইবে? যাহা কাম্য নহে, তাহাই নিষ্কাম। যাহা নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা কর্ম্মমার্গ মাত্র, কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

শিষ্য। নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলি?

গুরু। নিষ্কাম কর্ম্মের এই লক্ষণ ভগবান্ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

> কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ২।৪৭॥

অর্থাৎ তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কদাচ কর্ম্মফলে যেন না হয়। কর্ম্মের ফলার্থী হইও না, কর্ম্মত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক।

অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

শিষ্য। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্ম্ম করিব কেন? যদি পেট ভরিবার আকাঙ্ক্ষা না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন?

গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া ভগবান্ পর-শ্লোকে ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন,—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।"

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। প্রথম সঙ্গ কি?

গুরু। আসক্তি। যে কর্ম্ম করিতেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ না থাকে। ভাত খাওয়ার কথা বলিতেছিলে। ভাত খাইতে হইবে, সন্দেহ নাই, কেন না, "প্রকৃতিজগুণে" তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্তু আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে অনুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না।

শিষ্য। আর "যোগস্থ" কি?

গুরু। পর-চরণে তাহা কথিত হইতেছে।

> যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
> সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ
> উচ্যতে॥২।৪৮॥

কর্ম্ম করিবে, কিন্তু কর্ম্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে, তোমার যতদূর কর্ত্তব্য, তাহা তুমি করিবে, তাতে তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধাসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান্ যোগ বলিতেছেন। এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান।

শিষ্য। এখনও বুঝিলাম না। আমি সিঁধকাটি লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে যাইতেছি। কিন্তু আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম না। তার জন্য দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, "আচ্ছা, হ'লো হ'লো না হ'লো না হ'লো।" আমি কি নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম?

গুরু। কথাটা ঠিক সোনার পাথরবাটীর মত হইল। তুমি মুখে হ'লো হ'লো না হ'লো না হ'লো বল আর নাই বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায় কর, তাহা হইলে তুমি কখনই মনে এরূপ ভাবিতে পারিবে না। কেন না, চুরির ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, তুমি কখনও চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে "কর্ম্ম" বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। "কর্ম্ম" কি, তাহা পরে বুঝাইতেছি। কিন্তু চুরি "কর্ম্ম"মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর নাই। এজন্য ঈদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানকে সৎ ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না।

শিষ্য। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা পূর্ব্বেই করিয়াছি। মনে করুন, আমি বিড়ালের মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম দি সাইলেণ্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, দুইয়েতেই আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে। অর্থাৎ উদরপূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাতের পাতে বসিতে হইবে, এবং দেশের দুঃখনিবারণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গুরু। ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি যদি উদরপূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাত খাইতে ব'সো, তবে তোমার কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না। তুমি যদি দেশের দুঃখ নিজের দুঃখ তুল্য বা তদধিক ভাবিয়া তাহার উদ্ধারে চেষ্টা করিলে, তাহা হইলেও কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না।

শিষ্য। যদি সে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে কেনই এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব?

গুরু। কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া। আহার এবং দেশোদ্ধার উভয়ই তোমার অনুষ্ঠেয়, চৌর্য্য তোমার অনুষ্ঠেয় নহে।

শিষ্য। তবে কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা কি প্রকারে জানিব ? তাহা না বলিলে ত নিষ্কাম ধর্ম্মের গোড়াই বুঝা গেল না ?

গুরু। এ অপূর্ব্ব-ধর্ম্ম-প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা বলিতেছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩৯ ॥

এখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর। আমার কথায় তোমার ইহা বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের কথার উপর নির্ভর কর। তিনি এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরস্তদর্থম্।"

তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধনমাত্র, (অনুষ্ঠেয় নহে), অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্মই করিবে। ইহার ফল দাঁড়ায় কি ? দাঁড়ায় যে, সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্ম্মই নামান্তরে ভক্তি। এইরূপে কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য। কর্ম্মের সহিত ভক্তির ঐক্য স্থানান্তরে আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।"

অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিতে কর্ম্মসকল আমাতে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও বিকারশূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

শিষ্য। ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে ?

গুরু। "অধ্যাত্মচেতসা" এই বাক্যের সঙ্গে "সংন্যস্য" শব্দ বুঝিতে হইবে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "অধ্যাত্মচেতসা" শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "অহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা।" "কর্ত্তা যিনি ঈশ্বর, তাঁহারই জন্য, তাঁহার ভৃত্যস্বরূপ এই কাজ করিতেছি;" এইরূপ বিবেচনায় কাজ করিলে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ হইল।

এখন এই কর্ম্মযোগ বুঝিলে ? প্রথমতঃ কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই কর্ম্ম। যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিবে। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে, অর্থাৎ কর্ম্ম তাঁহার, আমি তাঁহার ভৃত্যস্বরূপ কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবে, তাহা হইলেই কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইল।

ইহা করিতে গেলে কার্য্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে, অতএব কর্ম্মযোগই ভক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে ইহার ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখিলে, এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব, অপূর্ব্ব ধর্ম্ম কেবল গীতাতেই আছে। এরূপ আশ্চর্য্য ধর্ম্মব্যাখ্যা আর কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখনও প্রাপ্ত হও নাই। কর্ম্মযোগেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল না; কর্ম্ম ধর্ম্মের প্রথম সোপানমাত্র। কাল তোমাকে জ্ঞানযোগের কথা কিছু বলিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—:*:—

ভক্তি।

ভগবদ্গীতা—জ্ঞান।

গুরু। এক্ষণে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবদুক্তির সারমর্ম্ম শ্রবণ কর। কর্ম্মের কথা বলিয়া চতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার-কথন-সময়ে বলিতেছেন,—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥৪।১০॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকে বিগতরাগ-ভয়-ক্রোধ, মন্ময় (ঈশ্বরময়) এবং আমার উপাশ্রিত হইয়া জ্ঞানতপের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিষ্য। এই জ্ঞান কি প্রকার ?

গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদয় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়। যথা—

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৪।৩৫॥

শিষ্য। সে জ্ঞান কিরূপে লাভ করিব ?

গুরু। ভগবান্ তাহার উপায় এই বলিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৪।৩৪॥

অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীদিগের নিকট তাহা অবগত হইবে।

শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট

করিয়া প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্নের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন।

গুরু। তাহা আমি পারি না, কেন না, আমি জ্ঞানীও নহি, তত্ত্বদর্শীও নহি। তবে একটা মোটা সঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি।

জ্ঞানের দ্বারা সমুদয় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে?

শিষ্য। ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর।

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ ঊনবিংশতাব্দীতে কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry—গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই—Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্ঞা করিবে।

শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিব কিসে?

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।

শিষ্য। তবে জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলই জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

গুরু। যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে করিলেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞানার্জনী বৃত্তি-সকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনী বৃত্তি-সকলের উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইলে সেই সঙ্গে অনুশীলন-ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে যদি ভক্তিবৃত্তিরও সম্যক স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়া থাকে,তবে, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে পৌঁছিবে। অনুশীলনধর্ম্মেই যেমন কর্ম্মযোগ, অনুশীলনধর্ম্মেই তেমনই জ্ঞানযোগ।

শিষ্য। আমি গণ্ডমূর্খের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনধর্ম্ম সকলই উল্টা বুঝিয়াছিলাম; এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি।

গুরু। এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর।

শিষ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্ম্মের পূর্ণতা হইতে পারে? তাহা হইলে পণ্ডিতই ধার্ম্মিক।

গুরু। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে,সে ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ, তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না হইলেও সে জ্ঞানী। শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিতেছেন না যে, কেবল জ্ঞানেই তাঁহাকে কেহ পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥৪।১০ ॥

অর্থাৎ যাহারা সংযতচিত্ত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানের দ্বারা পূত হইয়া তাঁহাকে পায়। আসল কথা, কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের এমন মর্ম্ম নহে যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সংযোগ চাই। * কেবল কর্ম্মে হইবে না, কেবল জ্ঞানেও নহে। কর্ম্মেই আবার জ্ঞানের সাধন, কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। ভগবান্ বলিতেছেন,—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে ॥৬।৩॥

যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু, কর্ম্মই তাঁহার তদারোহণের কারণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এখানে ভগবদ্বাক্যের অর্থ এই যে, কর্ম্মযোগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না, চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে পৌঁছান যায় না।

শিষ্য। তবে কি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে?

গুরু। উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই।

* বলা বাহুল্য যে, এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্যের মতের বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে জ্ঞান কর্ম্মে সমুচ্চয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের মতের যাহা বিরোধী, শিক্ষিত-সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথায় এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, তাহা আমি জানি। পক্ষান্তরে, ইহাও কর্ত্তব্য যে, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ভক্তিবাদিগণ শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী নন, এবং অনেক পূর্ব্বগামী পণ্ডিত শঙ্করের মতের বিরোধী বলিয়াই তাঁহাকে স্বপক্ষসমর্থন জন্য ভাষ্যের মধ্যে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে।

যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪।৪১॥

হে ধনঞ্জয়! কর্ম্মযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সন্ন্যস্ত-কর্ম্মা এবং জ্ঞানের দ্বারা যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্‌কে কর্ম্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না।

তবেই চাই, (১) কর্ম্মের সন্ন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এইরূপে কর্ম্মবাদের ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্ম্ম-প্রণেতৃশ্রেষ্ঠ ভূতলে মহামহিমময় এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত করিলেন। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর, কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া পরমার্থ-তত্ত্বে সংশয়চ্ছেদন কর। এই জ্ঞানও ভক্তিতে যুক্ত। কেন না,—

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥৫।১৭॥

ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা তৎ-পরায়ণ, তাহাদের পাপ-সকল জ্ঞানে নির্ধূত হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। এখন বুঝিতেছি যে, এই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমবায়ে ভক্তি। কর্ম্মের জন্য প্রয়োজন—কার্য্য-কারিণী ও শারীরিকী বৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্য চাই—জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঐরূপ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। আর চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি?

গুরু। সেইরূপ হইবে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকল বুঝাইবার সময় বলিব।

শিষ্য। তবে মনুষ্যের সমুদয় বৃত্তি উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলে, এই গীতোক্ত জ্ঞানকর্ম্মন্যাস যোগে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন ভক্তিবাদ। মনুষ্যত্ব অনুশীলনধর্ম্ম যাহা আমাকে শুনাইয়াছেন, তাহা গীতোক্ত ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র।

গুরু। ক্রমে এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

ষোড়শ অধ্যায়।

—:o:—

ভক্তি।

ভগবদ্গীতা—সন্ন্যাস।

গুরু। তার পর আর একটা কথা শোন। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে যৌবনে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়, মধ্য-বয়সে গৃহস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্ম্মে ঠিক তাহা বলা হয় নাই, বরং কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে, এমন কথা বলা হইয়াছে। ইহাই সত্য কথা, কেন না, অধ্যয়নও কর্ম্মের মধ্যে এবং কেবল অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সে যাই হউক, মনুষ্যের এমন একদিন উপস্থিত হয় যে, কর্ম্ম করিবার সময়ও নহে, জ্ঞানোপার্জ্জনের সময়ও নহে। তখন জ্ঞান উপার্জ্জিত হইয়াছে, কর্ম্মেরও শক্তি বা প্রয়োজন আর নাই। হিন্দুশাস্ত্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবার বিধি আছে। তাহাকে সচরাচর সন্ন্যাস বলে। সন্ন্যাসে স্থূল মর্ম্ম কর্ম্মত্যাগ। ইহাও মুক্তির উপায় বলিয়া ভগবৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, বরং তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, যদিও জ্ঞানযোগে আরোহণ করিবার যে ইচ্ছা করে, কর্ম্মই তাহার সহায়, কিন্তু যে জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছে, কর্ম্মত্যাগ তাহার সহায়।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৬।৩॥

শিষ্য। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা। তবে কি সংসারত্যাগ একটা ধর্ম্ম? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বিহিত?

গুরু। পূর্ব্বগামী হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের তাহাই মত বটে। জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ যে তাহার সাধনের সাহায্য করে, তাহাও সত্য। এ বিষয়ে ভগবদ্বাক্যই প্রমাণ। তথাপি কৃষ্ণোক্ত এই পুণ্যময় ধর্ম্মের এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ কর্ম্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ করিবে। ভগবান্ বলেন যে, কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥৫।২॥

শিষ্য। তাহা কখনই হইতে পারে না। অন্ন-ত্যাগটা যদি ভাল হয়, তবে অন্ন কখন ভাল নহে।

কর্ম্মত্যাগ যদি ভাল হয়, তবে কর্ম্ম ভাল হইতে পারে না। জয়-ত্যাগের চেয়ে কি জয় ভাল?

গুরু। কিন্তু এমন যদি হয় যে, কর্ম্ম রাখিয়াও কর্ম্মত্যাগের ফল পাওয়া যায়?

শিষ্য। তাহা হইলে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কেন না, তাহা হইলে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ উভয়েরই ফল পাওয়া গেল।

গুরু। ঠিক তাই। পূর্ব্বগামী হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ—কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ। গীতার উপদেশ—কর্ম্ম এমন চিত্তে কর যে, তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে আবার বেশী কি আছে? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিষ্প্রয়োজনীয় দুঃখ।

> জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
> নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥
> সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
> একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥
> যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
> একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
> সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
> যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥৫।৩-৬॥

"যাহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহাকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিও। হে মহাবাহো! তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষেরাই সুখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। (সাংখ্য) সন্ন্যাস ও (কর্ম্ম) যোগ যে পৃথক্‌, ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিতে নহে। একের আশ্রয়ে, একত্রে উভয়েরই ফল লাভ করা যায়। সাংখ্যে (সন্ন্যাসে)* যাহা পাওয়া যায়, (কর্ম্ম) যোগেও তাই পাওয়া যায়। যিনি উভয়কে একই দেখেন,তিনিই যথার্থদর্শী। হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ বিনা সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। যোগযুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্ম পায়েন।" মূল কথা এই যে, যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তে সকল কর্ম্মসম্বন্ধেই সন্ন্যাসী, তিনিই ধার্ম্মিক।

শিষ্য। এই পরম বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এখন বৈরাগীরা ডোর-কৌপীন পরিয়া সং সাজিয়া বেড়ায় কেন, বুঝিতে পারি না। ইংরেজেরা যাহাকে Asceticism বলেন, বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না, এখন দেখিতেছি। এই পরম পবিত্র ধর্ম্মে সেই পাপের মূলচ্ছেদ হইতেছে। অথচ এমন পবিত্র, সর্ব্বব্যাপী, উন্নতিশীল বৈরাগ্য আর কোথাও নাই। ইহাতে সর্ব্বত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্ম্ম বৈরাগ্য অথচ (Asceticism) কোথাও নাই। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর্ম্ম জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। গীতা থাকিতে লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কোরাণে ধর্ম্ম খুঁজিতে যায়, ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই ধর্ম্মের প্রথম প্রচারকের কাছে কেহই ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। এ অতিমানুষ-ধর্ম্মপ্রণেতা কে?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনের রথে চড়িয়া কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন,তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না,বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, এ কথাও বলা যাইতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণ যে গীতোক্ত ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, এক নিষ্কামবাদের দ্বারা সমুদয় মনুষ্যজীবন শাসিত এবং নীতি ও ধর্ম্মের সকল উচ্চতত্ত্ব একতাপ্রাপ্ত হইয়া পবিত্র হইতেছে, কাম্যকর্ম্মের ত্যাগই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে।

> কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
> সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥১৮।২॥

যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।

শিষ্য। মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে?

গুরু। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুইই তোমাদের হাতে, এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্ত্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মহীন সন্ন্যাস নিকৃষ্ট সন্ন্যাস।

* "সাংখ্য" কথাটির অর্থ লইয়া আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পারে। যাঁহাদিগের এমত সন্দেহ হইবে, তাঁহারা শাঙ্করভাষ্য দেখিবেন।

কর্ম্ম বুঝাইয়াছি—ভক্ত্যাত্মক। অতএব এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত্যাত্মক কর্ম্মযুক্ত সন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস।

সপ্তদশ অধ্যায়।

--:*:--

ভক্তি।

ধ্যানবিজ্ঞানাদি।

গুরু। ভগবদ্গীতা পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে সৈন্যদর্শন, দ্বিতীয়ে জ্ঞানযোগের স্থূলাভাস, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কর্ম্মযোগ, চতুর্থে জ্ঞান-কর্ম্মন্যাসযোগ, পঞ্চমে সন্ন্যাসযোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি। ষষ্ঠে ধ্যানযোগ। ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, সুতরাং উহার পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন নাই। যে ধ্যানমার্গাবলম্বী, সে যোগী। যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্রগম্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধ হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ—নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া বার বৎসর এক ঠাঁই বসিয়া চোখ বুজিয়া ভাবিলে যোগ হয় না। কিন্তু যোগীর মধ্যেও প্রধান ভক্ত—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥৬।৪৭॥

যে আমাতে আসক্তমনা হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, আমার মতে যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ। ইহাই ভগবদ্ভক্তি। অতএব এই গীতোক্ত ধর্ম্মে জ্ঞান, কর্ম্ম, ধ্যান, সন্ন্যাস—ভক্তি ব্যতীত কিছুই সম্পূর্ণ নহে। ভক্তিই সর্ব্বসাধনের সার।

সপ্তমে বিজ্ঞানযোগ। ইহাতেই ঈশ্বর আপন স্বরূপ কহিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে নির্গুণ ও সগুণ, অর্থাৎ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বিশদরূপে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। অতএব ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়।

অষ্টমে তারকব্রহ্মযোগ। ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিযোগ। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবম অধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগুহ্যযোগ। ইহাতে অতিশয় মনোহারিণী কথা-সকল আছে। ইতিপূর্ব্বে জগদীশ্বর একটি অতিশয় মনোহর উপমার দ্বারা আপনার সহিত জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন—"যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।" অষ্টমে আর একটি সুন্দর উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা—

"আমার আত্মা ভূত-সকল ধারণ ও পালন করিতেছে, কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্ব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে।" হর্বর্ট স্পেন্সরের নদীর উপর জলবুদ্বুদের উপমা অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে শ্রেষ্ঠ।

শিষ্য। চক্ষু হইতে আমার ঠুলি খসিয়া পড়িল। আমার একটা বিশ্বাস ছিল—যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদটা Pantheism মাত্র। এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

গুরু। ইংরেজি সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকলের আলোচনার দোষ ঐ। আমাদের মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টম্বলরে না খাইলে তাঁহাদের জল মিষ্ট লাগে না। তোমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ হয় যে, মনুষ্যমাত্রেই—মূর্খ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,—সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরূপে পরিত্রাণের অধিকারী, এ সাম্যবাদ শাক্যসিংহের ধর্ম্মে ও খ্রীষ্টধর্ম্মেই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ হিন্দুধর্ম্মে নাই। এই অধ্যায়ের দুইটা শ্লোক শ্রবণ কর।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥৯।২৯॥

*　　*　　*　　*

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা-
স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥৯।৩২॥

"আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান, কেহ আমার দ্বেষ্য বা কেহ প্রিয় নাই; যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে। * * * পাপযোনিও আশ্রয় করিলে পরা গতি পায়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক, সকলেই পায়।"

শিষ্য। এটা বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গুরু। কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে এই একটা পাগ্‌লামি প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে, ৫৪৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ মরিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত করিতে শিখিয়াছ যে, যাহা কিছু ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দুধর্ম্ম এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী যে, ভাল জিনিস কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। এই অনুকরণপ্রিয় সম্প্রদায় ভুলিয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম নিজেই এই হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল ত আর কোন ভাল জিনিস কি তাহা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না?

শিষ্য। যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার এ রাগটুকু সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে রাজগুহ্যযোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই।

গুরু। রাজগুহ্যযোগ সর্ব্বপ্রধান সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই, যদিও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে ভাবে চিন্তা করে, সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পায়। যাঁহারা দেবদেবীর সকাম উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহে সিদ্ধকাম হইয়া স্বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা নিষ্কাম বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন, কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। তবে যাঁহারা সকাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা যে ভাবান্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পান না, তাহার কারণ, সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরন্তু ঈশ্বরের নিষ্কাম উপাসনাই মুখ্য উপাসনা, ভক্তির ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অতএব সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করাই ধর্ম্ম ও মোক্ষের উপায়। এই রাজগুহ্যযোগ ভক্তিপূর্ণ।

সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাঁহার বিভূতি সকল কথিত হইতেছে এ বিভূতিযোগ অতি বিচিত্র; কিন্তু এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। দশমে বিভূতি সকল বিবৃত করিয়া তাহার প্রত্যক্ষস্বরূপ একাদশে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই ভক্তিযোগ শুনাইব।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

—:*:—

ভক্তি।

ভগবদ্গীতা—ভক্তিযোগ।

শিষ্য। ভক্তিযোগ বলিবার আগে একটা কথা বুঝাইয়া দিন। ঈশ্বর এক, কিন্তু সাধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না।

গুরু। সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে সকল সময়ে সোজা পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় যে সোজা পথ, দুই একজন বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সাধারণের জন্য ঘুরাণ-ফিরাণ পথই বিহিত। এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেহ সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে। যে সংসারী, তাহার পক্ষে কর্ম্ম; যে অসংসারী, তাহার পক্ষে সন্ন্যাস। যে জ্ঞানী অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয়, অর্থাৎ যে যোগী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠ রাজগুহ্যযোগই প্রশস্ত। অতএব সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

তিনি করুণাময়—যাহাতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম্ম সোজা হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

শিষ্য। কিন্তু আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল সাধনের অন্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বিহিত বলিলেই সকলের পক্ষে পথ সোজা হইত।

গুরু। কিন্তু ভক্তির অনুশীলন চাই। তাই বিবিধ সাধন, বিবিধ অনুশীলনপদ্ধতি। আমার কথিত অনুশীলনতত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে এ কথা শীঘ্র বুঝিবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলনপদ্ধতি বিধেয়। যোগ সেই অনুশীলন-পদ্ধতির নামান্তর মাত্র।

শিষ্য। কিন্তু যে প্রকারে এই সকল যোগ কথিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাধনবিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেকের পক্ষে দুই-ই সাধ্য। যাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য, সে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? দুই-ই ভক্তি বটে জানি, তথাপি জ্ঞানবুদ্ধিময়ী ভক্তি আর কর্ম্মময়ী ভক্তিমধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

গুরু। দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে এই প্রশ্নই অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং এই প্রশ্নের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ। এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্যই গীতার পূর্ব্বগামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর বুঝা যায় না।

শিষ্য। কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন?

গুরু। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক ও ঈশ্বরভক্ত উভয়েই ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মোপাসকেরা অধিকতর দুঃখ ভোগ করে; ভক্তেরা সহজে উদ্ধৃত হয়।

> ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
> অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
> যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
> অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
> তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ॥১২।৫—৭॥

শিষ্য। এক্ষণে বলুন, তবে এই ভক্ত কে?

গুরু। ভগবান্ স্বয়ং তাহা বলিতেছেন।

> অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
> নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
> সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
> ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
> যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
> হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
> অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
> সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
> যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
> শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
> সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
> শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
> তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
> অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
> যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
> শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে
> প্রিয়াঃ॥ ১২।১৩-২০॥

"যে মমতাশূন্য (অর্থাৎ যার 'আমার! আমার!' জ্ঞান নাই), অহংকারশূন্য, যাহার সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতাত্মা এবং দৃঢ়সঙ্কল্প, যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এমন যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, যে হর্ষ, অমর্ষ, ভয় এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সেই আমার প্রিয়। যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, অথচ সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাহার কিছুতে হর্ষ নাই অথচ দ্বেষও নাই, যিনি শোকও করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, এমন যে ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোষ্ণ, সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আসঙ্গবিবর্জ্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যিনি যে কিছু যাহা সন্তুষ্ট, এবং যিনি সর্ব্বদা আশ্রয়ে থাকেন না এবং স্থিরমতি, সেই ভক্ত আমার প্রিয়। এই ধর্ম্মামৃত যেমন বলিয়াছি, যে সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাবান্ আমার পরমভক্ত, আমার অতিশয় প্রিয়।"

এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক্ ঠক্ করিয়া, হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না,

হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না, যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই। এরূপ উদার এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই। এই জন্য ভগবদ্গীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

— :০: —

ভক্তি।

ঈশ্বরে ভক্তি।—বিষ্ণুপুরাণ।

গুরু। ভগবদ্গীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলিবার একণে আমাদের প্রয়োজন নাই। একণে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত্রের আমরা সমালোচনা করিব। বিষ্ণুপুরাণে দুইটি ভক্তের কথা আছে, সকলেই জানেন, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ। এই দুই জনের ভক্তি দুই প্রকার। যাহা বলিয়াছি,তাহাতে বুঝিয়াছ, উপাসনা দ্বিবিধ,—সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম যে উপাসনা, সেই কাম্য-কর্ম্ম, নিষ্কাম যে উপাসনা, সেই ভক্তি। ধ্রুবের উপাসনা সকাম,—তিনি উচ্চপদলাভের জন্যই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্তি নহে। ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা নিষ্কাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্য ঈশ্বরে ভক্তিমান হয়েন নাই, বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান হওয়াতে বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও, তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই। এই নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহ্লাদই পরম ভক্ত। বোধ হয়, গ্রন্থকার সকাম ও নিষ্কাম উপাসনার উদাহরণস্বরূপ এবং পরস্পরের তুলনার জন্য ধ্রুব ও প্রহ্লাদ এই দুইটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার রাজযোগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি,তাহা যদি তোমার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, সকাম উপাসনাও একেবারে নিষ্ফল নহে। যে যাহা কামনা করিয়া উপাসনা করে, সে তাহা পায়, কিন্তু ঈশ্বর পায় না। ধ্রুব উচ্চপদ কামনা করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার সে উপাসনা নিম্নশ্রেণীর উপাসনা, ভক্তি নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা ভক্তি, এই জন্য তিনি লাভ করিলেন—মুক্তি।

শিষ্য। অনেকেই বলিবে, লাভটা ধ্রুবেরই বেশী হইল। মুক্তি পারলৌকিক লাভ, তাহার সত্যতাসম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে। এরূপ ভক্তিধর্ম্ম লোকায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

গুরু। মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত, সেই ইহলোকেই মুক্ত। সম্রাট্ দুঃখের অতীত নহেন, কিন্তু মুক্ত জীব ইহলোকেই দুঃখের অতীত, কেন না, সে আত্মজয়ী হইয়া বিশ্বজয়ী হইয়াছে। সম্রাটের কি সুখ বলিতে পারি না। বড় বেশী সুখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যে মুক্ত অর্থাৎ সংযতাত্মা, বিশুদ্ধচিত্ত, তাহার মনের সুখের সীমা নাই। যে মুক্ত, সেই ইহজীবনেই সুখী। এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম। মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে মুক্ত। যাহার বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান, অসামর্থ্য বা চিত্তমালিন্যবশতঃ মুক্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। আমার বিশ্বাস যে, এই জীবমুক্তির কামনা করিয়া ভারতবর্ষীয়েরা এরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন। যাঁহারাই এ প্রকার জীবমুক্ত, সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ তাঁহাদের মনোযোগ থাকে না; এজন্য ভারতবর্ষের এই অবনতি হইয়াছে।

গুরু। মুক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝাই এই অধঃপতনের কারণ। যাঁহারা মুক্ত বা মুক্তি-পথের পথিক, তাঁহারা সংসারে নির্লিপ্ত হয়েন, কিন্তু তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের কর্ম্ম নিষ্কাম বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম স্বদেশের এবং জগতের মঙ্গলকর হয়, সকাম কর্ম্মীদিগের কর্ম্মে কাহারও মঙ্গল হয় না। আর তাঁহাদের বৃত্তি সকল অনুশীলিত এবং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, এই জন্য তাঁহারা দক্ষ এবং কর্ম্মঠ; পূর্ব্বে যে ভগবদ্বাক্য

উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখিবে যে, ভগবদ্ভক্তদিগের দক্ষতা * একটি লক্ষণ। তাঁহারা দক্ষ অথচ নিষ্কাম কর্ম্মী, এজন্য তাঁহাদিগের দ্বারা যতটা স্বজাতির এবং জগতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। এ দেশের সকলে এইরূপ মুক্তিমার্গাবলম্বী হইলেই তার উত্তরোত্তরেরাই জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। মুক্তিতত্ত্বের এই যথার্থ ব্যাখ্যার লোপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা আমি তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

শিষ্য। এক্ষণে প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি।

গুরু। প্রহ্লাদচরিত্র সবিস্তারে বলিবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই। তবে একটা কথা এই প্রহ্লাদচরিত্রে বুঝাইতে চাই। আমি বলিয়াছি যে, কেবল "হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর!" করিয়া বেড়াইলে ভক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সর্ব্বভূতকে আপনার মত দেখিয়া সর্ব্বজনের হিতে রত, শত্রুমিত্রে সমদর্শী, নিষ্কামকর্ম্মী,—সেই ভক্ত। এই কথা ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে দেখাইয়াছি। এই প্রহ্লাদ তাহার উদাহরণ। ভগবদ্গীতায় যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত। গীতায় ভক্তের যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা যদি তুমি বিস্মৃত হইয়া থাক, সেই জন্য তোমাকে উহা আর একবার শুনাইতেছি।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
গীতা ১২।১৩—২০

প্রথমেই প্রহ্লাদকে "সর্ব্বত্র সমদৃগ্‌বশী" বলা হইয়াছে।

সমচেতা জগত্যস্মিন্ যঃ সর্ব্বেষ্বেব জন্তুষু।
যথাত্মনি তথান্যত্র পরং মৈত্রগুণান্বিতঃ॥
ধর্ম্মাত্মা সত্যশৌচাদিগুণানামাকরস্তথা।
উপমানমশেষাণাং সাধূনাং যঃ সদাভবৎ॥

কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয় না, কার্য্যত দেখাইতে হয়। প্রহ্লাদের প্রথম কার্য্যে দেখি, তিনি সত্যবাদী। সত্যে তাঁহার এতটা দার্ঢ্য যে, কোন প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সত্য পরিত্যাগ করেন না। গুরুগৃহ হইতে তিনি পিতৃসমীপে আনীত হইলে হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শিখিয়াছ? তাহার সার বল দেখি।"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "যাহা শিখিয়াছি, তাহার সার এই যে, যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই—যাঁহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই—যিনি অচ্যুত, মহাত্মা, সর্ব্বকারণের কারণ, তাঁহাকে নমস্কার।

শুনিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপু আরক্তলোচনে কম্পিতাধরে প্রহ্লাদের গুরুকে ভর্ৎসনা করিলেন। গুরু বলিল, "আমার দোষ নাই, আমি এ সব শিখাই নাই।"

তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কে শিখাইল রে?"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "পিতঃ! যে বিষ্ণু এই অনন্ত জগতের শাস্তা, যিনি আমার হৃদয়ে স্থিত, সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কে শিখায়?"

হিরণ্যকশিপু বলিলেন, "জগতের ঈশ্বর আমি, বিষ্ণু কে রে দুর্ব্বুদ্ধি?"

প্রহ্লাদ বলিল, "যাঁহার পরংপদ শব্দে ব্যক্ত করা যায় না, যাঁহার পরংপদ যোগীরা ধ্যান করে, যাঁহা হইতে বিশ্ব এবং যিনিই বিশ্ব, সেই বিষ্ণু পরমেশ্বর।"

হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "মরিবার ইচ্ছা করিয়াছিস্ যে, পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেছিস্? পরমেশ্বর কাহাকে বলে, জানিস্ না? আমি থাকিতে আবার তোর পরমেশ্বর কে?"

নির্ভীক প্রহ্লাদ বলিল, "পিতঃ, তিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর? সকল জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর, তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাতা, পরমেশ্বর। রাগ করিও না, প্রসন্ন হও।"

হিরণ্যকশিপু বলিল, "বোধ হয়, কোন পাপাশয় এই দুর্ব্বুদ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে।"

প্রহ্লাদ বলিল, "কেবল আমার হৃদয়ে কেন,

* অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ

তিনি সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু আমাকে, তোমাকে, সকলকে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন।"

এখন, সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর। "যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।" * দৃঢ়নিশ্চয় কেন, তাহা বুঝিলে? সেই "হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ" স্মরণ কর। এখন ভয় হইতে মুক্ত যে ভক্ত, সে কি প্রকার, তাহা বুঝিলে? "মদর্পিতমনোবুদ্ধিঃ" কি, বুঝিলে? † ভক্তের সেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্য এই প্রহ্লাদ-চরিত্র কহিতেছি।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তাড়াইয়া দিলেন। প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে গেলেন। অনেক কালের পর তিনি আবার আনাইয়া অধীত বিদ্যার আবার পরীক্ষা লইতে বসিলেন। প্রথম উত্তরেই প্রহ্লাদ আবার সেই কথা বলিল, "কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু।"

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। শত শত দৈত্য তাঁহাকে কাটিতে আসিল, কিন্তু প্রহ্লাদ "দৃঢ়নিশ্চয়," "ঈশ্বরার্পিত-মনোবুদ্ধি" —যাহারা মারিতে আসিল, প্রহ্লাদ তাহাদিগকে বলিল, "বিষ্ণু তোমাদের অস্ত্রেও আছেন, আমাতে আছেন, এই সত্যানুসারে আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না।" ইহাই "দৃঢ়-নিশ্চয়।"

শিষ্য। জানি যে, বিষ্ণুপুরাণের উপন্যাসে আছে, যে, প্রহ্লাদ অস্ত্রের আঘাতে অক্ষত রহিলেন। কিন্তু উপন্যাসেই এমন কথা থাকিতে পারে, যথার্থ এমন ঘটনা হয় না। যার যেমন ইচ্ছা ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈসর্গিক নিয়ম তাহার কাছে নিষ্ফল হয় না। অস্ত্রে পরমভক্তেরও মাংস কাটে।

গুরু। অর্থাৎ তুমি Miracle মান না। কথাটা পুরাতন। আমি তোমাদের মত ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। বিষ্ণুপুরাণে যেরূপে প্রহ্লাদের রক্ষা কথিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বলিয়াই সেই বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু একটি নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানুকম্পায় নিয়মান্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না। অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে যে, অস্ত্র নিষ্ফল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত, সে "দক্ষ", ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতরাং সে অতিশয় কার্য্যক্ষম; ইহার উপর ঈশ্বরানুগ্রহ পাইলে সে যে নৈসর্গিক নিয়মের সাহায্যেই অতিশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব কি? * যাহাই হউক, এ সকল কথায় আমাদিগের কোন প্রয়োজন একণে দেখা যাইতেছে না,—কেন না, আমি ভক্তি বুঝাইতেছি, ভক্ত কি প্রকারে ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হন বা হন কি না, তাহা বুঝাইতেছি না। এরূপ কোন ফলই ভক্তের কামনা করা উচিত নহে। তাহা হইলে তাহার ভক্তি নিষ্কাম হইবে না।

শিষ্য। কিন্তু প্রহ্লাদ ত এখানে রক্ষা কামনা করিলেন—

গুরু। না, তিনি রক্ষা কামনা করেন নাই, তিনি কেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন যে, যখন আমার আরাধ্য বিষ্ণু আমাতেও আছেন, এই অস্ত্রেও আছেন, তখন এ অস্ত্রে কখন আমার অনিষ্ট হইবে না। সেই দৃঢ়নিশ্চয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে। কেবল ইহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য। প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস, তদ্বিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্যাসে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপন্যাসে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস-ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতিপ্রকৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

তার পর অস্ত্রে প্রহ্লাদ মরিল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিলেন, "ওরে দুর্ব্বুদ্ধি, এখনও

* সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
† মদ্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

* ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য সিপাহী-হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধার বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সময়ে মেঘোদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ; অবশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষতা। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভক্তিব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

"প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হ। বড় মূর্খ হইস্ না, আমি এখনও তোকে অভয় দিতেছি।"

অভয়ের কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ বলিল, "যিনি সকল ভয়ের অপহারী, যাঁহার স্মরণে জন্ম, জরা, যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের?"

সেই "ভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তঃ" কথা মনে কর। তার পর হিরণ্যকশিপু সর্পগণকে আদেশ করিলেন যে, "উহাকে দংশন কর।" কথাটা উপন্যাস, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা করি, তুমি বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়েও প্রহ্লাদ মরিল না—সে কথাও তোমার বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই। কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকার এই সর্পদংশন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোযোগ কর।

স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দংশ্যমানো মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ॥

প্রহ্লাদের মন কৃষ্ণে তখন এমন আসক্ত যে, মহাসর্প সকল দংশন করিতেছে, তথাপি কৃষ্ণস্মৃতির আহ্লাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই আহ্লাদের জন্য সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্বাক্য আবার স্মরণ কর "সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।" ক্ষমী কি, পরে বুঝিবে, এখন "সমদুঃখসুখ" বুঝিলে?

শিষ্য। বুঝিলাম এই যে, ভক্তের মনে বড় একটা ভারি সুখ রাত্রিদিন রহিয়াছে বলিয়া, অন্য সুখ-দুঃখ সুখ-দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না।

গুরু। ঠিক তাই। সর্প কর্ত্তৃক প্রহ্লাদ বিনষ্ট হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মত্তহস্তিগণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দাঁতে ফাড়িয়া মারিয়া ফেল। হস্তীদিগের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, প্রহ্লাদের কিছুই হইল না; বিশ্বাস করিও না—উপন্যাস মাত্র। কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদ পিতাকে কি বলিলেন, শুন—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাপবিনাশনোঽয়ং,
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥

"কুলিশাগ্রকঠিন এই সকল গজদন্ত যে ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা আমার বল নহে। যিনি মহাবিপৎ ও পাপের বিনাশন, তাঁহারই স্মরণে হইয়াছে।"

আবার সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর, "নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ" ইত্যাদি।* ইহাই নিরহঙ্কার। ভক্ত জানে যে, সকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জন্য ভক্ত নিরহঙ্কার।

হস্তী হইতে প্রহ্লাদের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু আগুনে পোড়াইতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ আগুনেও পুড়িল না। প্রহ্লাদ "শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ," তাই প্রহ্লাদের সে আগুন পদ্মপত্রের ন্যায় শীতল বোধ হইল।† তখন দৈত্যপুরোহিত ভার্গবেরা দৈত্যপতিকে বলিলেন যে, "ইহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদের জিম্মা করিয়া দিন। তাহাতেও যদি এ বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমরা অভিচারের দ্বারা ইহাকে বধ করিব। আমাদের কৃত অভিচার কখন বিফল হয় না।"

দৈত্যেশ্বর এই কথায় সম্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া, অন্যান্য দৈত্যগণের সঙ্গে পড়াইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাশ খুলিয়া বসিলেন এবং দৈত্যপুত্রগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বিষ্ণুভক্তিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি আর কিছুই নহে—পরহিতব্রত মাত্র—

বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥

* * * *

সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত্য,
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য॥

অর্থাৎ বিশ্ব, জগৎ, সর্ব্বভূত, বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র; বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবে। * * * হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্ব্বত্র সমান দেখিও। এই সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্ব্বভূতের) ঈশ্বরের আরাধনা।

প্রহ্লাদের উক্তি বিষ্ণুপুরাণ হইতে তোমাকে পড়িতে অনুরোধ করি। এখন কেবল আর শ্লোক শুন।

অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্।
মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ।
বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেত্ততঃ।
শোচ্যান্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা॥

* নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।

† শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।

"অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীনশক্তি, ইহা দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ করিও না, কেন না, দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শত্রুতা বদ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও যে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানীরা দুঃখ করেন।"

এখন সেই ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ মনে কর।

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ॥"

এবং 'ন দ্বেষ্টি' * শব্দ মনে কর। ভগবদ্বাক্যে পুরাণকর্ত্তার কৃত এই টীকা।

প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুভক্তির উপদ্রব করিতেছে জানিয়া হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে বিষপান করাইতে আজ্ঞা দিলেন। বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না। তখন দৈত্যেশ্বর পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অভিচার-ক্রিয়ার দ্বারা প্রহ্লাদের সংহার করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা প্রহ্লাদকে একটু বুঝাইলেন; বলিলেন, "তোমার পিতা জগতের ঈশ্বর, তোমার অনন্তে কি হইবে?" প্রহ্লাদ "স্থিরমতি", † প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্যপুরোহিতেরা ভয়ানক অভিচারক্রিয়ার সৃষ্টি করিলেন। অগ্নিময়ী মূর্ত্তিমতী অভিচার-ক্রিয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিল। প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মূর্ত্তিমান্ অভিচার নিরপরাধ প্রহ্লাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অভিচারকারী পুরোহিতদিগকে ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহ্লাদ, "হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর" বলিয়া সেই দহ্যমান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। ডাকিলেন, "হে সর্ব্বব্যাপিন্, হে জগৎস্বরূপ, হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, হে জনার্দ্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর। যেমন সকল ভূতে সর্ব্বব্যাপী জগদ্গুরু বিষ্ণু তুমি আছ, তেমনিই এই ব্রাহ্মণেরা জীবিত হউক। বিষ্ণু সর্ব্বগত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শত্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমনি—ইহারাও জীবিত হোক। যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতীর দ্বারা আমাকে আহত করিয়াছিল, সাপের দ্বারা দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শত্রু মনে করি নাই; আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতেরা জীবিত হউক।" তখন ঈশ্বরকৃপায় পুরোহিতেরা জীবিত হইয়া প্রহ্লাদকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল।

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম, অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার? *

শিষ্য। আমি স্বীকার করি, দেশীয় গ্রন্থ সকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরেজি পড়ায় আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

গুরু। এখন ভগবদ্গীতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শত্রুমিত্রে তুল্যজ্ঞানী বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার, তাহা বুঝিলে? †

পরে, হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এই প্রভাব কোথা হইতে হইল?" প্রহ্লাদ বলিলেন, "অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না—কারণাভাব বশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না। যে কর্ম্মের দ্বারা, মনে বাক্যে পরপীড়ন করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয়া থাকে।

"কেশব আমাতেও আছেন, সর্ব্বভূতেও আছেন, ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না, কাহারও মন্দ করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ চিন্তা করি, আমার শারীরিক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে? হরি সর্ব্বময় জানিয়া সর্ব্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য।"

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, পড়ায় কি না, মেকলে-প্রণীত ক্লাইব ও হেষ্টিংস-সম্বন্ধীয় পাপপূর্ণ উপন্যাস। আর সেই উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী উন্মত্ত।

---

* যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

† অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।

* মনস্বী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বপ্রণীত "Oriental Christ" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন, A suppliant for mercy on behalf of those very men who put him to death, he said—'father! forgive them for they know not what they do.' Can ideal forgiveness go any further?" Ideal যায় বৈ কি, এই প্রহ্লাদচরিত্র দেখুন না।

† সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।

পরে প্রহ্লাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া, দৈত্যপতি তাঁহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিপ্ত করিয়া শম্বরাসুরের মায়ার দ্বারা ও বায়ু দ্বারা প্রহ্লাদের বিনাশের চেষ্টা করিলেন। প্রহ্লাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতি-শিক্ষার জন্য তাঁহাকে পুনশ্চ গুরু-গৃহে পাঠাইলেন। সেখানে নীতি-শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্য্য প্রহ্লাদকে সঙ্গে করিয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া আসিলেন। দৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—

"হে প্রহ্লাদ! মিত্রের ও শত্রুর প্রতি ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তিন সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন? মন্ত্রী বা অমাত্যের সঙ্গে বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে,—চর, চৌর, শঙ্কিতে এবং অশঙ্কিতে,—সন্ধিবিগ্রহে, দুর্গ ও আটবিক সাধনে বা কণ্টকশোধনে—কিরূপ করিবেন, তাহা বল।"

প্রহ্লাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "গুরু সে সব কথা শিখাইয়াছেন বটে, আমিও শিখিয়াছি। কিন্তু সে সকল নীতি আমার মনোমত নহে। শত্রুমিত্রের সাধন জন্য সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই সকল উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্তু পিতঃ! রাগ করিবেন না, আমি ত সেরূপ শত্রু মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই, * সেখানে সাধনের কি প্রয়োজন। যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্বভূতাত্মা, তখন আর শত্রু-মিত্র কে? তোমাতে ভগবান্ আছেন, আমাতে আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই শত্রু,এমন করিয়া পৃথক্ ভাবিব কি প্রকারে? অতএব দুষ্টচেষ্টা-বিধি-বহুল এই নীতিশাস্ত্রে কি প্রয়োজন?"

হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন, এবং প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে অসুরগণকে আদেশ করিলেন। অসুরেরা প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্ব্বত চাপা দিল। প্রহ্লাদ তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিতে লাগিলেন, কেন না, অন্তিমকালে ঈশ্বর-চিন্তা বিধেয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না, কেন না, প্রহ্লাদ নিষ্কাম। প্রহ্লাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাতে লীন হইলেন। প্রহ্লাদ যোগী। * তখন তাঁহার নাগপাশ খসিয়া গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল; পর্ব্বত সকল দূরে বিক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ গাত্রোত্থান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন - আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ, "সন্তুষ্টঃ সততং", সুতরাং তাঁহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই নাই। অতএব তিনি কেবল চাহিলেন যে, "যে সহস্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে।" ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করে, ভক্তির জন্য ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্য বা অন্য ইষ্ট-সাধনের জন্য নহে।

ভগবান্ কহিলেন,- "তাহা আছে ও থাকিবে। অন্য বর দিব, প্রার্থনা কর।"

প্রহ্লাদ দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করিলেন, "আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম বলিয়া পিতা আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তাঁর সেই পাপ ক্ষালিত হউক।"

ভগবান্ তাহাও স্বীকার করিয়া তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু নিষ্কাম প্রহ্লাদের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না, কেন না, তিনি "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী"—হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, শুভাশুভপরিত্যাগী।" † তিনি আবার চাহিলেন, "তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচারিণী থাকে।"

বর দিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তার পর হিরণ্যকশিপু আর প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার করেন নাই।

শিষ্য। তুলনায় একদিকে বেদ, নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ, আর একদিকে প্রহ্লাদচরিত্র রাখিলে প্রহ্লাদচরিত্রই গুরু হয়।

গুরু। এবং প্রহ্লাদ-কথিত এই বৈষ্ণবধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা ধর্ম্মের সার, সুতরাং সকল

* অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে কাহাকেও শত্রু মনে করা উচিত নহে।

* সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
† সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

বিশুদ্ধ ধর্ম্মেই আছে। যে পরিমাণে যে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ, ইহা সেই পরিমাণে সেই ধর্ম্মে আছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্গত। গড বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা-প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছাকরা পৈতা, কপালে কপাল-জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলী ও মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধম ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়।

বিংশতিতম অধ্যায়।

—:*:—

ভক্তি।

ভক্তির সাধন।

শিষ্য। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস্য যে, আপনার নিকটে যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, তাহা সাধন না সাধ্য?

গুরু। ভক্তি, সাধন ও সাধ্য। ভক্তি মুক্তিপ্রদা, এজন্য ভক্তি সাধন। আর ভক্তি মুক্তিপ্রদা হইলেও মুক্তি বা কিছুই কামনা করে না, এজন্য ভক্তিই সাধ্য।

শিষ্য। তবে, এই ভক্তির সাধন কি, শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহার অনুশীলন-প্রথা কি? উপাসনাই ভক্তির সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হয়, তবে ইহাতে উপাসনার কোন স্থান দেখিতেছি না।

গুরু। উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু উপাসনা কথাটা অনেক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে? তুমি অনুদিন সমস্ত কার্য্যে ঈশ্বরকে আন্তরিক চিন্তা না করিলে কখনই তাহা পারিবে না।

শিষ্য। তথাপি হিন্দুশাস্ত্রে এই ভক্তির অনুশীলনের কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি যে ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইলেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভক্তি হইলেও হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল। হিন্দুর মধ্যে ভক্তি আছে, কিন্তু সে আর এক রকমের। প্রতিমা গড়িয়া, তাহার সম্মুখে যোড়হাত করিয়া, পট্টবস্ত্র গলদেশে দিয়া গদগদভাবে অশ্রুমোচন, "হরি! হরি!" বা "মা! মা!" ইত্যাদি শব্দে উচ্চতর গোলযোগ, অথবা রোদন এবং প্রতিমার চরণামৃত পাইলে তাহা মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, কানে,—

গুরু। তুমি যাহা বলিতেছ, বুঝিয়াছি। উহাও চিত্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে উপহাস করিও না। তোমার হক্সলী টিণ্ডল, অপেক্ষা ওরূপ একজন ভাবুক আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তুমি গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ।

শিষ্য। আপনার পূর্ব্বকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।

গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ।

শিষ্য। গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তিতত্ত্বেরই প্রচার থাকাতেও, আধুনিক শাস্ত্রে গৌণ ভক্তি কি প্রকারে আসিল?

গুরু। ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা এবং কর্ম্মাত্মিকা, ভরসা করি, ইহা বুঝিয়াছ। ভক্তি উভয়াত্মিকা বলিয়া, তাহার অনুশীলনে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে সমর্পিত করিতে হয়। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। যখন ভক্তি কর্ম্মাত্মিকা এবং কর্ম্ম সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই ঐ বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হইল। কিন্তু অনেক শাস্ত্রকারেরা অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাঁহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। হরিনামের কথা হইতেছে—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে,
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত,
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং,
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রি-রেণুন্,
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যা,
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং,
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো,
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥
ভাগবত, ২য় স্ক, ৩য় অ, ২০ – ২৪।

"যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ না করে, হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গর্ত্ত মাত্র। হে সূত! যে হরিগাথা গান না করে, তাহার অসতী জিহ্বা ভেকজিহ্বা-তুল্যা। যাহার মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহা পট্টকিরীট-শোভিত হইলেও বোঝা মাত্র। যাহার হস্তদ্বয় হরির সপর্য্যা না করে, তাহা কনক-কঙ্কণে শোভিত হইলেও মড়ার হাত মাত্র। মনুষ্যদিগের চক্ষুর্দ্বয় যদি বিষ্ণুমূর্ত্তি * নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা ময়ূরপুচ্ছ মাত্র। আর যে চরণদ্বয় হরিতীর্থে পর্য্যটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্মলাভ হইয়াছে মাত্র। আর যে ভগবৎপদরেণু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব। বিষ্ণুপদার্পিত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে নিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! হরিনামকীর্ত্তনে যাহার হৃদয় বিকার প্রাপ্ত না হয় এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় লৌহময়।"

এই শ্রেণীর ভক্তেরা এইরূপে ঈশ্বরে বাহ্যেন্দ্রিয় সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা সাকারোপাসনা-সাপেক্ষ। নিরাকারের চক্ষুপাণিপাদের এরূপ নিয়োগ অঘটনীয়।

শিষ্য। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই। ভক্তির প্রকৃত সাধন কি?

গুরু। তাহা ভগবান্ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥১২।৫-৮॥

"হে অর্জ্জুন! যাহারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয়, এবং অন্যভজনারহিত যে ভক্তিযোগ, তদ্দ্বারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার হইতে সেই আমাতে নিবিষ্টচেতাদিগের আমি অচিরে উদ্ধারকর্ত্তা হই। আমাতে তুমি মন স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি দেহান্তে আমাতেই অধিষ্ঠান করিবে।"

শিষ্য। বড় কঠিন কথা। এইরূপ ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে কয় জন পারে?

গুরু। সকলেই পারে। চেষ্টা করিলেই পারে।

শিষ্য। কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে?

গুরু। ভগবান্ তাহাও অর্জ্জুনকে বলিয়া দিতেছেন।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥১২।৯॥

"হে অর্জ্জুন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।" অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য্য অভ্যস্ত করিবে।

শিষ্য। অভ্যাসমাত্রই কঠিন, এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন। সকলে পারে না। যাহারা না পারে, তাহারা কি করিবে?

গুরু। যাহারা কর্ম্ম করিতে পারে, তাহারা যে

---

* এখানে "লিঙ্গানি বিষ্ণোঃ" অর্থে বিষ্ণুর মূর্ত্তি-সকল। অতি সঙ্গত অর্থ। তবে শিবলিঙ্গের কেবল সেই অর্থ না করিয়া কদর্য্য উপন্যাস ও উপাসনা-পদ্ধতিতে যাই কেন?

কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট বা ঈশ্বরানুমোদিত, সেই সকল কর্ম সর্ব্বদা করিলে ক্রমে ঈশ্বরে মনস্থির হইবে। তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন—

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১২।১০॥

"যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম্ম সকল করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।"

শিষ্য। কিন্তু অনেকে কর্ম্মেও অপটু—বা অকর্ম্মা। তাহাদের উপায় কি?

গুরু। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্ বলিতেছেন—

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১২।১২॥

"যদি মদাশ্রিত কর্ম্মেও অশক্ত হও, তবে যতাত্মা হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর।"

শিষ্য। সে কি? যে কর্ম্মে অক্ষম, যাহার কোন কর্ম্ম নাই, সে কর্ম্মফল ত্যাগ করিবে কি প্রকারে?

গুরু। কোন জীবই একেবারে কর্ম্মশূন্য হইতে পারে না। যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম না করে, ভূততাড়িত হইয়া সেও কর্ম্ম করিবে। এ বিষয়ে ভগবদুক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। যে কর্ম্মই তদ্দ্বারা সম্পন্ন হয়, যদি কর্ম্মকর্ত্তা তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা না করে, তবে অন্য কামনাভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবেন। তখন আপনা হইতেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে।

শিষ্য। এই চতুর্ব্বিধ সাধনই অতি কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

গুরু। এই চতুর্ব্বিধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈদৃশ সাধকদিগের পক্ষে অন্যবিধ উপাসনার প্রয়োজন নাই।

শিষ্য। কিন্তু অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। তাহারা কি ভক্তির অধিকারী নহে?

গুরু। এই সব স্থলে উপাসনাত্মিকা গৌণ-ভক্তির প্রয়োজন। গীতায় ভগবদুক্তি আছে যে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

"যে যেরূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপে ভজনা করি।"

এবং স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা প্রযতাত্মার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি।"

শিষ্য। তবে কি গীতায় সাকার মূর্ত্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে?

গুরু। ফলপুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন।

শিষ্য। প্রতিমাদির পূজা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মে নিষিদ্ধ, না বিহিত?

গুরু। অধিকারিভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্বিষয়ে ভাগবত পুরাণ হইতে কপিলোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ভাগবতপুরাণে কপিল ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। তিনি তাঁহার মাতা দেবহূতিকে নির্গুণ ভক্তিযোগের সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের মধ্যে একদিকে সর্ব্বভূতে ঈশ্বরচিন্তা, দয়া, মৈত্র, যমনিয়মাদি ধরিয়াছেন, আর একদিকে প্রতিমাদর্শন-স্পর্শন-পূজাদি ধরিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন,—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্ ॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥
৩য় স্কন্ধ ২৯শ অ ॥১৭।১৮॥

"আমি সর্ব্বভূতে ভূতাত্মা-স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রতিমাপূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে আত্মস্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।"

পুনশ্চ,

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ । ২৯ অ, ২০ ॥

"যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মে রত, সে যতদিন না আপনার হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদি পূজা করিবে।"

বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার সর্ব্বজনে

প্রীতি নাই,ঈশ্বরজ্ঞান নাই,তাহার প্রতিমাদির অর্চ্চনা বিড়ম্বনা, আর যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি জন্মিয়াছে,ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদিপূজা নিষ্প্রয়োজনীয়। তবে যতদিন সে জ্ঞান না জন্মে, ততদিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদিপূজা অবিহিত নহে, কেন না, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমা-পূজা গৌণভক্তির মধ্যে।

শিষ্য। গৌণভক্তি কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি না।

গুরু। মুখ্যভক্তির অনেক বিঘ্ন আছে। যাহা দ্বারা সেই সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, শাণ্ডিল্যসূত্র-প্রণেতা তাহারই নাম দিয়াছেন গৌণভক্তি। ঈশ্বরের নাম-কীর্ত্তন, ফলপুষ্পাদির দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পূজা—এ সকল গৌণভক্তির লক্ষণ। সূত্রের টীকাকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল অনুষ্ঠান ভক্তিজনক মাত্র; ইহার ফলান্তর নাই।*

শিষ্য। তবে আপনার মত এই বুঝিলাম যে, পূজা, হোম, যজ্ঞ, নামসঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার ঐহিক বা পারমার্থিক ফল নাই,—ঐ সকল কেবল ভক্তির সাধনমাত্র।

গুরু। তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পূজাদি করিবে। তবে স্তুতি,বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বরচিন্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্য ভক্তির লক্ষণ। যথা বিপদ্মুক্ত প্রহ্লাদকৃত বিষ্ণু-স্তুতি মুখ্যভক্তি। আর "আমার পাপ ক্ষালিত হউক, আমার সুখে দিন যাউক," ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা স্তুতি বা prayer গৌণভক্তিমধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের কর্ম্মতৎপর হও।

শিষ্য। সেও ত পূজা, হোম, যাগ-যজ্ঞ—

গুরু। সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম নহে, এ সকল সাধকের নিজ মঙ্গলোদ্দিষ্ট কর্ম্ম—সাধকের নিজের কার্য্য, ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও যদি এ সকল কর, তথাপি তোমার নিজের জন্যই হইল। ঈশ্বর জগন্ময়, জগতের কাজই তাঁহার কাজ। অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্ম্মই কৃষ্ণোক্ত "সৎকর্ম্ম," তাহার সাধনে তৎপর হও, এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও। তাহা হইলে যাহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম্ম, তাঁহাতে মনস্থির হইবে, তাহা হইলে ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত হইবে।

যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা, নামকীর্ত্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্ব্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহ্যাড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে,তাহার অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্তু, যে কোন প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের প্রভেদ অল্প।

শিষ্য। তবে এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালী হয় ভণ্ড ও শঠ, নয় পশুবৎ।

গুরু। হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ, কিন্তু তুমি দেখিবে, শীঘ্রই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া ক্রমওয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা মহম্মদের সমকালিক আরবের মত অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিবে।

শিষ্য। কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

—:o:—

প্রীতি।

শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য হিন্দুগ্রন্থের ভক্তিব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তাহা এই অনুশীলন ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভগবত-পুরাণেও ভক্তিতত্ত্বের অনেক কথা আছে। কিন্তু ভগবদ্গীতাতেই সে সকলের মূল। এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থেও যাহা আছে,

* ভক্ত্যা কীর্ত্তনেন ভক্ত্যা দানেন পরাভক্তিং সাধয়েদিতি ** ন ফলান্তরার্থং গৌরবাদিতি।

সেও গীতামূলক। অতএব সে সকলের পর্য্যালোচনায় কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু অনুশীলন ধর্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটুখানি বিরোধ আছে। অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

শিষ্য। তবে এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনসম্বন্ধে উপদেশদান করুন।

গুরু। ভক্তিবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে প্রীতিরও আসল কথা বলিয়াছি। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। প্রহ্লাদচরিত্রে প্রহ্লাদোক্তিতে ইহা বিশেষ বুঝিয়াছ। অন্য ধর্মের এ মত হোক্ না হোক্, হিন্দুধর্মের এই মত। প্রীতির অনুশীলনের দুইটি প্রণালী আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর একটি আধ্যাত্মিক বা ভারতবর্ষীয়। আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা এখন থাক্, আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম বুঝি, তাহা বুঝাইতেছি। প্রীতি দ্বিবিধ,—সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি প্রীতি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার বা মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের। ইহাই সহজ প্রীতি। আর কতকগুলির প্রতি প্রীতি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং সংসর্গজ প্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি। এই পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না, যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি। পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত, এই জন্য পরিবার হইতে প্রথম প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জীবন ধার্ম্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারেরা শিক্ষানবিশীর পরেই গার্হস্থ্য আশ্রম অবশ্য পালনীয় বলিয়া অনুজ্ঞাত করিয়াছিলেন।

পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে স্ফুরিত হইলে, পরিবারের বাহিরেও বিস্তার কামনা করে। বলিয়াছি যে, প্রীতিবৃত্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় অধিকতর স্ফুরণক্ষম; সুতরাং অনুশীলিত হইতে থাকিলেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়া বাহির হইতে চাহিবে। অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ, অনুগত ও আশ্রিতে, গোষ্ঠীতে, গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতে অনুশীলন থাকিলে, ইহার স্ফূর্ত্তিশক্তি সীমাপ্রাপ্ত হয় না। ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, দেশস্থ মনুষ্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তারিত হয়, তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী হইতে পারে,এবং হইয়াও থাকে। হইলে ইহা জাতিবিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রীতিবৃত্তির এই অবস্থা সচরাচর প্রবল দেখা যায়। ইউরোপীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা বেশী হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ।

শিষ্য। ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার কারণ কি, আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন?

গুরু। উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্ম, বিশেষতঃ পূর্ব্বতন ইউরোপের ধর্ম, হিন্দুধর্মের মত উন্নত ধর্ম নহে, ইহাই সেই কারণ। একটু সবিস্তারে সেই কথাটা বুঝাইতেছি, তাহা শুন।

দেশবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তির স্ফূর্ত্তির চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম। যতদিন প্রীতির জগৎপরিমিত স্ফূর্ত্তি না হইল, ততদিন প্রীতিও অসম্পূর্ণ—ধর্মও অসম্পূর্ণ।

এখন দেখা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের প্রীতি আপনাদের স্বদেশেই পর্য্যবসিত হয়,সমস্ত মনুষ্যলোকে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভালবাসেন,অন্য জাতীয়কে দেখিতে পারেন না,ইহাই তাঁহাদের স্বভাব। অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা স্বধর্ম্মীকে ভালবাসে, বিধর্ম্মীকে দেখিতে পারে না। মুসলমান ইহার উদাহরণ। কিন্তু ধর্ম এক হইলে, জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বেষ করে না। মুসলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় তুল্য, কিন্তু ইংরেজ-খ্রীষ্টিয়ান ও রুষ-খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে বড় গোলযোগ।

শিষ্য। এ স্থলে মুসলমানেরও প্রীতি জাগতিক নহে। ইউরোপের প্রীতিও জাগতিক নহে।

গুরু। মুসলমানের প্রীতি-বিস্তারের নিরোধক তাহার ধর্ম। জগৎশুদ্ধ মুসলমান হইলে, জগৎশুদ্ধ সে ভালবাসিতে পারে, কিন্তু জগৎশুদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হইলে জর্ম্মাণ জর্ম্মাণ ভিন্ন, ফরাসি ফরাসি ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য কথা এই,—ইউরোপীয় প্রীতি দেশব্যাপক হইয়াও আর উঠিতে পারে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে হইবে, প্রীতিস্ফূর্ত্তির কার্য্যতঃ বিরোধী কে? কার্য্যতঃ বিরোধী আত্মপ্রীতি। পশু-পক্ষীর ন্যায় মনুষ্যেতে আত্মপ্রীতিও অতিশয় প্রবলা। পরপ্রীতির অপেক্ষা আত্মপ্রীতি প্রবলা। এই জন্য উন্নত ধর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শাসিত না হইলে প্রীতির বিস্তার আত্মপ্রীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পরে প্রীতি যতদূর আত্মপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গত হয়, ততদূরই তাহার বিস্তার হয়। বেশী হয় না। এখন পারিবারিক প্রীতি আত্মপ্রীতির সঙ্গে সুসঙ্গত, এই পুত্র আমার, এই ভার্য্যা আমার, ইহারা আমার সুখের উপাদান, এই জন্য আমি ইহাদের ভালবাসি। তার পর কুটুম্ব, বন্ধু, স্বজন, জ্ঞাতি, গোষ্ঠীগোত্রও আমার, আশ্রিত ও অনুগত, ইহারাও আমার, ইহারাও আমার সুখের উপাদান, এই জন্য আমি ইহাদের ভালবাসি। তেমনি আমার গ্রাম, আমার নগর, আমার দেশ আমি ভালবাসি। কিন্তু জগৎ আমার নহে, জগৎ আমি ভালবাসিব না। পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাহার দেশ আমার দেশ হইতে ভিন্ন, কিন্তু এমন কেহই নাই, যাহার পৃথিবী আমার পৃথিবী হইতে ভিন্ন। সুতরাং পৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভালবাসিব কেন?

শিষ্য। কেন? ইহার উত্তর কি নাই?

গুরু। ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। ইউরোপে হিতবাদী-দের Greatest good of the greatest number কোম্‌তের Humanity পূজা, সর্ব্বোপরি খ্রীষ্টের জাগতিক প্রীতিবাদ, মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে।

শিষ্য। এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে, ইউরোপে প্রীতি দেশ ছাড়ায় না কেন?

গুরু। তাহার কারণানুসন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম্ম ছিল না, যে পৌত্তলিকতা সুন্দরের এবং শক্তিমানের পূজা মাত্র, তাহার উপর আর কোন উচ্চধর্ম্ম ছিল না। জগতের লোক কেন ভালবাসিব, ইহার কোন উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের প্রীতি কখন দেশকে ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই দুই জাতি অতি উন্নতস্বভাব আর্য্যবংশীয় জাতি ছিল; তাহাদের স্বাভাবিক মহত্ত্বগুণে তাহাদের প্রীতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতী ও মনোহারিণী হইয়াছিল। দেশবাৎসল্যে এই দুই জাতি পৃথিবীতে বিখ্যাত।

এখন আধুনিক ইউরোপ খ্রীষ্টিয়ান হৌক আর যাই হৌক, ইহার শিক্ষা প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রীস ও রোম হইতে। গ্রীস ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ। সেই আদর্শ আধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে, যীশু ততদূর নহে। আর একজাতি আধুনিক ইউরোপীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। য়িহুদী জাতির কথা বলিতেছি, য়িহুদী জাতিও বিশিষ্টরূপে দেশবৎসল, লোকবৎসল নহে। এই তিন দিকের স্রোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবৎসল হইয়া পড়িয়াছে, লোকবৎসল হইতে পারে নাই। অথচ খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ইউরোপের ধর্ম্ম। তাহাও বর্ত্তমান। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম এই তিনের সমবায় অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই রহিয়া গিয়াছে। ইউ-রোপীয়েরা মুখে লোকবৎসল, অন্তরে ও কার্য্যে দেশ-বৎসল মাত্র। কথাটা বুঝিলে?

শিষ্য। প্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনু-শীলন কি, তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম, ইহাতে প্রীতির পূর্ণস্ফূর্ত্তি হয় না, দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার আত্মপ্রীতি আসিয়া আপত্তি উত্থাপিত করে যে, জগৎ ভালবাসিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ কি সম্পর্ক? এক্ষণে প্রীতির পারমার্থিক বা ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের মর্ম্ম কি, বলুন।

গুরু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতবর্ষীয়ের চক্ষে ঈশ্বর কি, তাহা মনে করিয়া দেখ। খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জর্ম্মণি বা রুষিয়ার রাজা সমস্ত জর্ম্মাণ বা সমস্ত রুষ হইতে একটা পৃথক্‌ ব্যক্তি, খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বরও তাই। তিনিও পার্থিব রাজার মত পৃথক্‌ থাকিয়া রাজ্যপালন রাজ্যশাসন করেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, এবং লোকে কি করিল, পুলিসের মত তাহার খবর রাখেন। তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে, পার্থিব রাজাকে ভালবাসিবার জন্য যেমন প্রীতিবৃত্তির বিশেষ বিস্তার করিতে হয়, তেমনই করিতে হয়।

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্ব্বভূতময়। তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জড়জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক্‌, কিন্তু জগৎ তাঁহাতেই আছে। যেমন সূত্রে মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাঁহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি বিদ্যমান। আমাতে তিনি বিদ্যমান।

আমাকে ভালবাসিলে তাঁহাকে ভালবাসিলাম। তাঁহাকে না ভালবাসিলে আমাকেও ভালবাসিলাম না। তাঁহাকে ভালবাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভালবাসিলাম। সকল মনুষ্যকে না ভালবাসিলে, তাঁহাকে ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগৎই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব যে, সর্ব্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের মূলেই আছে, অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই ভগবানের সেই মহাবাক্য পুনরুক্ত করিতেছি,—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ *

"যে যোগযুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে দেখে ও সর্ব্বত্র সমান দেখে, যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে, আমাতে সকলকে দেখে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না।"

স্থূল কথা, মনুষ্যে প্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত, মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই, ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধর্ম্মে অভিন্ন, অভেদ্য, ভক্তি তত্ত্বের ব্যাখ্যাকালে ইহা দেখাইয়াছি; ভগবদ্গীতা এবং বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত্র হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে উহা দেখিয়াছ। প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শত্রুর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, "শত্রু কে? সকলই বিষ্ণু-(ঈশ্বর) ময়, শত্রু মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়?" প্রীতিতত্ত্বের এইখানে একশেষ হইল; এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্ম্মের উপর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা করি। প্রহ্লাদের সেই সকল উক্তি এবং গীতা হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পুনর্ব্বার স্মরণ কর। স্মরণ না হয়, গ্রন্থ হইতে পুনর্ব্বার অধ্যয়ন কর। তদ্ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মোক্ত প্রীতিতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। এই প্রীতি জগতে বন্ধন, এই প্রীতি ভিন্ন জগৎ বন্ধনশূন্য বিশৃঙ্খল জড়পিণ্ড সকলের সমষ্টিমাত্র। প্রীতি না থাকিলে, পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ মনুষ্য জগতে বাস করিতে অক্ষম হইত; অনেক কাল হয় ত পৃথিবী মনুষ্যশূন্য, নয় মনুষ্যলোকের অসহ্য নরক হইয়া উঠিত। ভক্তির পর প্রীতির অপেক্ষা উচ্চবৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, প্রীতিতেও তেমনি জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি,—বৃত্তিস্বরূপ জগদাধার হইয়া তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন অজ্ঞানে আমাদিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং অজ্ঞানই আমাদিগকে ভক্তি-প্রীতি ভুলাইয়া রাখে। অতএব ভক্তি-প্রীতির সম্যক্ অনুশীলন জন্য, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের সম্যক্ অনুশীলন আবশ্যক। ফলে সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন ও সামঞ্জস্য ব্যতীত সম্পূর্ণ ধর্ম্মলাভ হয় না, ইহার প্রমাণ পুনঃ পুনঃ পাইয়াছ।

শিষ্য। এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির ভারতবর্ষীয় বা পারমার্থিক অনুশীলনপদ্ধতি বুঝিলাম। জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়া জগতের সঙ্গে তাঁহার এবং আমার অভিন্নতা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ক্রমে সর্ব্বলোককে আপনার মত দেখিতে শিখিলে, প্রীতিবৃত্তির পূর্ণস্ফূর্ত্তি হইবে। ইহার ফলও বুঝিলাম। আত্মপ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা নাই—কেন না, সমস্ত জগৎ আত্মময় হইয়া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র হইতে পারে না, —সর্ব্বলোকবাৎসল্যই ইহার ফল। প্রাকৃতিক অনুশীলনের ফলে ইউরোপে কেবল দেশবাৎসল্যমাত্র জন্মিয়াছে—কিন্তু ভারতবর্ষে লোকবাৎসল্য জন্মিয়াছে কি?

গুরু। আজিকালির কথা ছাড়িয়া দাও। আজিকালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশবৎসল হইতেছি, লোকবৎসল আর নহি। এখন ভিন্ন জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্মিতেছে। কিন্তু এতকাল তাহা ছিল না; দেশবাৎসল্য জিনিসটা দেশে ছিল না। কথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি ভিন্ন ভাব ছিল না। হিন্দুরাজা ছিল, তাহার পর মুসলমান হইল, হিন্দুপ্রজা

---

* এই ধর্ম্ম বৈদিক। বাজসনেয় সংহিতোপনিষদে আছে—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

তাহাতে কথা কহিল না। হিন্দুর কাছে হিন্দু মুসলমান সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দুপ্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহী ইংরেজের হইয়া লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেন না, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্নজাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে, হিন্দু দুর্ব্বল বলিয়া কৃত্রিম প্রভুভক্ত।

শিষ্য। তা, সাধারণ হিন্দু প্রজা বা ইংরেজের সিপাহীরা যে বুঝিয়াছিল, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, সকলেই আমি, এ কথা ত বিশ্বাস হয় না।

গুরু। তাহা বুঝে নাই। কিন্তু জাতীয় ধর্ম্মে জাতীয় চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় ধর্ম্ম বুঝে না, সেও জাতীয় ধর্ম্মের অধীন হয়, জাতীয় ধর্ম্মে তাহার চরিত্র শাসিত হয়। ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে। যে কয়জন বুঝে, তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলন ধর্ম্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে, মনস্বিগণ কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্ম্মের মুখ্যফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণফল সকলেই পাইতে পারে।

শিষ্য। তার পর আর একটা কথা আছে। আপনি যে প্রীতির পারমার্থিক অনুশীলন পদ্ধতি বুঝাইলেন, তাহার ফল, লোকবাৎসল্যে দেশবাৎসল্য ভাসিয়া যায়। কিন্তু দেশ-বাৎসল্যের অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পারমার্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে?

গুরু। সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারাই হইবে। যাহা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে; যে কর্ম্ম ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পরপীড়িতের রক্ষা, অনুন্নতের উন্নতিসাধন—সকলই ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম; সুতরাং অনুষ্ঠেয়। অতএব নিষ্কাম হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পীড়িত দেশীয়বর্গের রক্ষা, দেশীয় লোকের উন্নতিসাধন করিবে।

শিষ্য। নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আত্মরক্ষাই ত সকাম।

গুরু। সে কথার উত্তর কা'ল দিব।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

—:o:—

আত্মপ্রীতি।

শিষ্য। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আপনি বলিয়াছিলেন, "কা'ল উত্তর দিব।" সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব, ইচ্ছা করি।

গুরু। আমার এই ভক্তিবাদ-সমর্থনার্থ কোন জড়বাদীর সহায়তা গ্রহণ করিব, তুমি এমন প্রত্যাশা কর না, তথাপি হর্ব্বর্ট স্পেন্সরের একটি কথা তোমাকে পড়াইয়া শুনাইব।

"A creature must live before it can act. From this it is a corollary that the acts by which each maintains his own life must, *speaking generally*, precede in imperativeness all other acts of which he is capable. For if it be asserted that these other acts must precede in imperativeness the acts which maintain life, and if this, accepted as a general law of conduct, is conformed to by all, then by postponing the acts which maintain life to the other acts which life makes possible, all must lose their lives. The acts required for continued self preservation, including the enjoyment of benefits achieved by such acts, are the first requisites to universal welfare. Unless each *dully** cares for himself, his care for others is ended by death; and if each thus dies there remain no others to be cared for." †

* Italic যে যে শব্দ দেওয়া হইল, তাহা আমার দেওয়া।

† Date of Ethics, Chap. XI.

অতএব, জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, এ জন্য আত্মরক্ষাকেও নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে, ও করাই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলনা করিয়া দেখ। পরহিত-ধর্ম্মাপেক্ষা আত্মরক্ষা-ধর্ম্মের গৌরব অধিক। যদি জগতের লোকে পরস্পরে হিত না করে, পরস্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ মনুষ্যশূন্য হইবে না। অসভ্য সমাজসকল ইহার উদাহরণ। কিন্তু সকলে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে সভ্য কি অসভ্য কোন সমাজ, কোন প্রকার মনুষ্য বা জীব জগতে থাকিবে না, অতএব, পরহিতের আগে আপনার প্রাণরক্ষা।

শিষ্য। এ সকল অতি অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মনে করুন, পরকে না দিয়া আপনি খাইব ?

গুরু। তুমি যাহা কিছু আহার্য্য সংগ্রহ কর, তাহা যদি সবগুই প্রত্যহ অন্যকে বিলাইয়া দাও,তবে পাঁচ সাত দিনে তোমার দানধর্ম্মের শেষ হইবে। কেন না, তুমি নিজে না খাইয়া মরিয়া যাইবে। পরকে দিবে, কিন্তু পরকে দিয়া আপনি খাইবে। যদি পরকে দিতে না কুলায়, তবে কাজেই পরকে না দিয়া আপনিই খাইবে। এই "না কুলায়" কথাটাই যত অধর্ম্মের গোড়া। যাঁর নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিনটা পাঁটা, দেড় কুড়ি মাছের প্রাণসংহার হয়, তাঁর কাজেই পরকে দিতে কুলায় না। যে সর্ব্বভূতে সমান দেখে, আপনাতে ও পরে সমান দেখে, সে পরকে যেমন দিতে পারে, আপনি তেমনই খায়। ইহাই ধর্ম্ম। আপনি উপবাস করিয়া পরকে দেওয়া ধর্ম্ম নহে। কেন না, আপনাতে ও পরে সমান করিতে হইবে।

শিষ্য। ভাল, আমার প্রযুক্ত উদাহরণটা না হয় অনুপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কখন কি পরোপকারার্থ আপনার প্রাণবিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে ?

গুরু। অনেক সময়ে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। না করাই অধর্ম্ম।

শিষ্য। তাহার দুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। যে মাতা-পিতার নিকট তুমি প্রাণ পাইয়াছ, যাঁহাদিগের যত্নে তুমি কর্ম্মক্ষম ও ধর্ম্মক্ষম হইয়াছ, তাঁহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণবিসর্জ্জনই ধর্ম্ম, না করা অধর্ম্ম।

সেইরূপ প্রাণদানাদি উপকার যদি তুমি অন্যের কাছে পাইয়া থাক, তবে তাহার জন্যও ঐরূপ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনীয়।

যাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ ঐরূপে বিসর্জ্জনীয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক কাহার। তুমি রক্ষক, (১) স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের, (২) স্বদেশের, (৩) প্রভুর, অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার, (৪) শরণাগতের। অতএব স্ত্রীপুত্রাদি, স্বদেশ, প্রভু এবং শরণাগত, এই সকলের রক্ষার্থ আপনার প্রাণপরিত্যাগ করা ধর্ম্ম।

যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্যমাত্রেই তাহাদের রক্ষক। স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, অন্ধ-খঞ্জাদি অঙ্গহীন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইহাদের রক্ষার্থ প্রাণ-পরিত্যাগ ধর্ম্ম।

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণনা করিয়া উঠা যায় না, প্রয়োজনও নাই। যাহার জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলিত ও সামঞ্জস্য-প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকল অবস্থাতেই বুঝিতে পারিবে যে, এই স্থলে প্রাণপরিত্যাগ ধর্ম্ম, এই স্থলে অধর্ম্ম।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য্য এই বুঝিলাম যে, আত্মপ্রীতি প্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইলেও ঘৃণার যোগ্য নহে। উপযুক্ত নিয়মে উহার সীমাবদ্ধ করিয়া উহারও সম্যক্ অনুশীলন কর্ত্তব্য।—বটে ?

গুরু। বস্তুতঃ যদি আত্মপর সমান হইল, তবে আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি ভিন্ন বিবেচনা করাও উচিত নহে। উপযুক্তরূপে উভয়ে অনুশীলিত ও সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইলে আত্মপ্রীতি জাগতিক প্রীতির অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। কেন না, আমি ত জগতের বাহিরে নাই। ধর্ম্মের, বিশেষতঃ হিন্দু-ধর্ম্মের মূল একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এজন্য সর্ব্বভূতের হিতসাধন আমাদের ধর্ম্ম, কেন না, বলিয়াছি যে, সকল বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মনুষ্যজন্মের চরম উদ্দেশ্য। যদি সর্ব্বভূতে হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে পরেরও হিত-সাধন যেমন আমার ধর্ম্ম, তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধর্ম্ম। কারণ, আমিও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত, ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষাদি আমার

ধর্ম্ম এবং আপনারও রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম। প্রীতি ও জাগতিক প্রীতি এক।

শিষ্য। কিন্তু কথাটার গোলযোগ এই যে, যখন আত্মহিত এবং পরহিত পরস্পর বিরোধী, তখন আপনার হিত করিব, না পরের হিত করিব? পূর্ব্বগামী ধর্ম্মবেত্তৃগণের মত এই যে, আত্মহিতে ও পরহিতে পরস্পর বিরোধ হইলে, পরহিত-সাধনই ধর্ম্ম।

গুরু। ঠিক এমন কথাটা কোন ধর্ম্মে আছে, তাহা আমি বুঝি না। খ্রীষ্টধর্ম্মের উক্তি যে, পরের "তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার তুমি বাসনা কর,তুমি পরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে।" এ উক্তিতে পরহিতকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না, পরহিত ও আত্মহিতকে তুল্য করা হইতেছে। কিন্তু সে কথা থাক্, কেন না, আমাকেও এই অনুশীলনতত্ত্বে পরহিতকেই স্থলবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু তুমি যে কথা তুলিলে, তাহারও সুমীমাংসা আছে। সেই মীমাংসার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্ম্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইহা হিন্দুধর্ম্মেও বলে, খ্রীষ্টবৌদ্ধাদি অপর ধর্ম্মেরও এই মত এবং আধুনিক দার্শনিক বা নীতিবেত্তাদিগেরও মত। অনুশীলনতত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ,পরের অনিষ্ট ভক্তি,প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধী ও বিঘ্নকর এবং যে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও প্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রীতি-দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এজন্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্দ্বারা আপনার হিতসাধন করিবে না; ইহা অনুশীলনধর্ম্মের এবং হিন্দুধর্ম্মের আজ্ঞা। আত্মপ্রীতিতত্ত্বের ইহাই প্রথম নিয়ম।

শিষ্য। নিয়মটা কি প্রকারে খাটে—দেখা যাউক। এক ব্যক্তি চোর, সে সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাস করিয়া আছে। এরূপ যে চোরের সর্ব্বদা ঘটে, তাহা বলা বাহুল্য। সে, রাত্রে আমার ঘরে সিঁধ দিয়াছে—অভিপ্রায়, কিছু চুরি করিয়া আপনার ও পরিবারবর্গের আহার সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিব,না উপহারস্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিব?

গুরু। তাহাকে ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিবে।

শিষ্য। তাহা হইলে আমার সম্পত্তিরক্ষারূপ ইষ্টসাধন হইল বটে, কিন্তু চোরের এবং তাহার নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। আপনার সূত্রটি খাটে?

গুরু। চোরের নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রাদি যদি অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ কিছু দান করিতে পার। চোরও যদি না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে পার। কিন্তু চুরির দণ্ড দিতে হইবে। কেন না, না দিলে কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, সমস্ত লোকের অনিষ্ট। চোরের প্রশ্রয়ে চৌর্য্যবৃদ্ধি, চৌর্য্যবৃদ্ধিতে সমাজের অনিষ্ট।

শিষ্য। এ ত বিলাতী হিতবাদীর কথা—আপনার মতে "Greatest good of the greatest number" এখানে অবলম্বনীয়।

গুরু। হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বটা এই হিতবাদমতের ভিতরেই আছে। তাহা না হইয়া ইহা ধর্ম্মতত্ত্বের সামান্য অংশ মাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার বিখ্যাত অনুশীলনতত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র। তত্ত্বটা সত্যমূলক, কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম্ম ভক্তিতে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নির্ঝরিণী নামিয়াছে—হিতবাদ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম স্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক—ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম নহে।

স্থূল কথা, অনুশীলনধর্ম্মে "Greatest good of the greatest number" গণিততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে একজনের হিতসাধন ধর্ম্ম, আবার একজনের হিতসাধন অপেক্ষা দশজনের তুল্য-হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম্ম। যদি একদিকে একজনের হিতসাধন ও আর একদিকে দশ জনের তুল্যহিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম্ম হয়, তবে একজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশ জনের তুল্য-হিতসাধনই ধর্ম্ম, এবং দশজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া একজনের তুল্য-হিতসাধন করা অধর্ম্ম।* এখানে "Good of the greatest number."

* ভরসা করি, কেহই ইহার এমন অর্থ বুঝিবেন না যে, দশজনের হিতের জন্য একজনের অনিষ্ট করিবে। তাহা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ইহা বলা বাহুল্য।

পক্ষান্তরে, একজনের অল্পহিত আর একদিকে আর একজনের বেশী হিত পরস্পরবিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিতসাধন করাই ধর্ম, তদ্বিপরীতই অধর্ম। এখানে কথাটা "Greatest good."

শিষ্য। সে ত স্পষ্ট কথা।

গুরু। যত স্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, কার্য্যকালে তত স্পষ্ট হয় না। একদিকে শ্যামঠাকুর কুলীন ব্রাহ্মণ, কন্যাভারগ্রস্ত, অর্থাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পারিতেছেন না, আর একদিকে রামা ডোম কতকগুলি অপোগণ্ডভারগ্রস্ত, সপরিবারে খাইতে পায় না, প্রাণ যায়। এখানে Greatest good রামার দিকে, কিন্তু উভয়েই তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতে আসিলে, তুমি বোধ করি, শ্যামঠাকুরকে পাঁচটি টাকা দিয়াও কুণ্ঠিত হইবে। মনে করিবে, কম হইল, আর রামাকে চারিটি পয়সা দিতে পারিলেই আপনাকে দাতা ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করিবে। অন্ততঃ অনেক বাঙ্গালীই এইরূপ। বাঙ্গালী কেন, সকল জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। সে কথা যাক্। সর্ব্বভূত যদি সমান, তবে অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের হিতসাধন ধর্ম এবং একজনের অল্প হিতের অপেক্ষা একজনের বেশী হিতসাধন ধর্ম। কিন্তু যেখানে একজনের বেশী হিত একদিকে আর দশ জনের অল্প হিত (তুল্য-হিত নহে) আর একদিকে, সেখানে ধর্ম কি?

গুরু। সেখানে অঙ্ক কষিবে। মনে কর, একদিকে একজনের যে পরিমাণে হিত সাধিত হইতে পারে, অন্যদিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে পারে। এ স্থলে এই শত জনের হিতের অঙ্ক ১০০÷৪=২৫। এখানে একজনের বেশী হিত পরিত্যাগ করিয়া শত জনের অল্প হিতসাধন করাই ধর্ম। পক্ষান্তরে, যদি এই শত জনের প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্থাংশ না হইয়া সহস্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের সুখের মাত্রার সমষ্টি একজনের ১।১০ মাত্র। সুতরাং এ স্থলে সে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধর্ম।

শিষ্য। হিতের কি এরূপ ওজন হয়? মাপকাটিতে মাপ হয়, এত গজ এত ইঞ্চি?

গুরু। ইহার সদুত্তর কেবল অনুশীলনবাদীই দিতে পারেন। যাঁহার সকল বৃত্তি, বিশেষ জ্ঞানার্জ্জনী-সমূহ অনুশীলিত ও স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিতাহিত মাত্রা ঠিক বুঝিতে তিনি সক্ষম। যাঁহার সেরূপ অনুশীলন হয় নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা অনেক সময়ে দুঃসাধ্য; কিন্তু তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার ধর্মই দুঃসাধ্য, ইহা বোধ করি বুঝাইয়াছি। তথাপি ইহা দেখিবে যে, সচরাচর মনুষ্য অনেক স্থানেই এরূপ কার্য্য করিতে পারে। ইউরোপীয় হিতবাদীরা ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আর সে সকল কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে, অনুশীলনতত্ত্বে হিতবাদের স্থান কোথায়?

শিষ্য। স্থান কোথায়?

গুরু। প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যে। সর্ব্বভূত সমান, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের হিত পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, সে স্থলে ওজন করিয়া বা অঙ্ক কষিয়া দেখিবে। অর্থাৎ "Greatest good of the greatest number" আমি যে অর্থে বুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন করিবে। যখন পরহিতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তখন কি প্রকারে এই বিচার কর্ত্তব্য, তাহাই বুঝাইয়াছি। কিন্তু পরহিতে পরহিতে বিরোধের অপেক্ষা আত্মহিতে পরহিতে বিবাদ আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার। সেখানেও সামঞ্জস্যের সেই নিয়ম। অর্থাৎ—

(১) যখন একদিকে তোমার হিত, অপরদিকে একাধিকসংখ্যক লোকের তুল্য-হিত, সেখানে আত্মহিত ত্যাজ্য, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয়।

(২) যেখানে একদিকে আত্মহিত, অন্য দিকে অপর একজনের অধিক হিত, সেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেয়।

(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত একদিকে, অন্যের অল্প হিত একদিকে, সেখানে কোন্ দিকের মোট মাত্রা বেশী, তাহা দেখিবে। তোমার দিক্ বেশী হয়, আপনার হিত সাধিত করিবে; পরের দিক্ বেশী হয়, পরের হিত খুঁজিবে।

শিষ্য। (৪) আর যেখানে দুইখানে দুই দিক্ সমান?

গুরু। সেখানে পরের হিত অনুষ্ঠেয়।

শিষ্য। কেন? সর্ব্বভূত যখন সমান, তখন আপনি পর ত সমান।

গুরু। অনুশীলনতত্ত্বে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিণী। কেবল আত্মানুরাগিণী প্রীতি প্রীতি নহে। আপনার হিতসাধনে প্রীতির অনুশীলন, স্ফূরণ বা চরিতার্থতা হয় না। পরহিতসাধনে

তাহা হইবে। এই জন্য এ স্থলে পরপক্ষ অবলম্বনীয়। কেন না, তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন ও চরিতার্থতা জন্য তোমার যে নিজের হিত, তাহাও সাধিত হয়। অতএব মোটের উপর পরপক্ষে বেশী হিত সাধিত হয়।

অতএব আত্মপ্রীতির সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমি যে প্রথম নিয়ম বলিয়াছি, অর্থাৎ যেখানে পরের অনিষ্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পরিত্যাজ্য, তাহার সম্প্রসারণ ও সীমাবন্ধনস্বরূপ হিতবাদীদিগের এই নিয়ম দ্বিতীয় নিয়মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পার।

আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক সময় আমার আত্মহিত যতদূর আমার আয়ত্ত, পরের হিত তাদৃশ নহে। উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমরা যত সহজে আপনার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, পরের তত সহজে পারি না। এ স্থলে অগ্রে আপনার মানসিক উন্নতির সাধনই কর্ত্তব্য, কেন না, সিদ্ধির সম্ভাবনা বেশী। পুনশ্চ, অনেক স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে, পরের হিত সাধিত করিতে পারা যায় না। এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানসিক উন্নতি না হইলে, আমি তোমার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারিব না, অতএব এখানে আগে আপনার হিত অবলম্বনীয়। যদি তোমাকে আমাকে এককালে শত্রুতে আক্রমণ করে, তবে আগে আপনার রক্ষা না করিলে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। চিকিৎসক নিজে রুগ্ন-শয্যাশায়ী হইলে, আগে আপনার আরোগ্যসাধন না করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে পারেন না। এ সকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয়।

এক্ষণে তোমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলাম, তাহা আবার স্মরণ কর।

· প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ প্রীতির অনুশীলন।

দ্বিতীয়, তদ্দ্বারা আত্মপ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না, কেন না, আমিও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত।

তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্য—সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। অতএব যাহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, তাহাই অনুষ্ঠেয়। ঈদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অনুবর্ত্তনে কখন অবস্থাবিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থাবিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়।

তাহাতে হিন্দুধর্ম্মোক্ত সাম্যজ্ঞানের বিঘ্ন হয় না। তুমি যেখানে আত্মরক্ষার অধিকারী, পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী। যেখানে তুমি পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার জন্য আত্মবিসর্জ্জনে বাধ্য। এই জ্ঞানেই সাম্যজ্ঞান। অতএব আমি যে সকল বর্জ্জিত কথা বলিলাম, তদ্দ্বারা গীতোক্ত সাম্যজ্ঞানের কোন হানি হইতেছে না।

শিষ্য। কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কোন সমুচিত উত্তর হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হিন্দুর পারমার্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে?

গুরু। উত্তরের প্রথম সূত্র সংস্থাপিত হইল। এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তর দিতেছি।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

—:*:—

স্বজনপ্রীতি।

গুরু। এক্ষণে হর্বর্ট স্পেন্সরের যে উক্তি তোমাকে শুনাইয়াছি, তাহা স্মরণ কর।

"Unless each duly cares for himself his care for all others is ended by death, and if each thus dies, there remain no others to be cared for."

জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কেন না, তদ্ব্যতীত সৃষ্টিরক্ষা হয় না। কিন্তু এ কথা কেবল আত্মরক্ষা সম্বন্ধেই যে খাটে, এমন নহে, যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং যাহাদের রক্ষার ভার তোমার উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যায় জগৎরক্ষার পক্ষে তাদৃশ প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। আপনি সন্তানাদির কথা বলিতেছেন?

গুরু। প্রথমে অপত্যপ্রীতির কথাই বলিতেছি। বালকেরা আপনাদিগের পালনে ও রক্ষণে সক্ষম নহে। অন্যে যদি তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন না করে, তবে তাহারা বাঁচে না। যদি সমস্ত শিশু অপালিত ও অরক্ষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তবে জগৎও জীবশূন্য হইবে। অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধর্ম্ম,

সন্তানাদির পালনও তাদৃশ গুরুতর ধর্ম। আত্মরক্ষার ন্যায় ইহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, সুতরাং ইহাকেও নিষ্কাম কর্মে পরিণত করা যাইতে পারে, বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সন্তানাদির পালন ও রক্ষণ গুরুতর ধর্ম। কেন না, যদি সমস্ত জগৎ আত্মরক্ষায় বিরত হইয়াও সন্তানাদি-রক্ষায় নিযুক্ত ও সফল হইয়া সন্তানাদি রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সৃষ্টি রক্ষিত হয়, কিন্তু সমস্ত জীব সন্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়া কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, সন্তানাদির অভাবে জীবসৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে। অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা সন্তানাদির রক্ষা গুরুতর ধর্ম।

ইহা হইতে একটি গুরুতর তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। অপত্যাদির রক্ষার্থ আপনার প্রাণবিসর্জ্জন করা ধর্মসঙ্গত। পূর্ব্বে যে কথা আন্দাজি বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রমাণীকৃত হইল।

ইহা পশু-পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ধর্মজ্ঞান বশতঃ তাহারা এরূপ করে, এমন বলা যায় না। অপত্যপ্রীতি সাধারণ বৃত্তি, এই জন্য ইহা করিয়া থাকে। অপত্যস্নেহ যদি স্বতন্ত্র স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহা সাধারণ প্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময়ে হইয়াও থাকে। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, অনেকে অপত্যস্নেহের বশীভূত হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতির বিরোধ-সম্ভাবনার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, জাগতিক প্রীতির সঙ্গে অপত্যপ্রীতিরও সেইরূপ বিরোধের শঙ্কা করিতে হয়।

কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মপ্রীতি আসিয়া যোগ দেয় না, এমন কথা বলা যায় না। ছেলে আমার, সুতরাং পরের কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে। ছেলের উপকারে আমার উপকার, অতএব যে উপায়ে হউক, ছেলের উপকার সিদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া অনেকে কার্য্য করিয়া থাকেন।

অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জস্য জন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

শিষ্য। এই সামঞ্জস্যের উপায় কি?

গুরু। উপায়—হিন্দুধর্মের ও প্রীতিতত্ত্বের সেই মূলসূত্র—সর্ব্বভূতে সমদর্শন। অপত্যপ্রীতি সেই জাগতিক প্রীতিতে নিমজ্জিত করিয়া, অপত্যপালন ও রক্ষণ ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, সুতরাং অনুষ্ঠেয় কর্ম জানিয়া, "জগদীশ্বরের কর্ম নির্ব্বাহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইষ্টানিষ্ট কিছু নাই" ইহা মনে বুঝিয়া সেই অনুষ্ঠেয় কর্ম করিবে। তাহা হইলে এই অপত্যপালন ও রক্ষণধর্ম্ম নিষ্কামধর্মে পরিণত হইবে। তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মেরও অতিশয় সুনির্ব্বাহ হইবে, অথচ তুমি নিজে একদিকে শোকমোহাদি, আর একদিকে পাপ ও দুর্ব্বাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

শিষ্য। আপনি কি অপত্যস্নেহ-বৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে জাগতিক প্রীতির সমাবেশ করিতে বলেন?

গুরু। আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি না, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। তবে পাশববৃত্তিসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। পাশববৃত্তিসকল স্বতঃস্ফূর্ত্ত, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার দমনই অনুশীলন। অপত্যস্নেহ পরম রমণীয় ও পবিত্র বৃত্তি। পাশববৃত্তিগুলির সঙ্গে ইহার এই ঐক্য আছে যে, ইহা যেমন মনুষ্যের আছে, তেমনি পশুদিগেরও আছে। তাদৃশ সকল বৃত্তিই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপত্যস্নেহও সেই জন্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত, এবং সমস্ত মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা ইহার বল দুর্দ্দমনীয় বলা যাইতে পারে। এখন অপত্যপ্রীতি যতই রমণীয় ও পবিত্র হউক না কেন, উহার অনুচিত স্ফূর্ত্তি অসামঞ্জস্যের কারণ। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার সংযম না করিলে অনুচিত স্ফূর্ত্তি ঘটিয়া উঠে। এই জন্য উহার সংযম আবশ্যক। উহার সংযম না করিলে, জাগতিক প্রীতি ও ঈশ্বরে ভক্তি উহার স্রোতে ভাসিয়া যায়। আমি বলিয়াছি, ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্যে প্রীতি, ইহাই ধর্ম্মের সার, অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম। অতএব অপত্যপ্রীতির অনুচিত স্ফুরণে এইরূপ ধর্ম্মনাশ, সুখনাশ এবং মনুষ্যত্বনাশ ঘটিতে পারে। লোকে ইহার অন্যায় বশীভূত হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া অপত্য ভিন্ন আর সকল মনুষ্যকে ভুলিয়া যায়। আপনার অপত্য ভিন্ন আর কাহারও জন্য কিছু করিতে চাহে না। ইহাই অন্যায় স্ফূর্ত্তি। পক্ষান্তরে, অবস্থাবিশেষে ইহার দমন না করিয়া ইহার উদ্দীপনই বিধেয় হয়। অন্যান্য পাশব-বৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা কামাদি নীচবৃত্তির ন্যায় সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। এমন নর-পিশাচ ও পিশাচীও দেখা যায় যে, তাহাদের এই পরম রমণীয়, পবিত্র এবং সুখকর স্বাভাবিক বৃত্তি অন্তর্হিত। অনেক সময়ে সামাজিক পাপবাহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে। ধনলোভে পিশাচ-পিশাচীরা পুত্র-কন্যা বিক্রয় করে, লোকলজ্জাভয়ে

কুলকলঙ্কিনীরা তাহাদের বিনাশ করে, কুলকলঙ্ক-ভয়ে কুলাভিমানীরা কন্যাসন্তান বিনাশ করে, অনেক কামুকী কামাতুর হইয়া সন্তান পরিত্যাগ করিয়া যায়, অতএব এই বৃত্তির অভাব বা লোপও অতি ভয়ঙ্কর অধর্ম্মের কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তরূপে স্বতঃস্ফূর্ত্ত না হয়, সেখানে অনুশীলন দ্বারা ইহাকে স্ফুরিত করা আবশ্যক। উপযুক্তমত স্ফুরিত ও চরিতার্থ হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কোন বৃত্তিই ঈদৃশ সুখদ হয় না। সুখকারিতায় অপত্যপ্রীতি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন সকল বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ।

অপত্যপ্রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পতিপ্রীতি-সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। অর্থাৎ (১) স্ত্রীর প্রতি-পালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণ ও প্রতিপালনে অক্ষম; অতএব তাহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ-সম্ভাবনা। এজন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও ধর্ম্মসঙ্গত।

(২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে। কিন্তু তাঁহার সেবা ও সুখসাধন তাঁহার সাধ্য। তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম। অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ; হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়াছে। যদি দম্পতিপ্রীতিকে পাশববৃত্তিতে পরিণত না করা হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম, তিনি স্বামীর ধর্ম্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা, সুখসাধন ও ধর্ম্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম্ম।

(৩) জগৎরক্ষার্থ এবং ধর্ম্মাচরণের জন্য দম্পতি-প্রীতি। তাহা স্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির অনুশীলন করিলে ইহাও নিষ্কামধর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিত। নহিলে ইহা নিষ্কামধর্ম্ম নহে।

শিষ্য। আমি এই দম্পতিপ্রীতিকেই পাশববৃত্তি বলি, অপত্যপ্রীতিকে পাশবৃত্তি বলিতে তত সম্মত নহি। কেননা, পশুদিগেরও দাম্পত্য অনুরাগ আছে। সে অনুরাগও অতিশয় তীব্র।

গুরু। পশুদিগের দম্পতিপ্রীতি নাই।

শিষ্য। মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি,
গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥

গুরু। ওহো! কিন্তু আসল কথাটা ছাড়িয়া গেলে যে!

তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে
রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে—ইত্যাদি।

রতি সহিত মন্মথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাশব অনুরাগের বিকাশ। কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, এই অনুরাগ স্মরজ। ইহা পশুদিগেরও আছে, মনুষ্যেরও আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বলিয়া পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। ইহাকে দম্পতিপ্রীতি বলি না, ইহা পাশববৃত্তি বটে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, এবং ইহার দমনই অনুশীলন। কাম সহজ; দম্পতিপ্রীতি সংসর্গজ, কামজনিত অনুরাগ ক্ষণিক, দম্পতিপ্রীতি স্থায়ী। তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, অনেক সময়ে এই কামবৃত্তি আসিয়া দম্পতিপ্রীতিস্থান অধি-কার করে। অনেক সময়ে তাহার স্থান অধিকার না করুক, দম্পতিপ্রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায়, যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবাসনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পতিপ্রীতিও পাশবতা প্রাপ্ত হয়। এই সকল অবস্থায় দম্পতিপ্রীতি অতিশয় বলবতী বৃত্তি হইয়া উঠে। এ সকল অবস্থায় তাহার সামঞ্জস্য আবশ্যক। যে সকল নিয়ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই সামঞ্জস্যের উত্তম উপায়।

শিষ্য। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, এই কাম-বৃত্তিই সৃষ্টিরক্ষার উপায়। দম্পতিপ্রীতি ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে, ইহাই তবে নিষ্কামধর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে, দম্পতিপ্রীতি যে নিষ্কাম ধর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে, এমন বিচার-প্রণালী দেখিতেছি না।

গুরু। স্মরজ বৃত্তিও যে নিষ্কাম ধর্ম্মের কারণ হইতে পারে, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তোমার আসল কথাতেই ভুল। দম্পতিপ্রীতি ব্যতীত কেবল পাশববৃত্তিতে জগৎরক্ষা হইতে পারে না।

শিষ্য। পশুসৃষ্টি ত কেবল তদ্দ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে।

গুরু। পশুসৃষ্টি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য-সৃষ্টি রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ, পশুদিগের স্ত্রীদিগের আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনের শক্তি আছে; মনুষ্যস্ত্রীর তাহা নাই। অতএব মনুষ্যজাতির মধ্যে পুরুষ দ্বারা স্ত্রীজাতির পালন-রক্ষণ না হইলে, স্ত্রী-জাতির বিলোপের সম্ভাবনা।

শিষ্য। মনুষ্যজাতির অসভ্য অবস্থায় কিরূপ?

গুরু। যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মনুষ্য পশুতুল্য অর্থাৎ বিবাহ-প্রথা নাই, সেই অবস্থায় স্ত্রীলোক-সকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে সক্ষম কি না, তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। কেন না, তাদৃশ অসভ্য অবস্থার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য যতদিন সমাজভুক্ত না হয়, ততদিন তাহাদের শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম নাই বলিলেও হয়। ধর্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক, সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই, জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্মাধর্মজ্ঞান সম্ভবে না। ধর্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না, এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে মনুষ্যে প্রীতি প্রভৃতি ধর্মও সম্ভবে না, অর্থাৎ অসভ্যাবস্থায় শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম সম্ভব নহে।

ধর্ম জন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজ গঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহ-প্রথা। বিবাহ-প্রথার মূলমর্ম এই যে, স্ত্রীপুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্ব্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ—পালন ও রক্ষণ। স্ত্রী অন্য ভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বহুপুরুষ-পরম্পরায় এইরূপ বিরতি ও অনভ্যাস বশতঃ সামাজিক নারী আত্ম-পালনে ও রক্ষণে অক্ষম। এ অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্ত্রীজাতির বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুনশ্চ তাহাদিগের সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহ-প্রথার বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম বিনষ্ট না হইলে, তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে।

শিষ্য। তবে পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রীপুরুষের সাম্য-স্থাপন করিতে চাহেন,সেটা সামাজিক বিড়ম্বনামাত্র?

গুরু। সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন পান করাইতে পারে? পক্ষান্তরে, স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি?

শিষ্য। তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা যে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না?

গুরু। কেন খাটিবে না? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে,তাহা অনুশীলিত করুক; পুরুষের স্তন্য পান করাইবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক।

শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি পৌরুষ কর্ম্মে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকে।

গুরু। অভ্যাসজনিত বিকৃতির দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এ সকল বিচার না করিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেই ভাল হয়। যাক্, এ তত্ত্ব যেটুকু বলা আবশ্যক, তাহা বলা গেল। এখন অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সম্বন্ধে কয়টা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা পুনরুক্ত করিয়া সমাপ্ত করি।

প্রথম বলিয়াছি যে, অপত্যপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। দম্পতিপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তিলালসা ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে ইহাও স্বতঃ-স্ফূর্ত্তের ন্যায় বলবতী হয়। এই উভয় বৃত্তিই এই সকল কারণে অতি দুর্দ্দমনীয় বেগবিশিষ্ট। অপত্যপ্রীতির ন্যায় দুর্দ্দমনীয় বেগবিশিষ্ট বৃত্তি মনুষ্যের আর আছে কি না সন্দেহ। নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দ্বিতীয়, এই দুইটি বৃত্তিই অতিশয় রমণীয়। ইহা-দের তুল্য রম্য আর কোন বৃত্তির থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু এমন পরম রমণীয় বৃত্তি মনুষ্যের আর নাই। রমণীয়তার এই দুইটি বৃত্তি সমস্ত মনুষ্য-বৃত্তিকে এতদূর পরাভব করিয়াছে যে, এই দুইটি বৃত্তি, বিশেষতঃ দম্পতি-প্রীতি সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যায়।

তৃতীয়তঃ, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সুখকরও এই দুই বৃত্তির তুল্য আর নাই। ভক্তি ও জাগতিক প্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর,কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না। সে অনুশীলনও কঠিন ও জ্ঞান-সাপেক্ষ। কিন্তু অপত্যপ্রীতির সুখ অনুশীলন-সাপেক্ষ নহে এবং দম্পতি-প্রীতির সুখ কিয়ৎপরিমাণে অনুশীলনসাপেক্ষ হইলেও সে অনুশীলন অতি সহজ ও সুখকর। এই সকল কারণে এই দুই বৃত্তি অনেক সময়ে মনুষ্যের ঘোরতর ধর্মবিঘ্নে পরিণত হয়। ইহারা পরম রমণীয় এবং অতিশয় সুখদ, এজন্য ইহাদের অপরিমিত অনুশীলনে মনুষ্যের অতিশয় প্রবৃত্তি, এবং ইহার বেগ দুর্দ্দমনীয়, এজন্য ইহার অনু-শীলনের ফল ইহাদের সর্ব্বগ্রাসিনী বৃদ্ধি। তখন ভক্তি, প্রীতি এবং সমস্ত ধর্ম ইহাদের বেগে ভাসিয়া যায়। এজন্য সচরাচর দেখা যায় যে, মনুষ্য স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহের বশীভূত হইয়া অন্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে। বাঙ্গালীর এই কলঙ্ক বিশেষ বলবান।

এই কারণে যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদিগের নিকট অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি অতিশয় ঘৃণিত। তাঁহারা স্ত্রীমাত্রকেই পিশাচী মনে করেন। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি, অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরম ধর্ম্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম। অতএব সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না। আর জাগতিক প্রীতিতত্ত্ব বুঝাইবার সময় তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, এই পারিবারিক প্রীতি জাগতিক প্রীতিতে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান। যাহারা এই সোপানে পদার্পণ না করে, তাহারা জাগতিক প্রীতিতে আরোহণ করিতে পারে না।

শিষ্য। যীশু?

গুরু। যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় যাহারা পারে, তাহাদের ঈশ্বরাংশ বলিয়া মনুষ্যে স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাই প্রমাণ যে, এই বিধি যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন আর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আর যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধার্ম্মিকতা সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই।* আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী; যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।

অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্রীতির ভিতর আরও কিছু আছে (১) যাহারা অপত্য স্থানীয়, তাহারাও অপত্যপ্রীতির ভাগী। (২) যাহারা শোণিত সম্বন্ধে আমাদের সহিত সংবদ্ধ, যথা ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি, তাহারাও আমাদের প্রীতির পাত্র। সংসর্গজনিতই হউক, আর আত্মপ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি প্রীতি সচরাচর জন্মিয়া থাকে। (৩) এইরূপ প্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদি ও প্রতিবাসিগণ প্রীতির পাত্র হয়, ইহা প্রীতির নৈসর্গিক বিস্তারকথনকালে বলিয়াছি। (৪) এমন অনেক ব্যক্তির সংসর্গে আমরা পড়িয়া থাকি যে, তাহারা আমাদের স্বজনমধ্যে গণনীয় না হইলেও তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। এই বন্ধুপ্রীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া থাকে।

* "কৃষ্ণচরিত্র" নামক গ্রন্থে এই কথাটি বর্ত্তমান গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

ঈদৃশ প্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সামঞ্জস্যের সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার অনুশীলন করিবে।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

—:*:—

স্বদেশ-প্রীতি।

গুরু। অনুশীলনের উদ্দেশ্য, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে স্ফুরিত ও পরিণত করিয়া ঈশ্বরমুখী করা। ইহার সাধন কর্ম্মীর পক্ষে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এজন্য সমস্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির আধার হওয়া উচিত। জাগতিক প্রীতির ইহাই মূল। এই মৌলিকতা দেখিতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্মের। সমস্ত জগৎ কেন আপনার মত ভালবাসিব? ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া। তবে যদি এমন কাজ দেখি যে, তাহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, কিন্তু এই জাগতিক প্রীতির বিরোধী, তবে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? যদি দুই দিক্ বজায় না রাখা যায়, তবে কোন্ দিক্ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য?

শিষ্য। সে স্থলে বিচার করা কর্ত্তব্য। বিচারে যে দিক্ গুরু হইবে, সেই দিক্ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

গুরু। তবে যাহা বলি, তাহা শুনিয়া বিচার কর। দম্পতিপ্রীতি-তত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি যে, সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম্মধ্বংস, এবং সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গলধ্বংস। তোমার ন্যায় সুশিক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ করি বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। নিষ্প্রয়োজন। বাচস্পতি মহাশয় দেশে থাকিলে এ সকল বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত করার ভার তাঁরে দিতাম।

গুরু। যদি তাহাই হইল, যদি সমাজ-ধ্বংসে ধর্ম্মধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এই জন্য Herbert Spencer বলিয়াছেন, The life of the social organism must, as an end, rank above the lives of its units, অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম এবং এই জন্যই সহস্র সহস্র

ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন।

যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সেই কারণেই ইহা স্বজনরক্ষা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কেন না, তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র, সমুদায়ের জন্য অংশমাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয়।

আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এজন্য সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্ত্তব্য।

যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ন্যায় ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম হয়, তবে ইহাও নিষ্কামকর্ম্মে পরিণত হইতে পারে। ইহা যে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহা বোধ করি, কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। প্রশ্নটা উত্থাপিত করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন, "বিচার কর।" একণে বিচারে কি নিষ্পন্ন হইল?

গুরু। বিচারে এই নিষ্পন্ন হইতেছে, যে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যাদৃশ আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং দেশরক্ষা আমার তাদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, উভয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পর বিরোধী হইবে, তখন কোন্ দিক্ গুরু, তাহাই দেখিবে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা —জগৎরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, অতএব সেই দিক্ অবলম্বনীয়।

কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য কেন হইব? ক্ষুধার্ত্ত চোরের উদাহরণের দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। আর ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক প্রীতি এবং সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যেরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্টসাধন করিব,—সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধন করিব। সাধ্যানুসারে, কেন না, কোন সমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্টসাধন করিব না। পর-সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশ-প্রীতির সামঞ্জস্য। কয়দিন পূর্ব্বে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, একণে তাহার উত্তর পাইলে। বোধ করি,তোমার মনে ইউরোপীয় patriotism ধর্ম্মের কথা জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে যে দেশ-প্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় patriotism নহে। ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশ-বাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন। এখন বল, প্রীতিতত্ত্বের মূলতত্ত্ব কি বুঝিলে?

শিষ্য। বুঝিয়াছি যে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি।

এই ভক্তির ফল জাগতিক প্রীতি। কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন।

এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজন-প্রীতি এবং স্বদেশ-প্রীতির প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। আপাততঃ যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই সকল বৃত্তিকে নিষ্কামতায় পরিণত করিতে আমরা যত্ন করি না, এই জন্য। অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের অভাবে।

আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজন-রক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশ-প্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।

গুরু। ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবনতির কারণ পাইলে। ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল।

কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিষ্য। ভারতবর্ষ আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলন-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে ও কার্য্যে পরিণত করিলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

—:*:—

পশুপ্রীতি।

গুরু। প্রীতিতত্ত্বসম্বন্ধীয় আর একটি কথা বাকি আছে। অন্য সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রীতিতত্ত্ব যাহা তোমাকে বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার কত উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। হিন্দুদিগের জাগতিক প্রীতি যাহা তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহাতেই ইহার চমৎকার উদাহরণ পাইয়াছ। অন্য ধর্ম্মেও সর্ব্বলোকে প্রীতিযুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত মূল কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। হিন্দু-ধর্ম্মের এই জাগতিক প্রীতি জগতত্ত্বে দৃঢ়-বদ্ধমূল। ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতায় ইহার ভিত্তি। হিন্দুদিগের দম্পতিপ্রীতি সমালোচনায় আর একটি এই শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের দম্পতিপ্রীতি অন্য জাতির আদর্শস্থল, হিন্দুধর্ম্মের বিবাহপ্রথা ইহার কারণ।* আমি এক্ষণে প্রীতি-তত্ত্ব-ঘটিত আর একটি প্রমাণ দিব।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। এই জন্য সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বভূত বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না। সমস্ত জীব সর্ব্বভূতান্তর্গত। অতএব পশুগণও মনুষ্যের প্রীতির পাত্র। মনুষ্যও যেরূপ প্রীতির পাত্র,পশুগণও সেইরূপ প্রীতির পাত্র। এইরূপ অভেদজ্ঞান আর কোন ধর্ম্মে নাই, কেবল হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বৌদ্ধধর্ম্মে আছে।

শিষ্য। কথাটা বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মে হইতে পাইয়াছে, না হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে পাইয়াছে?

গুরু। অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাস্য যে, ছেলে বাপের বিষয় পাইয়াছে, না বাপ ছেলের বিষয় পাইয়াছে?

শিষ্য। বাপ কখন কখন ছেলের বিষয় পায়।

গুরু। যে প্রকৃতির গতিবিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, প্রমাণের ভার তাহার উপর। বৌদ্ধপক্ষে প্রমাণ কি?

শিষ্য। কিছুই না বোধ হয়। হিন্দুপক্ষে প্রমাণ কি?

গুরু। ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই যথেষ্ট। তাহা ছাড়া, বাজসনেয় উপনিষৎ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিয়াছি যে, সর্ব্বভূতের যে সাম্য, ইহা প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্ম।

শিষ্য। কিন্তু বেদে ত অশ্বমেধাদির বিধি আছে।

গুরু। বেদ যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষ-প্রণীত একখানি গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে না হয় বেদের প্রতি অসঙ্গতি দোষ দেওয়া যাইত। Thomas Acquinas সঙ্গে হর্ব্বর্ট স্পেন্‌সরের সঙ্গতি খোঁজা যতদূর সঙ্গত, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গতির সন্ধানও ততদূর সঙ্গত। হিংসা হইতে অহিংসায় ধর্ম্মের উন্নতি। যাক্। হিন্দুধর্ম্মবিহিত "পশুদিগের প্রীতি অহিংসা" পরম রমণীয় ধর্ম্ম। যত্নে ইহার অনুশীলন করিবে। অহিন্দুরা যত্নে ইহার অনুশীলন করিয়া থাকে। খাইবার জন্য বা চাষের জন্য বা চড়িবার জন্য যাহারা গো, মেষ, অশ্বাদির পালন করে, আমি কেবল তাহাদের কথা বলিতেছি না। কুকুরের মাংস খাওয়া যায় না, তথাপি কত যত্নে খ্রীষ্টানেরা কুকুর পালন করে। তাহাতে তাহাদের কত সুখ। আমাদের দেশে কত স্ত্রীলোক বিড়াল পুষিয়া অপত্য-হীনতার দুঃখনিবারণ করে। একটি পক্ষী পুষিয়া কে না সুখী হয়? আমি একদা একখানি ইংরেজি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,—যে বাড়ীতে দেখিবে, পিঞ্জরে পক্ষী আছে, জানিবে, সেই বাড়ীতে একজন বিজ্ঞ মানুষ আছে। গ্রন্থখানির নাম মনে নাই, কিন্তু বিজ্ঞ মানুষের কথা বটে।

পশুদিগের মধ্যে গো হিন্দুদিগের বিশেষ প্রীতির পাত্র। গোরুর তুল্য হিন্দুর পরমোপকারী আর কেহই নহে। গোদুগ্ধ হিন্দুর দ্বিতীয় জীবনস্বরূপ। হিন্দু মাংস ভোজন করে না। যে অন্ন আমরা ভোজন করি, তাহাতে পুষ্টিকর (Nitrogenous) দ্রব্য বড় অল্প, গোরুর দুগ্ধ না খাইলে সে অভাব মোচন হইত

* বাবু চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত হিন্দুবিবাহ-বিষয়ক পুস্তিকা দেখ।

না। কেবল গোরুর দুগ্ধ খাইয়াই আমরা মানুষ, এমন নহে; যে ধান্যের উপর আমাদের নির্ভর, তাহার চাষও গোরুর উপর নির্ভর—গোরুই আমাদের অন্নদাতা। গোরু কেবল ধান্য উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত নহে; তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোলা হইতে বাজারে, বাজার হইতে ঘরে বহিয়া দিয়া যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত বহন-কার্য্য গোরুই করে। গোরু মরিয়াও দ্বিতীয় দধীচির ন্যায় অস্থির দ্বারা, শৃঙ্গের দ্বারা ও চামড়ার দ্বারা উপকার করে। মূর্খে বলে, গোরু হিন্দুর দেবতা; দেবতা নহে, কিন্তু দেবতার ন্যায় উপকার করে। বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্র আমাদের যত উপকার করে, গোরু তাহার অধিক উপকার করে। ইন্দ্র যদি পূজার্হ হয়েন, গোরুও তবে পূজার্হ। যদি কোন কারণে বাঙ্গালাদেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ পায়, তবে বাঙ্গালী জাতিও লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। যদি হিন্দু, মুসলমানের দেখাদেখি গোরু খাইতে শিখিত, তবে হয় এতদিন হিন্দু-নাম লোপ পাইত, নয় হিন্দুরা অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া থাকিত। হিন্দুর অহিংসা ধর্ম্মই এখানে হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে। অনুশীলনের ফল হাতে হাতে দেখ। পশুপ্রীতি অনুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুর এ উপকার হইয়াছে।

শিষ্য। বাঙ্গালার অর্দ্ধেক কৃষক মুসলমান।

গুরু। তাহারা হিন্দুজাতিসম্ভূত বলিয়াই হউক, আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জন্যই হউক, আচারে ত তাহারা হিন্দু। তাহারা গোরু খায় না। হিন্দুবংশ-সম্ভূত হইয়া যে গোরু খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম।

শিষ্য। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, হিন্দুরা জন্মান্তরবাদী, তাহারা মনে করে, কি জানি, আমাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ দেহান্তরপ্রাপ্ত হইয়া কোন পশু হইয়া আছেন, এই আশঙ্কায় হিন্দুরা পশুদিগের প্রতি দয়াবান্।

গুরু। তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ও পাশ্চাত্য গর্দ্দভে গোল করিয়া ফেলিতেছ। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম কিছু কিছু বুঝিলে, এক্ষণে ডাক শুনিলে গর্দ্দভ চিনিতে পারিবে।

———

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

—:*:—

দয়া।

গুরু। ভক্তি ও প্রীতির পর দয়া। আর্ত্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতিভাব, তাহাই দয়া। প্রীতি যেমন ভক্তির অন্তর্গত, দয়া তেমনই প্রীতির অন্তর্গত। যে আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখে, সে সর্ব্বভূতে দয়াময়। অতএব ভক্তির অনুশীলনেই যেমন প্রীতির অনুশীলন, তেমনই প্রীতির অনুশীলনেই দয়ার অনুশীলন। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, হিন্দুধর্ম্মে এক সূত্রে গ্রথিত—পৃথক্ করা যায় না। হিন্দুধর্ম্মের মত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্ম্ম আর দেখা যায় না।

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃথক্ অনুশীলন হিন্দুধর্ম্মে অনুজ্ঞাত হইয়াছে।

গুরু। ভূরি ভূরি, পুনঃ পুনঃ। দয়ার অনুশীলন যত পুনঃ পুনঃ অনুজ্ঞাত হইয়াছে, এমন কিছুই নহে। যাহার দয়া নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এই সকল উপদেশে দয়া কথাটা তত ব্যবহৃত হয় নাই, যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দয়ার অনুশীলন দানে, কিন্তু দান কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান বলিলে সচরাচর আমরা অন্নদান, বস্ত্রদান, ধনদান ইত্যাদিই বুঝি। কিন্তু দানের এরূপ অর্থ অতি সঙ্কীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ। ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ। দয়ার অনুশীলনার্থ ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা উচিত নহে। সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ—আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। অতএব যখন দানধর্ম্ম আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইল বুঝিতে হইবে। এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার অনুশীলনমার্গ। নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার অত্যল্পাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে তাহাকে দয়া করা হইল না। কেন না, যেমন জলাশয় হইতে এক গণ্ডূষ জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন প্রকার সঙ্কোচ হয় না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্গ হইল না। এরূপ দান যে না করে, সে ঘোরতর নরাধম বটে, কিন্তু যে করে, সে একটা বাহাদুর নয়। ইহাতে দয়াবৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন নাই। আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের উপকার করিবে, তাহাই দান।

শিষ্য। যদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বৃত্তির অনুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ আপনি বলিয়াছেন, সুখের উপায় ধর্ম্ম।

গুরু। যে, বৃত্তিকে অনুশীলিত করে, তাহার সেই কষ্টই পরম পবিত্র সুখে পরিণত হয়। শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি— ভক্তি, প্রীতি, দয়া ইহাদের একটি লক্ষণ এই,ইহাদের অনুশীলনজনিত দুঃখ সুখে পরিণত হয়। এই বৃত্তিগুলি সকল দুঃখকেই সুখে পরিণত করে। সুখের উপায় ধর্ম্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট, সেও যত দিন আত্মপর-ভেদজ্ঞান থাকে, তত দিনই লোক তাহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ ধর্ম্মানুমোদিত যে আত্মপ্রীতি, তাহার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশ্বরানুমোদিত। এজন্য নিষ্কাম হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে। সামঞ্জস্যবিধি পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এক্ষণে দানধর্ম্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ শাস্ত্রকারেরা (সকলে নহে) বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজন্য দান করিবে। এখানে পুণ্য—স্বর্গাদি কাম্যবস্তুলাভের উপায়। দান করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, এই জন্য দান করিবে, ইহাই সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারের ব্যবস্থা। এরূপ দানকে ধর্ম্ম বলিতে পারি না। স্বর্গলাভার্থ ধনদান করার অর্থ মূল্য দিয়া স্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের জন্য টাকা দাদন দিয়া রাখা মাত্র। ইহা ধর্ম্ম নহে, বিনিময় বা বাণিজ্য। এরূপ দানকে ধর্ম্ম বলা ধর্ম্মের অবমাননা।

দান করিতে হইবে, কিন্তু নিষ্কাম হইয়া দান করিবে। দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য দান করিবে, দয়াবৃত্তিতে প্রীতিবৃত্তিরই অনুশীলন, এবং প্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন, অতএব ভক্তি, প্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য দান করিবে। বৃত্তির অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তিতে ধর্ম্ম,অতএব ধর্ম্মার্থেই দান করিবে, পুণ্যার্থ বা স্বর্গার্থ নহে। ঈশ্বর সর্ব্বভূত আছেন, অতএব সর্ব্বভূতে দান করিবে, যাহা ঈশ্বরের, তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্ব্বদানই মনুষ্যত্বের চরম। সর্ব্বভূতে এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সর্ব্বস্বে তোমার, এবঞ্চ সর্ব্বলোকের অধিকার। যাহা সর্ব্বলোকের, তাহা সর্ব্বলোককে দিবে। ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত, গীতোক্ত ধর্ম্মের অনুমোদিত দান। ইহাই যথার্থ দানধর্ম্ম। নহিলে তোমার অনেক আছে, তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে। বিস্ময়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে যে, তাহাও দেয় না।

শিষ্য। সকলকেই কি দান করিতে হইবে? দানের কি পাত্রাপাত্র নাই? আকাশের সূর্য্য সর্ব্বত্র করবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়,আকাশের মেঘ সর্ব্বত্র জলবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান হাজিয়া ভাসিয়া যায়। বিচারশূন্য দানে কি সেরূপ আশঙ্কা নাই?

গুরু। দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য। যে দয়ার পাত্র, তাহাকেই দান করিবে। যে আর্ত্ত, সেই দয়ার পাত্র,অপরে নহে। অতএব যে আর্ত্ত, তাহাকেই দান করিবে—অপরকে নহে। সর্ব্বভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার দুঃখমোচনার্থ আত্মোৎসর্গ করিবে। তবে কোন প্রকার দুঃখ নাই, এমন লোকও সংসারে পাওয়া যায় না। যাহার দারিদ্র্যদুঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে. যাহার রোগ-দুঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে। ইহা বলা কর্ত্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সময় পৃথিবীর পাপবৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া পৃথিবীতে যাহারা সৎকার্য্যে দিনযাপন করিতে পারে, তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয়। অনুচিত দানে সংসারে আলস্য, বঞ্চনা এবং পাপক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অনেকে তাই ভাবিয়া কাহাকেও দান করেন না। তাঁহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলস্য বশতই ভিক্ষুক অথবা প্রবঞ্চক। এই দুই দিক্ বাঁচাইয়া দান করিবে। যাহারা জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তি বিহিত অনুশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন নহে। কেন না, তাহারা বিচারক্ষম, অথচ দয়াপর, অতএব মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় না।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান-সম্বন্ধে যে ভগবদুক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্য্য এইরূপ।

> দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
> দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥
> যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
> দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥
> অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
> অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

অর্থাৎ "দেওয়া উচিত" এই বিবেচনায় যে দান, যাহার প্রত্যুপকার করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে দান, দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক দান। প্রত্যুপকার-প্রত্যাশায় যে

দান, ফলের উদ্দেশে যে দান, এবং অপ্রসন্ন হইয়া যে দান করা যায়, তাহা রাজস দান। দেশকাল-পাত্র-বিচারশূন্য যে দান, অনাদরে এবং অবজ্ঞাযুক্ত যে দান, তাহা তামস দান।

শিষ্য। দানের দেশকালপাত্র কিরূপে বিচার করিতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু উপদেশ আছে কি?

গুরু। গীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরা সে কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারদিগের রহস্য দেখ। দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। সকল কর্ম্মই দেশ-কালপাত্র বিচার করিয়া করিতে হয়। দানও সেইরূপ। দেশ-কাল-পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে দান আর সাত্ত্বিক হইল না, তামসিক হইল। কথাটার অর্থ সোজা, বুঝিবার জন্য হিন্দু-ধর্ম্মের কোন বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না। বাঙ্গালা দেশ দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে, মনে কর, সেই সময় ম্যাঞ্চেষ্টারে কাপড়ের কল বন্ধ,—শিল্পী-দিগের কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে দুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারিলে কেবল বাঙ্গালায়, যা পারি দিব। তাহা না দিয়া যদি আমি সকলই ম্যাঞ্চেষ্টারে দিই, তবে দেশবিচার হইল না। কেন না, ম্যাঞ্চেষ্টারে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কালবিচারও ঐরূপ। আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিলে, কা'ল হয় ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে। তখন সে প্রাণদান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে না। পাত্রবিচার অতি সহজ—প্রায় সকলেই করিতে পারে। দুঃখীকে সকলেই দেয়, জুয়া-চোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব "দেশে কালে চ পাত্রে চ" এ কথার একটা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই—যে উদার জাগতিক মহানীতি সকলের হৃদয়গত, ইহা তাহারই অন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা কি বলেন, তাহা দেখ। "দেশে"—কি না "পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ"। শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। তার পর "কালে" কি? শঙ্কর বলেন, "সংক্রান্ত্যাদৌ"—শ্রীধর বলেন, "গ্রহ-ণাদৌ।" "পাত্রে" কি? শঙ্কর বলেন, "ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায়"—শ্রীধর বলেন, "পাত্রভূতায় তপোব্রতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়।" সর্ব্বনাশ! আমি যদি স্বদেশে বসিয়া মাসের ১লা হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনদুঃখী পীড়িত কাতর একজন মুচি কি ডোমকে কিছু দান করি, তবে সে দান, ভগবদভিপ্রেত দান হইল না। এইরূপে কখন কখন ভাষ্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার এবং সার্ব্বলৌকিক যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার উপধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। এখানে শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা ভগবদ্বাক্যে নাই। কিন্তু তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। ভগবদ্বাক্যকে স্মৃতির অনুমোদিত করিবার জন্য, সেই উদার ধর্ম্মকে অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই সকল মহাপ্রতিভাসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহামহোপাধ্যায়গণের তুলনায় আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকেরা পর্ব্বতের নিকট বালুকাকণাতুল্য, কিন্তু ইহাও কথিত আছে যে,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥ *

বিনা বিচারে ঋষিদিগের বাক্যসকল মস্তকের উপর এত কাল বহন করিয়া আমরা এই বিশৃঙ্খলা, অধর্ম্ম এবং দুর্দ্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি অনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত। নহিলে আমরা চন্দনবাহী গর্দ্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই পীড়িত হইতে থাকিব—চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিব না।

শিষ্য। তবে এখন ভাষ্যকারদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার করা আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য।

গুরু। প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্য্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে যেখানে বুঝিবে যে, তাঁহাদিগের উক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাঁহা-দের পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে।

* মনু ১২শ অধ্যায় ১১৩শ শ্লোকের টীকায় কুল্লূক-ভট্টকৃত বৃহস্পতিবচন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

—:০:—

চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি।

শিষ্য। একণে অন্যান্ত কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। আমার কাছে তাহা বিশেষ শুনিবার প্রয়োজন নাই। শারীরিকী বৃত্তি বা জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সম্বন্ধেও আমি কেবল সাধারণ অনুশীলনপদ্ধতি বলিয়া দিয়াছি, বৃত্তিবিশেষ-সম্বন্ধে অনুশীলনপদ্ধতি কিছু শিখাই নাই। কি প্রকারে শরীরে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে অস্ত্রশিক্ষা বা অশ্বচালন করিতে হইবে, কি প্রকারে মেধাকে তীক্ষ্ণ করিতে হইবে, বা কি প্রকারে বুদ্ধিকে গণিতশাস্ত্রের উপযোগী করিতে হইবে, তাহা বলি নাই। কারণ, সে সকল শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। অনুশীলনতত্ত্বের মূল মর্ম্ম বুঝিবার জন্য কেবল সাধারণবিধি জানিলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারীরিকী ও জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছি। কার্য্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু কার্য্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বিধি, তাহা ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং দয়া, প্রীতির অন্তর্গত। সমস্ত ধর্ম্মই এই তিনটি বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর করে। এই জন্য আমি ভক্তি, প্রীতি, দয়া, বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নচেৎ সকল বৃত্তি গণনা করা, বা তাহার অনুশীলনপদ্ধতি নির্ব্বাচন করা, আমার উদ্দেশ্য নহে, সাধ্যও নহে। শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী বা কার্য্যকারিণী বৃত্তি-সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বলিয়াছি। একণে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি-সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

জগতের সকল ধর্ম্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন বিশেষরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ এমন সিদ্ধান্ত করিতে পারে না যে, প্রাচীন ধর্ম্মবেত্তারা ইহার আবশ্যকতা অনবগত ছিলেন বা এ সকলের অনুশীলনের কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পূজার পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, ধুনা, গুগ্‌গুল, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন। প্রাচীন গ্রীকদিগের ধর্ম্মে, এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় খ্রীষ্টধর্ম্মে উপাসনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তির ও পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপিলীস বা রাফেলের চিত্র, মাইকেল এঞ্জিলো বা ফিদিয়সের ভাস্কর্য্য, মর্ম্মাণির বিখ্যাত সঙ্গীত-প্রণেতৃগণের সঙ্গীত,উপাসনার সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা ধর্ম্মের পদে উৎসর্গ করা হইত। ভারতবর্ষেও স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত উপাসনার সহায়।

শিষ্য। তবে এমন হইতে পারে, প্রতিমাগঠন উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার ফল।

গুরু। এ কথা সঙ্গত বটে,* কিন্তু প্রতিমাগঠনের যে

---

* এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা ইংরেজিতে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"The true explanation consists in the ever true relations of the Subjective Ideal to its objective Reality. Man is by instinct a poet and an artist. The passionate yearnings of the heart for the Ideal in beauty, in power and in purity must find an expression in the world of the Real. Hence proceed all poetry and all art. Exactly in the same way, the ideal of the Divine in man receives a form from him, and the form an image. The existence of Idols is as justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of that of Prometheus. The religious worship of idols is as justifiable as the intellectual worship of Hamlet or Prometheus. The homage we owe to the ideal of the Human realized in art is admiration. The homage we owe to the ideal of the Divine realized in Idolatry is worship."

Statesman, Sept 28, 1882.

এই তত্ত্ব সুলেখক বাবু চন্দ্রনাথ বসু নবজীবনের "ষোড়শোপচারে পূজা" ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে এরূপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, আমার উপরিধৃত তুই ছত্র ইংরেজির অনুবাদ এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হয় না।

অন্য কোন মূলও নাই, এমন কথা বলিতে পার না। প্রতিমাপূজার উৎপত্তি কি, তাহা বিচারের স্থল এ নহে। চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত এ সকল চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও তৃপ্তি-বিধায়ক, কিন্তু কাব্যই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য, গ্রীক্ ও রোমক ধর্ম্মের সহায়, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মেই কাব্যের বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দুদিগের একণে প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে যে, অন্য দেশে তাহা অতুলনীয়। অতএব হিন্দুধর্ম্মে যে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের জন্য মনোযোগ ছিল, এমন নহে। তবে যাহা পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মের অংশ বলিয়া বিধিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির যেমন অনুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহারও হিংসা করিবে না, দান করিবে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে, সেইরূপ আপনার এই ব্যাখ্যানুসারে ইহাও বিহিত হইবে যে, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং কাব্যের অনুশীলন করিবে?

গুরু। হাঁ। নহিলে মনুষ্যের ধর্ম্মহানি হইবে।

শিষ্য। বুঝিলাম না।

গুরু। বুঝ। জগতে আছে কি?

শিষ্য। যাহা আছে, তাই আছে।

গুরু। তাহাকে কি বলে?

শিষ্য। সৎ।

গুরু। বা সত্য। এখন এই জগৎ ত জড়পিণ্ডের সমষ্টি। জাগতিক বস্তু নানাবিধ, ভিন্নপ্রকৃতি, বিবিধগুণবিশিষ্ট। ইহার ভিতর কিছু ঐক্য দেখিতে পাও না? বিশৃঙ্খলার মধ্যে কি শৃঙ্খলা দেখিতে পাও না?

শিষ্য। পাই।

গুরু। কিসে দেখ?

শিষ্য। এক অনন্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তি—যাহাকে স্পেন্সার Inscrutable power in nature বলিয়াছেন, তাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতেই সব বিলীন হইতেছে।

গুরু। তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাউক। সেই চৈতন্যরূপিণী যে শক্তি, তাহাকে চিৎশক্তি বলা যাউক। এখন বল দেখি, সতে এই চিদের অবস্থানের ফল কি?

শিষ্য। ফল ত এইমাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই জাগতিক শৃঙ্খলা। অনির্ব্বচনীয় ঐক্য।

গুরু। বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বল, জীবের পক্ষে এই অনির্ব্বচনীয় শৃঙ্খলার ফল কি?

শিষ্য। জীবনের উপযোগিতা বা জীবের সুখ।

গুরু। তাহার নাম দাও আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলাম। কিন্তু জানিব কি প্রকারে? এক একটা করিয়া ভাবিয়া দেখ। প্রথম, সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, সেই অস্তিত্বমাত্র জানিব কি প্রকারে?

শিষ্য। এই সৎ অর্থে সতের গুণও বটে?

গুরু। হাঁ, কেন না, সেই সকল গুণও আছে। তাহাই সত্য।

শিষ্য। তবে সৎ বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে।

গুরু। প্রমাণ কি?

শিষ্য। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অন্য প্রমাণ আমি অনুমানের মধ্যে ধরি।

গুরু। ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ। অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। * প্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য ইন্দ্রিয় সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির স্বচ্ছন্দতাই যথেষ্ট। তার পর অনুমান জন্য জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি আবশ্যক। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলিকে হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্রে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলির নাম বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এই মনঃ ও বুদ্ধির প্রভেদ, কোন কোন ইউরোপীয় দার্শনিককৃত জ্ঞাপিকা এবং বিচারিকা বৃত্তিমধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সঙ্গে কতক মিলে। অনুমান জন্য এই মনোনামযুক্ত বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখন এই সব্যাপী চিৎকে জানিবে কি প্রকারে?

শিষ্য। সেও অনুমানের দ্বারা।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা বিচারিকা বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহার অনুশীলনের দ্বারা

* সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে। ইহা ভগবদ্গীতার টীকায় বুঝান গিয়াছে— পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

অর্থাৎ সৎকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং চিৎকে জানিবে ধ্যানের দ্বারা। তার পর আনন্দকে জানিবে কিসের দ্বারা?

শিষ্য। ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয়। আমরা আনন্দ অনুমান করি না—অনুভব করি, ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অপ্রাপ্য। অতএব ইহার জন্য অন্য জাতীয় বৃত্তি চাই।

গুরু। সেইগুলি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্ অনুশীলনে এই সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্ম্মের হানি হয়। আমাদের সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার যত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার ধর্ম্ম আলোচনায় জানা যায়, যাহা শক্তিমান বা উপকারী বা সুন্দর, তাহারই উপাসনা, এই আদিম বৈদিক ধর্ম্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিতের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এই জন্য কালে তাহা উপনিষদ্ সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদের ধর্ম্ম—চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্ম্মে কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্ম্মের একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্ম্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম্ম হইবার উপযুক্ত এবং এই কারণেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ত্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে নাই। একণে যাহারা ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বর যেমন সৎস্বরূপ, যেমন চিৎস্বরূপ, তেমন আনন্দস্বরূপ; অতএব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধর্ম্ম কখন স্থায়ী হইবে না।

শিষ্য। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মে আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্জস্য নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

গুরু। অবশ্য। হিন্দুধর্ম্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে—ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যক ও অনাবশ্যক অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে। তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই। একণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনন্তসৌন্দর্য্যময়, তিনি যদি সগুণ হয়েন, তবে তাঁহার সকল গুণই আছে, কেন না, তিনি সর্ব্বময় এবং তাঁহার সকল গুণই অনন্ত। অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনন্তসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। তিনি মহৎ, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নির্ব্বিকার। এই সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য্য, তাহাও তাঁহাতে অনন্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে? অতএব বুদ্ধ্যাদি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির, ভক্ত্যাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন, ধর্ম্মের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলনও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। তাঁহার সৌন্দর্য্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও তাঁহার প্রতি সম্যক্ প্রেম বা ভক্তি জন্মিবে না। আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মে এই জন্য কৃষ্ণোপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজলীলা-কীর্ত্তনের সংযোগ হইয়াছে।

শিষ্য। তাহার ফল কি সুফল ফলিয়াছে?

গুরু। যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহার ফল সুফল। যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে না, যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল। চিত্তশুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত কেহই বৈষ্ণব হইতে পারে না। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম অজ্ঞান বা পাপাত্মার জন্য নহে। যাহারা রাধাকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে—পিশাচ।

সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীলা অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে

একটা অযথা ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু আদৌ ইহা ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি বলিয়াছি, "পরানুরক্তিরীশ্বরে।" অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা না হউক, স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্ত্তমান, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিতকুসুম সুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকূজিত বৃন্দাবনবনস্থলী, জড়প্রকৃতির মধ্যে অনন্তসুন্দরের সশরীর বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী বংশী। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া কৃষ্ণে তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইল। আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল।

"কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ।
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাম্।
দুষ্ট কালিয় ! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে ॥
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া ॥ ইত্যাদি।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যে অনুরাগিণী হইয়া (অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি, তাহার সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। রাসলীলা-রূপকের ইহাই স্থূল তাৎপর্য্য এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মও সেই পথগামী। অতএব মনুষ্যত্বে, মনুষ্যজীবনে, এবং হিন্দুধর্ম্মে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির কতদূর আধিপত্য, বিবেচনা কর।

শিষ্য। এক্ষণে এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি-সকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। জাগতিক সৌন্দর্য্যে চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি স্ফূরিত হইতে থাকিলে ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যানুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস পাইতে থাকিবে। সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির এই এক স্বভাব যে, তদ্দ্বারা প্রীতি, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকল স্ফূরিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তবে একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তিতে আর কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে। এই জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, কবিরা কাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হয়। এ কথার যাথার্থ্য এই পর্য্যন্ত যে, যাহারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বৃত্তিগুলির সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা "আমি প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচনা ভিন্ন আর কিছু করিতে নাই," এই ভাবিয়া যাঁহারা ফুলিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারাই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে, যে সকল শ্রেষ্ঠ কবি, অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত পরিচালনা করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তাঁহারা অকর্ম্মণ্য না হইয়া বরং বিষয়কর্ম্মে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করেন। ইউরোপে সেক্ষপীয়র, মিল্‌টন্, দান্তে,গেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা বিষয়কর্ম্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস না কি কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন। এখনকার লর্ড টেনিসন না কি ঘোরতর বিষয়ী লোক। চার্লস্ ডিকেন্‌স্ প্রভৃতির কথাও জান।

শিষ্য। কেবল নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের উপর চিত্তস্থাপনেই কি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি হইবে ?

গুরু। এ বিষয়ে মনুষ্যই মনুষ্যের উত্তম সহায়। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্যা সকল মনুষ্যের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য এই সকল সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌন্দর্য্যের অনুভবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে স্ফূরিত হয়। কিন্তু

কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। তদ্দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রেমিক হয়। এই জন্য কবি, ধর্ম্মের একজন প্রধান সহায়। বিজ্ঞান বা ধর্ম্মোপদেশ মনুষ্যত্বের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ। যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন নাই।

শিষ্য। কিন্তু কুকাব্যও আছে।

গুরু। সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করদিগের ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু, এবং তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

—:*:—

উপসংহার।

গুরু। অনুশীলনতত্ত্ব সমাপ্ত করিলাম, যাহা বলিবার, তাহা সব বলিয়াছি, এমন নহে। সকল কথা বলিতে হইলে কথা শেষ হয় না। সকল আপত্তির মীমাংসা করিয়াছি, এমন নহে, কেন না, তাহা করিতে গেলেও কথার শেষ হয় না। অনেক কথা অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ আছে, এবং অনেক ভুলও যে থাকিতে পারে, তাহা আমার স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। আমি এমনও প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সকলই বুঝিয়াছ। তবে ইহার পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। তবে স্থূল মর্ম্ম যে বুঝিয়াছ, বোধ করি, এমন প্রত্যাশা করিতে পারি।

শিষ্য। তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

১। মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

৫। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।

৬। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত। এই সকল স্থূল কথা।

গুরু। কই, শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি এ সকলের তুমি ত নামও করিলে না?

শিষ্য। নিষ্প্রয়োজন। অনুশীলনতত্ত্বের মূলমর্ম্মে এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে বুঝিয়াছি, আমাকে অনুশীলনতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এই সকল নামের সৃষ্টি করিয়াছেন।

গুরু। তবে তুমি অনুশীলনতত্ত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।*

* অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের কি সম্বন্ধ, তাহা এই গ্রন্থমধ্যে বুঝাইলাম না। কারণ, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকায় "স্বধর্ম্ম" বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি। গ্রন্থের সম্পূর্ণতা-রক্ষার জন্য (ঘ) চিহ্নিত ক্রোড়পত্রে তদংশ গীতার টীকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

ক্রোড়পত্র [ক]

—:০:—

(মল্লিখিত ধর্ম্মজিজ্ঞাসা নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।)

ধর্ম্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতিশব্দের দ্বারা আগে নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ। প্রথম, ইংরেজ যাহাকে Religion বলে, আমরা তাহাকে ধর্ম্ম বলি—যেমন হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম। দ্বিতীয়, ইংরেজ যাহাকে Morality বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম্ম বলি, যথা অমুক কার্য্য "ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, "মানবধর্ম্মশাস্ত্র," "ধর্ম্মসূত্র" ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায় ইহার আর একটি নাম প্রচলিত আছে—নীতি। বাঙ্গালী একালে আর কিছু পারুক না পারুক, "নীতিবিরুদ্ধ" কথাটা চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়, ধর্ম্ম শব্দে Virtue বুঝায়। Virtue ধর্ম্মাত্মা মনুষ্যের অভ্যস্ত গুণকে বুঝায়, নীতির বশবর্ত্তী অভ্যাসের উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি, অমুক ব্যক্তি ধার্ম্মিক, অমুক ব্যক্তি অধার্ম্মিক। এখানে অধর্ম্মকে ইংরেজিতে Vice বলে। চতুর্থ, রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত যে কার্য্য, তাহাকেও ধর্ম্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধর্ম্ম বলে। যথা "দান পরম-ধর্ম্ম," "অহিংসা পরম ধর্ম্ম," "গুরুনিন্দা পরম অধর্ম্ম।" ইহাকে সচরাচর পাপ-পুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই অধর্ম্মের নাম Sin—পুণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই—"Good deed" বা তদ্রূপ বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা সাহেবেরা অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম্মশব্দে গুণ বুঝায়। যথা "চৌম্বকের ধর্ম্ম লৌহাকর্ষণ।" এ স্থলে যাহা অর্থান্তরে অধর্ম্ম, তাহাকেও ধর্ম্ম বলা যায়। যথা "পরনিন্দা—ক্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম্ম।" এই অর্থে মনু স্বয়ং "পাষণ্ড-ধর্ম্মের" কথা লিখিয়াছেন, যথা—

"হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ।

পুনশ্চ—

পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ।

আর ষষ্ঠতঃ, ধর্ম্মশব্দ কখন কখন আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই বলেন—

"দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।"

এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে। এইখানে এক অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে, কাজেই অপসিদ্ধান্তে পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম-প্রয়োগের জন্য, ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন তত্ত্বের সুমীমাংসা হয় না। এ গোলযোগ আজ নূতন নহে। যে সকল গ্রন্থকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক। মনুসংহিতা প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক ইহার উত্তম উদাহরণ। ধর্ম্ম কখন রিলিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যস্ত ধর্ম্মাত্মতার প্রতি এবং কখন পুণ্যকর্ম্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে—নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্ম্মে, কর্ম্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত হওয়াতে, একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম্ম (রিলিজন) —উপধর্ম্মসঙ্কুল, নীতি—ভ্রান্ত, অভ্যাস—কঠিন, এবং পুণ্য—দুঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল।

ক্রোড়পত্র [খ]।

—:০:—

(ঐ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)

গুরু। রিলিজন কি?

শিষ্য। সেটা জানা কথা।

গুরু। বড় নয়—বল দেখি, কি জানা আছে?

শিষ্য। যদি বলি, পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস?

গুরু। প্রাচীন য়িহুদীরা পরলোক মানিত না। য়িহুদীদের প্রাচীন ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়?

শিষ্য। যদি বলি, দেবদেবীতে বিশ্বাস?

গুরু। ইস্লাম, খ্রীষ্টীয়, য়িহুদী প্রভৃতি ধর্ম্মে দেবী নাই। সে সকল ধর্ম্মে দেবও এক ঈশ্বর। এগুলি কি ধর্ম্ম নয়?

শিষ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম্ম।

গুরু। এমন অনেক রমণীয় ধর্ম্ম আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচন করিলে বুঝা যায় যে, তৎপ্রণয়নের

সমকালিক আর্য্যদিগের ধর্ম্মে অনেক দেবদেবী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই। বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই—যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেইগুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন।—অথচ তাঁহারা ধর্ম্মহীন নহেন; কেন না, তাঁহারা কর্ম্মফল মানিতেন এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স্ কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মও নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বরবাদ ধর্ম্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি? দেখ, কিছুই পরিষ্কার হয় নাই।

শিষ্য। তবে বিদেশী তার্কিকদিগের ভাষা অবলম্বন করিতে হইল—লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম্ম।

গুরু। অর্থাৎ Supernaturalism, কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পড়িলে দেখ। প্রেততত্ত্ববিৎ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং ধর্ম্মও নাই, ধর্ম্মের প্রয়োজনও নাই। রিলিজনকে ধর্ম্ম বলিতেছি, মনে থাকে যেন।

শিষ্য। অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম্ম আছে। যথা "Religion of Humanity,"

গুরু। সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম্ম নয়।

শিষ্য। তবে আপনিই বলুন, ধর্ম্ম কাহাকে বলিব?

গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" মীমাংসাদর্শনের প্রথম সূত্র। এই প্রশ্নের উত্তরদানই মীমাংসাদর্শনের উদ্দেশ্য। সর্ব্বত্র গ্রাহ্য উত্তর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম মীমাংসাকারের উত্তর শুন। তিনি বলেন,—"চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ।" চোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য। শুধু এইটুকু থাকিলে বলা যাইত, কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু যখন উহার উপর কথা উঠিল, "চোদনাপ্রবর্ত্তকো বেদবিধিরূপঃ" তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কি না।

শিষ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক্ ধর্ম্মগ্রন্থ, ততগুলি পৃথক্ প্রকৃতি-সম্পন্ন ধর্ম্ম মানিতে হয়। খ্রীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেলবিধিই ধর্ম্ম, মুসলমানও কোরাণ সম্বন্ধে ঐরূপ বলিবে। ধর্ম্মপদ্ধতি ভিন্ন হউক, ধর্ম্ম বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? Religions আছে বলিয়া Religion বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি?

গুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন যে, "বেদপ্রতিপাদ্য-প্রয়োজনবদর্থো ধর্ম্মঃ।" এই সকল কথার পরিণামফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, যাগাদিই ধর্ম্ম এবং সদাচরণই ধর্ম্মশব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে, যথা মহাভারতে—

> "অক্রোধঃ সত্যবচনং সংবিভাগঃ ক্ষমা তথা" —

> "ব্রহ্মচর্য্যং তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ।
> বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসূয়িতা।
> আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ।"

কেহ বা বলেন, "দ্রব্যক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্ম্মত্বং" এবং কেহ বলেন, ধর্ম্ম অদৃষ্টবিশেষ। ফলতঃ আর্য্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচারসম্মত কার্য্যই ধর্ম্ম, যথা বিশ্বামিত্র—

> "যমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবেদিনঃ।
> স ধর্ম্মো যং বিগর্হন্তি তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে।"

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমন নহে। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ" ইত্যাদি শ্রুতিতে সূচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদনুবর্ত্তী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞানই পরমধর্ম্ম। ভগবদ্গীতার মূল তাৎপর্য্যই কর্ম্মাত্মক বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষ-প্রতিপাদন। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দুধর্ম্মবাদের সাধারণতঃ বিরোধী। যেখানে এই ধর্ম্ম দেখি—অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্যত্র, কি ভাগবতে—সর্ব্বত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তা। এই জন্য আমি হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণপর্ব্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি।

"অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না, কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রকদিগের হিংসা-নিবারণার্থে ই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়াই

ধর্ম্ম নাম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম," ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপর্ব্ব হইতে ধর্ম্মব্যাধোক্ত ধর্ম্মব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি—"যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক, তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।" এ স্থলে ধর্ম্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

শিষ্য। এ দেশীয়েরা ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাখ্যা। রিলিজনের ব্যাখ্যা কই?

গুরু। রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন্ শব্দে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে পারে?

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া শুনাই।

"For Religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it was so broad as to dispense with the necessity of a name. With other peoples, religion is only a part of life, there are things religious, and there are things lay and secular, To the Hindu his whole life was religion. To other peoples their relations to God and to the spiritual world are things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life, are incapable of being so distinguished They form one compact and harmonious whole, to separate which into its component parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, and religion never received a name from him, because it never had for him an existence apart from all that had received a name. A department of thought which the people in whom it had its existence had thus failed to differentiate has necessarily mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so difficult at the present day to erect it into a separate entity." *

শিষ্য। তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্য্যদিগের মতই শুনা যাউক।

গুরু। তাহাতেও বড় গোলযোগ। প্রথমতঃ, রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই যে, *re-ligare* হইতে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন—ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পণ্ডিত কিকিরো (বা সিসিরো) বলেন যে, ইহা re-ligere হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ। মোক্ষমূলর প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে, এ শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনই স্ফূরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শিষ্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম্ম অর্থাৎ রিলিজন কাহাকে বলিব, তাই বলুন।

গুরু। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধর্ম্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা religio শব্দের অনুরূপ। ধর্ম্ম ধৃ—মন্ (ধ্রিয়তে লোকো অনেন ধরতি লোকং বা) এই জন্য আমি ধর্ম্মকে religio শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

শিষ্য। তা হৌক—এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন।

গুরু। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জর্ম্মাণেরাই সর্ব্বাগ্রগণ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি নিজে

* লেখক প্রণীত কোন ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল, উহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মর্ম্মার্থ বাঙ্গালায় এখানে সন্নিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ রকমের কথা আমার অনেক পাঠকে বুঝিবে না। যাঁহাদের জন্য লিখিতেছি, তাঁহারা না বুঝিলে লেখা বৃথা। অতএব এই রুচিবিরুদ্ধ কার্য্যটুকু পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারা এটুকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইবে না।

জর্ম্মাণ জানি না। অতএব প্রথমতঃ মোক্ষমূলরের পুস্তক হইতে জর্ম্মাণদিগের মত পড়িয়া শুনাইব। আদৌ, কাণ্টের মত পর্য্যালোচনা কর।

"According to Kant, religion is morality. When we look upon all our moral duties as divine Commands, that he thinks constitutes religion. And we must not forget that Kant does not consider that duties are moral duties because they rest on a divine command (that would be according to Kant merely revealed Religion) on the contrary, he tells us that because we are directly conscious of them as duties therefore we look upon them as divine commands.

তার পর ফিক্‌্‌টে। ফিক্‌টের মতে—"Religion is knowledge. It gives to a man a clear insight into himself, answers the highest questions, and thus imparts to us a complete harmony with ourselves, and a thorough sanctification to our mind, সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্দপ্রয়োগ ভিন্ন প্রকার। তার পর স্লিয়ের মেকর। তাঁহার মতে—Religion consists in our consciousness of absolute dependence on something, which though it determines us, we cannot determine in our turn. তাঁহাকে উপহাস করিয়া হেগেল বলেন—Religion is or ought to be perfect freedom, for it is neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit. এ মত কতকটা বেদান্তের অনুগামী।

শিষ্য। যাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটি ব্যাখ্যাও প্রশস্ত বলিয়া বোধ হইল না। আচার্য্য মোক্ষমূলরের নিজের মত কি?

গুরু। তিনি বলেন, Religion is a subjective faculty for the apprehension of the Infinite,

শিষ্য। Faculty! সর্ব্বনাশ! বরং রিলিজন বুঝিলে বুঝা যাইবে—Faculty বুঝিবে কি প্রকারে? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

গুরু। এখন জর্ম্মাণদের ছাড়িয়া দিয়া দুই এক জন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টেলর সাহেব বলেন যে, যেখানে Spiritual Beings" সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেইখানেই রিলিজন। এখানে "Spirtual Beings" অর্থে কেবল ভূত-প্রেত নহে—লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত; দেব দেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএব তোমার বাক্যের সহিত ইহার বাক্যের ঐক্য হইল।

শিষ্য। সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন।

গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব মৌসুকের বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন।

শিষ্য। তিনি ত নীতিমাত্রবাদী, ধর্ম্মবিরোধী।

গুরু। তাঁহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে।—যাই হৌক, তাঁহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্ম সকল সম্বন্ধে বেশ খাটে।

তিনি বলেন—"The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence, and is rightfully paramount over all selfish objects of desire"

শিষ্য। কথাটা বেশ।

গুরু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলার কথা শোন। আধুনিক ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যাকারকদিগের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত "Ecco Home" এবং "Natural Religion" অনেককেই মোহিত করিয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার একটি উক্তি বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে। * বাক্যটি এই—"The Substance of Religion is Culture," কিন্তু তিনি একদল লোকের মতের সমালোচনকালে, এই উক্তির দ্বারা তাঁহাদিগের মত পরিস্ফুট করিয়াছেন—এটি ঠিক তাঁহার নিজের মত নহে। তাঁহার নিজের মত বড় সর্ব্বব্যাপী। সে মতানুসারে রিলিজন "habitual and permanent admiration" ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে হইল।

"The words Religion and worship are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God. But those feelings—love, awe, admiration—which

* দেবী চৌধুরাণীতে।

together make up worship —are felt in various combination for human beings and even for inanimate objects. It is not exclusively, but only *par excellence* that religion is directed towards God, When feelings of admiration are very strong and at the same time serious and permanent, they express themselves in recurring acts and hence arises ritual, liturgy and whatever the multitude indentifies with religion. But without ritual religion may exist in its elementary state and this elementary state of Religion is what may be described as *habitual and permanent admiration.*"

শিষ্য। এ ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল্ যে কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার ঐক্য হইতেছে। এই "habitual and permaent admiration" যে মানসিক ভাব, তাহারই ফল, strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence,

গুরু। এ ভাব ধর্ম্মের একটি অঙ্গমাত্র। যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া, অগুস্ত কোম্‌তের ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনাইয়া নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না, কোম্‌ৎ নিজে একটি অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি-কর্ত্তা, এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন।

তিনি বলেন—"Religion in itself expresses the state of perfect *unity* which is the distinctive mark of mans existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose." অর্থাৎ "Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying point for all the separate individuals."

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

শিষ্য। আগে ধর্ম্ম বুঝি, তার পর পারি যদি তবে না হয়, হিন্দুধর্ম্ম বুঝিব। এই সকল পণ্ডিতগণ-কৃত ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল।

গুরু। কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক্, শাক্যসিংহ, যিশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য,—তাঁহারাও ধর্ম্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমন স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মনুষ্য-প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।

ক্রোড়পত্র [গ]

—:*:—

অষ্টম অধ্যায় দেখ।

If, as the sequence of a malady contracted in pursuit of illegitimate gratification, an attack of iritis injures vision, the mischief is to be counted among those entailed by immoral conduct, but if regardless of protesting sensations, the eyes are used in study too soon after opthalmia, and there follows blindness for years or for life, entailing not only personal unhappiness but a burden on others, moralists are silent. The broken leg which a drunkard's accident causes, counts among those miseries brought on self and family by intemperance, which from the ground for reprobating it, but if anxiety to fulfil duties prompts the continued use of a sprained knee in spite of the pain, and brings on a chronic lameness involving lack of

exercise, consequent ill-health, inefficiency, anxiety and unhappiness, it is supposed that ethics has no verdict to give in the matter. A student who is plucked because he has spent in amusement the time and money that should have gone in study, is blamed for thus making parents unhappy and preparing for himself a miserable future, but another, who thinking exclusively of claims on him, reads night after night with hot or aching head, and, breaking down, cannot take his degree, but returns home shattered in health and unable to support himself, is named with pity only, as not subject to any moral judgment or rather, the moral judgment passed, is wholly favourable.

Thus recognizing the evils caused by some kinds of conduct only, men at large, and moralists as exponents of their beliefs, ignore the suffering and death daily caused around them by disregard of that guidance which has established itself in the course of evolution. Led by the tacit assumption, common to Pagan stoics and Christian ascetics, that we are so diabolically organized that pleasures are injurious and pains beneficial, people on all sides yield examples of lives blasted by persisting in actions against which their sensations rebel. Here is one who drenched to the skin and sitting in a cold wind, poohpoohs his shiverings and gets rheumatic fever with subsequent heart-disease, which makes worthless the short life remaining to him. Here is another who, disregarding painful feelings, works too soon after a debilitating illness, and establishes disordered health that lasts for the rest of his days, and makes him useless to himself and others. Now the account is of a youth who, persisting in gymnastic feats in spite of scracely bearable, straining bursts a blood vessel, and, long laid on the shelf, is permanently damaged, while now it is of a man in middle life who pushing muscular effort to painful excess suddenly brings on hernia. In this family is a case of aphasia, spreading paralysis, and death, caused by eating too little and doing too much; in that, softening of the brain has been brought on by ceaseless mental efforts against which the feelings hourly protested; and in others, less serious brain affections have been contracted by over-study continued regardless of discomfort and the craving for fresh air and exercise. * Even without accumulating special examples, the truth is forced on us by the visible traits of classes. The care-worn man of business too long at his office, the cadaverous barrister pouring half the night over his briefs, the feeble factory-hands and unhealthy seamstresses passing long hours in bad air, the anœmic, flat-chested school-girls, bending over many lessons and forbidden boisterous play, no less than Sheffield grinders, who die of suffocating dust, and peasants crippled with rheumatism due to exposure, show us the widespread miseries caused by persevering in actions repugnant to the sensations and neglecting actions which the sensations prompt. Nay the evidence is stil more extensive and conspicuous. What are the puny malformed children, seen in poverty-striken districts, but children whose appetites for food and desires for warmth have not been adequately satisfied? What are populations stunted in growth and prematurely aged, such as parts of France show us, but populations injured by work in excess and food in defect, the one implying positive pain the other negative

---

* I can count up more than a dozen such cases among those personally well-known to me.

pain? What is the implication of that greater mortality which occurs among people who are weakened by privations, unless it is that bodily miseries conduce to fatal illnesses? Or once more, what must we infer from the frightful amount of disease and death suffered, by armies in the field, fed on scanty and bad provisions, lying on damp ground, exposed to extremes of heat and cold, inadequately sheltered from rain, and subject to exhausting efforts, unless it be the terrible mischiefs caused by continuously subjecting the body to treatment which the feelings protest against?

It matters not to the argument whether the actions entailing such effects are voluntary or involuntary It matters not from the biological point of view, whether the motives prompting them are high or low The vital functions accept no apologies on the ground that neglect of them was unavoidable, or that the reason for neglect was noble. The direct and indirect sufferings caused by nonconformity to the laws of life are the same whatever induces the non-conformity and cannot be omitted in any rational estimate of conduct. If the purpose of ethical inquiry is to establish rules of right-living, and if the rules of right-living are those of which the total results, individual and general, direct and indirect, are most conducive to human happiness, then it is absurd to ignore the immediate results, and recognize only the remote results,—Herbert Spencer. Data of Ethics.—p p. 93 95

ক্রোড়পত্র। [ঘ]

—:•:—

(অনুশীলন তত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের সম্বন্ধ)

"বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই। *

অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধর্ম্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুশীলিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সকল মনুষ্যেরেই স্বধর্ম্ম হইত। কিন্তু মনুষ্যসমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। † কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এজন্য জ্ঞানার্জ্জন যাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মন্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্ব্বিষয় আছে ও বহির্ব্বিষয় আছে। অন্তর্ব্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, বহির্ব্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়। সেই বহির্ব্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হৌক, অথবা সবই হৌক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ. যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। (১) যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধর্ম্মী, (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধর্ম্মী, (৩) এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধ ধর্ম্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?

* কোম্‌ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন,—'Thought, Feeling, Action." ইহা ন্যায্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিংবা Action প্রাপ্ত হয়। এইজন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

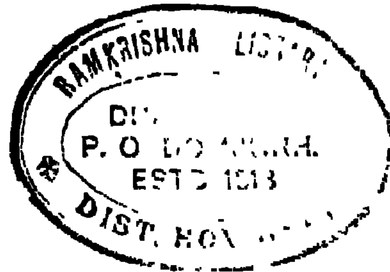
† আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতা[illegible] বলিতেছি।

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম্ম নহে, বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই,কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম; কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। যখন জ্ঞানধর্ম্মী, যুদ্ধধর্ম্মী, বাণিজ্যধর্ম্মী বা কৃষিধর্ম্মীর কর্ম্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধর্ম্মিগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম।"

ভগবদ্গীতার টীকায় যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে এই কয়টি কথা উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন প্রয়োজনীয়। তবে কথা এই যে, যাহার যে স্বধর্ম্ম, অনুশীলন তদনুবর্ত্তী না হইলে সে স্বধর্ম্মের সুপালন হইবে না। অনুশীলন স্বধর্ম্মানুবর্ত্তী হওয়ার অর্থ এই যে,স্বধর্ম্মের প্রয়োজন-অনুসারে বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন চাই।

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথা লেখা গেল না। আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের কথাই বলিয়াছি, কেন না, তাহাই ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্গত; বিশেষ অনুশীলনের কথা বলি নাই, কেন না, তাহা শিক্ষাতত্ত্ব। উভয়ে কোন বিরোধ নাই ও হইতে পারে না, ইহাই আমার এখানে বলিবার প্রয়োজন।

ধর্ম্মতত্ত্ব সমাপ্ত



বিবিধ প্রবন্ধ

দ্বিতীয় খণ্ড

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

(তৃতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত)

বিজ্ঞাপন

যে সকল প্রবন্ধ এই সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, অল্পভাগ প্রচারে।

১২৭৯ সালে আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ করি। চারি বৎসর আমি উহার সম্পাদকতা নির্ব্বাহ করি। ঐ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন সামান্তই হউক, একটু স্থানলাভ করিয়াছে। এজন্য অনেকে উহা পাইবার অভিলাষ করেন। অনেকে আমাকে সে জন্য পত্র লেখেন, কিন্তু যাহা নাই, তাহা আমি দিতে পারি না। অনেকে পরামর্শ দেন যে, বঙ্গদর্শন পুনর্মুদ্রিত কর। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আমি একমাত্র লেখক ছিলাম না। অন্যের রচনা আমি কি প্রকারে পুনর্মুদ্রিত করিব? যাহা পারি, তাহা করিয়াছি। আমার নিজের রচনার অধিকাংশই ইতিপূর্ব্বে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। যাহা বাকি ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই প্রবন্ধে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

সকলগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্যও নহে। যাহা এ পর্য্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহার সঙ্গে প্রচার নামক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধও পুনর্মুদ্রিত করিলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব কি না, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।

যাহা পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত করা উচিত হইয়াছে কি না, এ বিষয় বিচারের স্থল। "বঙ্গদেশের কৃষক" তাহার মধ্যে একটি। যে সকল কারণে ঐ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহা ঐ প্রবন্ধের শিরোভাগে কতক কতক লিখিয়াছি। কিন্তু ঐখানে সকল কথা লিখিবার স্থান করিতে পারা যায় নাই। আমি সেখানে স্বীকার করিয়াছি যে, ঐ প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রঘটিত বিচারে কতকগুলি ভ্রম আছে। ভ্রমগুলি সংশোধিত না করিয়া, প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করার একটি কারণ সেইখানে লিখিয়াছি। আর একটি কারণ নির্দ্দিষ্ট করিবার উপযুক্ত স্থান এই, ঐ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে যেমন বাহির হইয়াছিল, তেমনই পুনর্মুদ্রিত করিতে চাই। যে মানুষ খ্যাতিলাভ করে,

তাহার দোষগুণ আমরা দুই দেখিতে ইচ্ছা করি। এই প্রবন্ধটিও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। অনেক পাঠক ঐ প্রবন্ধটিও দোষগুণ সমেত দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন।

এরূপ বিবেচনা করিয়াও বহুবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারূঢ়, তীব্র সমালোচনায় তাঁহার আর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার গ্রন্থ যেরূপ তীব্রতার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন আর তাহা পারা যায় না। কেন না, এখন তাঁহার শোকে আমরা সকলেই কাতর, যাঁহার জন্য সকলেই রোদন করিতেছি, তাঁহার কোন ত্রুটির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ-সমীপে উপস্থিত করিতে পারা যায় না। অতএব যেটুকু তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা এবং যাহা মল্লিখিত প্রবন্ধের তীব্রাংশ,তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি, যাহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম,তাহা যাঁহারাই রাজব্যবস্থার দ্বারা অথবা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারের দ্বারা সমাজসংস্কার বা সমাজবিপ্লব উপস্থিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই খাটে। তাঁহাদের দল এখনও অপরাজিত ও অক্ষুণ্ণ। সেই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্যাতি বা অখ্যাতির জন্য লালায়িত মালাবরী নামে একজন পারসী সে দিন একটা হুলস্থূল উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তিসম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের সম্পূর্ণ বিলোপও করিতে পারিলাম না।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী নয়। এক সময় ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলী-মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস-সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই, কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা-রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি ত কুলী-মজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না।

বলিতে কেবল বাকি আছে, "মনুষ্যত্ব কি?" ইতিশীর্ষক প্রবন্ধ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিতের সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র। ধর্ম্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে যে অনুশীলনধর্ম্ম বুঝাইয়াছি, তাহার বীজ ইহাতে আছে। "রামধন পোদ" ইতিশীর্ষক প্রবন্ধের অন্য নাম ছিল।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত

মুড়িবেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুচিরাম গুড় মহাশয় এই জগৎ পবিত্র করিবার জন্ত কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা লেখে না। ইতিহাস এরূপ অনেক প্রকার বদমাইসি করিয়া থাকে। এ দেশে ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, নচেৎ উচিত ব্যবস্থা করা যাইত।

যশোদা দেবীর গর্ভে সাফলরাম গুড়ের ঔরসে তাঁহার জন্ম। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কেন না, উচ্চবংশের কথা কিছুই বলিতে পারা গেল না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। গুড় শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে, তিনি মিষ্টবিশেষ হইতে জন্মিয়াছিলেন।

সাফলরাম গুড় কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস সাধুভাষায় মোহনপল্লী, অপর ভাষায় মোনাপাড়া। মোহনপল্লী ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘর কতক কৈবর্ত্তের বাস। গুড় মহাশয় এক ব্রাহ্মণ—যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকময়ী করেন, যেমন এক বিষ্ণুই পুরুষোত্তম, যেমন এক বার্ত্তাকুন্দ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমনি সাফলরাম একা মোহনপল্লী উজ্জ্বল করিতেন। শ্রাদ্ধশান্তিতে কাঁচা কদলী, আতপতণ্ডুল এবং দক্ষিণা, ষষ্ঠীমাকালের পূজায়—অন্নপ্রাশনাদিতে নারিকেলনাড়ু, ছোলা, কলা আদি তাঁহার লাভ হইত। সুতরাং যাজনক্রিয়ায় বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁহারই ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া মুচিরাম গুড়রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। দেখিয়া যশোদা, সেটা বালকের অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, অতিশয় গর্ব্বান্বিতা হইলেন। যথাকালে মুচিরামের অন্নপ্রাশন হইল। নামকরণ হইল মুচিরাম। এত নগেন্দ্র, গজেন্দ্র, চন্দ্রভূষণ, বিধুভূষণ থাকিতে তাঁহার মুচিরাম নাম হইল কেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না, তবে দুষ্টলোক বলিত যে, যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোন কালো-কোলো কোঁকড়াচুলনধরশরীর মুচিরাম দাসনামা কৈবর্ত্তপুত্র তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটি যশোদার কানে মিষ্ট লাগিত।

যাহাই হউক, যশোদা নাম রাখিলেন মুচিরাম। নাম পাইয়া মুচিরামশর্ম্মা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে "মা" "বাবা" "দু" "দে" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির বলে বিদ্যাকান্নায় এক বৎসর পার হইতে না হইতেই সুপণ্ডিত হইলেন। তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই গুরুভোজন দোষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম মাকে পিছু উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন, যশোদা কাঁদিয়া বলিলেন, এমন গুণের ছেলে বাঁচলে হয়।

পাঁচ বৎসরে সাফলরাম গুড় মহাশয় কিছু গোলে পড়িলেন। যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাঁচ বৎসরে পুত্রের হাতে-খড়ি হয়। সর্ব্বনাশ! সাফলরামের তিনপুরুষের মধ্যে সে কাজ হয় নাই। মাগী বলে কি? যে দিন কথা পড়িল, সে দিন সাফলরামের নিদ্রা হইল না।

যমুনার জল উজান বহিতে পারে, তবু গৃহিণীর বাক্য নড়িতে পারে না। সুতরাং সাফলরাম হাতে-খড়ির উদ্‌যোগ দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিন ক্রোশের মধ্যে পাঠশালা বা গুরুমহাশয় নাই। কে লেখাপড়া শিখাইবে? সাফলরাম বিষণ্ণবদনে বিনীতভাবে যশোদা দেবীর শ্রীপাদপদ্মে এই সংবাদ সুনিবেদন করিলেন। যশোদা বলিলেন, "ভাল, তুমি কেন আপনিই হাতে-খড়ি দিয়া ক, খ, শিখাও না।" সাফলরাম একটু ম্লান হইয়া বলিলেন, "হাঁ, তা আমি পারি, তবে কি জান, শিব-সেবক যজমানের জ্বালায়—আজি কি রান্না হইল?" শুনিবামাত্র যশোদা দেবীর মনে পড়িল, আজি কৈবর্ত্তেরা পাতিলেবু দিয়া গিয়াছে। বলিলেন, "অধঃপেতে মিন্সে"—এই বলিয়া পতিপুত্রপ্রাণা যশোদা দেবী বিষণ্ণ-মনে সজলনয়নে পাতিলেবু দিয়া পান্তা ভাত খাইতে বলিলেন।

অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সানুরাগ হইল। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে—"পরা অপরা চ"—গাছে উঠা, জলে ডোবা এবং সন্দেশ চুরি। কৈবর্ত্ত যজমানদিগের কল্যাণে গুড়ের ঘরে সন্দেশের অভাব নাই। নারিকেলসন্দেশ এবং অন্যান্য যে সকল জাতীয় সন্দেশের সঙ্গে ছানার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, যাহা সর্ব্বদা মুচিরামের ঘরে থাকিত, সে সকল মুচিরামের বিদ্যাভ্যাসের কারণ হইল। কৈবর্ত্তের ছেলেদের সঙ্গে মুচিরামের প্রত্যহ একটি নূতন কোন্দল হইত,—শুনা গিয়াছে, কৈবর্ত্তদিগের ঘরেও খাবার চুরি যাইত।

নবম বৎসরে মুচিরামের উপনয়ন হইল। তার পর সাফলরাম এক বৎসর প্রিয়তম পুত্রকে সন্ধ্যা-আহ্নিক শিখাইলেন। এক বৎসরে মুচিরাম আহ্নিক শিখিয়াছিলেন কি না, আমরা জানি না। কেন না, প্রমাণাভাব। তার পর মুচিরাম কখন সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন নাই।

তার পর এক দিন সাফলরাম গুড় অকস্মাৎ ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যশোদার আর দিন যায় না, যজমানদিগের পৌরোহিত্য কে করে? কৈবর্ত্তেরা আর এক ঘর বামন আনিল। যশোদা অন্নকষ্টে—ধান ভানিতে আরম্ভ করিলেন।

যখন মুচিরামের বয়স দশ বৎসর, কৈবর্ত্তেরা চাঁদা করিয়া একটা বারোইয়ারি পূজা করিল। যাত্রা দিবার জন্য বারোইয়ারির কৈবর্ত্তেরা সভাদয়ে হারাণ অধিকারীকে তিন দিনের জন্য বায়না করিয়া আনিয়া কলাগাছের উপর সরা জ্বালিয়া তিন রাত্রি যাত্রা শুনিল। মুচিরাম এই প্রথম যাত্রা শুনিল। যাত্রার গান, যাত্রার গল্প অনেক শুনিয়াছিল—কিন্তু একটা আস্তযাত্রা, এই প্রথম শুনিল, চূড়া-ধরা ঠেঙ্গা-লাঠি সহিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম দেখিল। আহ্লাদ উছলিয়া উঠিল। নিশ্চিত সংবাদ রাখি যে, পরদিন মুচিরাম গালাগালি, মারামারি বা চুরি, মাতাকে প্রহার, এ সকলের কিছুই করে নাই।

মুচিরামের একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণ্ঠ। প্রথম দিন যাত্রা শুনিয়া বহুযত্নে একটা গানের মোহাড়াটা শিখিয়াছিল। পরদিন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাইয়া ফিরিতে লাগিল। দৈবাৎ হারাণ অধিকারী লোটা হাতে, পুষ্করিণীতে হস্তমুখ প্রক্ষালনাদির অনুরোধে যাইতেছিলেন, প্রভাত-বায়ু-পরিচালিত হইয়া মুচিরামের সুস্বর অধিকারী মহাশয়ের কানের ভিতর গেল। কানে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল—মনের ভিতর গিয়া কল্পনার সাহায্যে, টাকার সিন্দুকের ভিতরও প্রবেশ করিল, অধিকারী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। সে দোষে অধিকারী মহাশয় একা দোষী নহেন, জিজ্ঞাসা করিলে অনেক উকীল মহাশয়েরা ইহার কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারিবেন। তাঁহাদের কাছেও গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। উকীল বাবুদেরই বা দোষ কি? Glorious British Constitution! হায়! গলাবাজি সার।

অধিকারী মহাশয়—মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন না—ব্রিটিশ পার্লিমণ্টের মত, এবংক কুরঙ্গিণীসদৃশ মনুষ্যকণ্ঠেই মুগ্ধ—অতএব তিনি হাত নাড়িয়া মুচিরামকে ডাকিলেন। মুচিরাম আসিল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার যাত্রার দলে থাকিবে?"

মুচিরাম আহ্লাদে আটখানা। মাকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখিল না—তখনই সঙ্গে যায়। কিন্তু অধিকারী মনে করিল যে, পরের ছেলে না বলিয়া

লইয়া যাওয়া কিছু নয়। অতএব মুচিরামকে সঙ্গে করিয়া তাহার মা'র নিকটে গেল।

শুনিয়া যশোদা বড় কাঁদা-কাটা আরম্ভ করিল—সবে একটি ছেলে—আর কেহ নাই—কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে? এ দিকে আবার অন্ন জুটে না—যদি একটা খাবার উপায় হইতেছে—কেমন করিয়াই বা 'না' বলেন? বিধাতা কি আর এমন সুযোগ করিয়া দিবেন? আমি না দেখিতে পাই, তবু ত মুচিরাম ভাল খাইবে; ভাল পরিবে। যশোদা যাত্রাওয়ালার দুঃখ জানিত না, অগত্যা পাঁচ টাকা মাসিক বেতন রফা করিয়া যশোদা মুচিরামকে হারাণ অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিল। তার পর আছাড়িয়া পড়িয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুচিরাম অল্পদিনেই দেখিল যে, যাত্রাওয়ালার জীবন সুখের নয়। যাত্রাওয়ালা কেবল কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ডালে মুকুল ভোজন করিয়া বেড়ায় না। অল্পদিনে মুচিরামের শরীর শীর্ণ হইল। এ গ্রাম ও গ্রাম ছুটাছুটি করিতে করিতে সকল দিন আহার হয় না, রাত্রি জাগিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত, চুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা করিল, গায়ে খড়ি উড়িতে লাগিল; অধিকারীর কান মলায় দুই কানে ঘা হইল। শুধু তাই নয়, অধিকারী মহাশয়ের পা টিপিতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব করিতে হয়। অল্পদিনেই মুচিরামের সোনার মেঘ বাষ্পরাশিতে পরিণত হইল।

মুচিরামের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, বুদ্ধিটা বড় তীক্ষ্ণ নহে। শীতের তাল যে পুষ্করিণীতীরস্থ দীর্ঘবৃক্ষে ফলে না, ইহা বুঝিতে তাহার বহুকাল গেল। ফলে তালিমের সময়ে তালের কথা পড়িলে, মুচিরাম অন্যমনস্ক হইত—মনে পড়িত, মা কেমন করিয়া তালের বড়া করে। মুচিরামের চক্ষু দিয়া এবং রসনা দিয়া জল বহিয়া যাইত।

আবার গান মুখস্থ করা আরও দায়—কিছুতেই মুখস্থ হইত না—কানমলায় কানমলায় কান রাঙ্গা হইয়া গেল। সুতরাং আসরে গাহিবার সময়ে পিছন হইতে তাহাকে বলিয়া দিতে হইত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল বাধিত—সকল সময়ে ঠিক শুনিতে বা বুঝিতে পারিত না। এক দিন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে।

"নীরদকুন্তলা—লোচন চঞ্চলা দধতি সুন্দররূপং।"

মুচিরাম গাহিল—"নীরদকুন্তলা" থামিল।—আবার পিছন হইতে বলিল, "লোচনচঞ্চলা"; মুচিরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া গাহিল, "লুচি, চিনি, ছোলা!" পিছন হইতে বলিয়া দিল—"দধতি সুন্দররূপং" মুচিরাম না বুঝিয়া গাহিল, "দধিতে সন্দেশরূপং।" সে দিন আর গাহিতে পাইল না।

মুচিরামকে কৃষ্ণ সাজিতে হইত—কিন্তু কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে বলিয়া দিতে হইত—কেবল "আ—বা—আ—বা—ধবলী"টি মুখস্থ ছিল। এক দিন মানভঞ্জন যাত্রা হইতেছে—পিছন হইতে মুচিরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণকে ডাকিতে হইবে, "মানময়ি রাধে! একবার বদন তুলে কথা কও।" মুচিরাম সবটা শুনিতে না পাইয়া কতক দূর বলিল, "মানময়ি রাধে একবার বদন তুলে—" সেই সময়ে বেহালাওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কল্কে দিয়া বলিতেছিল "গুড়ুক খাও"—শুনিয়া মুচিরাম বলিল, "রাধে, একবার বদন তুলে—গুড়ুক খাও" হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না—হাসি কিসের,—যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল কেন? কিন্তু যখন দেখিল, অধিকারী সাজঘরে আসিয়া একগাছা বাঁক সাপটিয়া ধরিয়া, তাহার দিকে ধাবমান হইলেন, তখন মুচিরাম হঠাৎ বুঝিল যে, এই বাঁক তাহার পৃষ্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা; অতএব কথিত পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আশু প্রয়োজন। এই ভাবিয়া মুচিরাম অকস্মাৎ নিক্রান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

অধিকারী মহাশয় বাঁকহস্তে তৎপশ্চাৎ নিক্রান্ত হইয়া, মুচিরামকে না দেখিতে পাইয়া তাহার ও তাহার পিতামহ, মাতা ও ভগিনীর নানাবিধ অংশে কীর্তন করিতে লাগিলেন। মুচিরামও এক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া নানাবিধ অস্ফুটস্বরে অধিকারী মহাশয়ের পিতৃমাতৃ সম্বন্ধে তদ্রূপ অপরাধ করিতে লাগিল। অধিকারী মুচিরামের সন্ধান না পাইয়া সাজঘরে গিয়া, বেশ ত্যাগ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। দেখিয়া মুচিরাম বৃক্ষচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া রুদ্ধদ্বারসমীপে দাঁড়াইয়া অধিকারীকে নানাবিধ অবক্তব্য কদর্য্য ভাষায় মনে মনে সম্বোধন করিতে লাগিল এবং উভয় হস্তের

সন্তুষ্ট উত্থিত করিয়া তাহাকে কদলী ভোজনের অনুমতি করিল। তৎপরে রুদ্ধকবাটকে বা কবাটের অন্তরালস্থিত অধিকারীর বদনচন্দ্রকে একটি লাথি দেখাইয়া মুচিরাম ঠাকুরবাড়ীর রোয়াকে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

প্রভাতে উঠিয়া অধিকারী মহাশয় গ্রামান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুনিলেন, মুচিরাম আইসে নাই—কেহ কেহ বলিল, "তাহাকে খুঁজিয়া আনিব?" অধিকারী মহাশয় গালি দিয়া বলিলেন, "জুটতে হয় আপনি জুটবে, এখন আমি খুঁজে বেড়াতে পারি না।" দয়ার্দ্রচিত্ত বেহালাওয়ালা বলিল, "ছেলেমানুষ—যদি নাই জুটতে পারে—আমি খুঁজে আনিব।" অধিকারী ধমকাইলেন—মনে মনে ইচ্ছা, মুচিরামের হাত হইতে উদ্ধার পান এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওনা টাকাগুলি ফাঁকি দেন। বেহালাওয়ালা ভাবিল—মুচিরাম কোনরূপে জুটিবে। আর কিছু বলিল না।

যাত্রার দল চলিয়া গেল—মুচিরাম জুটিল না। রাত্রিজাগরণ—দেবালয়বারান্দায় সে অকাতরে নিদ্রা দিতেছিল। উঠিয়া দল চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন বুদ্ধি নাই যে, অধিকারী কোন্ পথে গিয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে যায়, কেবল কাঁদিতে লাগিল। পূজারী বামন অনুগ্রহ করিয়া বেলা তিন প্রহরে দুইটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিল। খাইয়া, মুচিরাম কান্নার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিল। যত রাত্রি নিকট হইতে লাগিল, তত ভাবিতে লাগিল—আমি কেন পলাইলাম! আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না!

দ্বিজ দর্পনারায়ণ বলে, এবার যখন বাঁক উঠিতে দেখিবে, পিঠ দিও। তোমার গোষ্ঠীর বাপ-চৌদ্দপুরুষে বুড়া সেনরাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিতেছে। তুমি পলাইবে কোথায়? এ সুসভ্যজাতের অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলে বাঁক পেটাই করিয়া থাকে—মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ পলায় না—রাখাল ছাড়া কি গোরু থাকিতে পারে বাপু? ঘাস-জলের প্রয়োজন হইলেই তোমার যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই, তখন পাঁচনবাড়িকে প্রাতঃ-প্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঈশান বাবু এক জন সৎকুলোদ্ভূত কায়স্থ। অতি ক্ষুদ্র লোক—কেন না, বেতন এক শত টাকামাত্র—কোন জেলায় ফৌজদারী আপিসের হেড কেরাণী! বাঙ্গালা দেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়—কে কত বড় বাঁদর, তার ল্যাজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃপতন আর কখন কোন দেশের হয় নাই। বন্দী চরণশৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে।

ঈশান বাবু ক্ষুদ্র ব্যক্তি—ল্যাজে খাটো, বানরত্বে খাটো—কিন্তু মনুষ্যত্বে নহে। যে গ্রামে হারাণ অধিকারী এই অপূর্ব্ব মানভঞ্জন যাত্রা করিয়াছিলেন, ঈশান বাবুর সেই গ্রামে বাস। যাত্রাটি যে সময় হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি ছুটী লইয়া বাড়ীতে ছিলেন। যাত্রার ব্যাপার তিনি কিছু জানিতেন কি না, বলিতে পারি না, যাত্রার পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি পথে বেড়াইতেছেন, দেখিলেন, একটি ছেলে—শুষ্ক শরীর, দীর্ঘ কেশ—অনুভবে যাত্রার দলের ছেলে—পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।

ঈশান বাবু ছেলেটির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদচিস্ কেন বাবা?

ছেলে কথা কয় না। ঈশান বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

ছেলে বলিল, "আমি মুচিরাম!"

ঈশা। তুমি কাদের ছেলে?

মুচি। বামনদের।

ঈশা। কোন্ বামনদের?

মুচি। আমি গুড়েদের ছেলে।

ঈশা। তোমার বাড়ী কোথায়?

মুচি। আমাদের বাড়ী মোনাপাড়া।

ঈশা। সে কোথা?

তা ত মুচিরামের বিদ্যার মধ্যে নহে। যাই হোক, ঈশান বাবু অল্পসময়ে মুচিরামের দুর্ঘটনা বুঝিয়া লইলেন, "তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব," এই বলিয়া মুচিরামকে আপনার বাড়ী লইয়া গেলেন। মুচিরাম হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। ঈশান বাবু তাহার আহারাদি ও অবস্থিতির উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু মোনাপাড়ার ত কোন ঠিকানা হইল না। সুতরাং মুচিরাম ঈশান বাবুর গৃহে বাস করিতে লাগিল। সেখানে আহার-পরিচ্ছদের

ব্যবস্থা উত্তম এবং কানমলার অত্যন্তাভাব দেখিয়া মুচিরামও বাড়ীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল না।

এ দিকে ঈশান বাবুর ছুটী ফুরাইল—সপরিবারে কর্ম্মস্থানে আসিবেন। অগত্যা মুচিরামও সঙ্গে চলিল। কর্ম্মস্থানে গিয়াও ঈশান ঘোনাপাড়ায় অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা মুচিরাম তাঁহার গলায় পড়িল। মুচিরামও যেখানে আহারের ব্যবস্থা উত্তম, সেখানে গলায় পড়িতে নারাজ নহে—তবে ঈশান বাবুর একটি ব্যবস্থা মুচিরামের বড় ভাল লাগিল না। ঈশান বাবু বলিলেন, "বাপু, যদি গলায় পড়িবে, একটু লেখাপড়া শিখিতে হইবে।" ঈশান বাবু তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন।

এ দিকে মুচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেলের কোন সংবাদ না পাইয়া পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর কাঁদাকাটি করিয়া বেড়াইয়া শেষে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া মরিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এ দিকে যশোদানন্দন শ্রীশ্রীমুচিরাম শর্ম্মা—ঈশানমন্দিরে সুবিরাজমান—সম্পূর্ণরূপে মাতৃবিস্মৃত। যদি কখন মাকে মনে পড়িত, তবে সে আহারের সময়—ঈশান বাবুর ঘরের প্রফুল্ল মল্লিকা-সন্নিভ সিদ্ধান্ন, দানাদার গব্য ঘৃত, ঝোলে নিমগ্ন রোহিতমৎস্য, পৃথিবীর ন্যায় নিটোল গোলাকার সদ্যোতর্জ্জিত লুচির রাশি—এই সকল পাতে পাইলে মুচিরাম মনে করিতেন, 'মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত।' সে সময়ে মাকে মনে পড়িত—অন্য সময়ে নহে।

মুচিরামের পাঠশালায় লেখা-পড়া সমাপ্ত হইল—অর্থাৎ গুরুমহাশয় বলিল, সমাপ্ত হইয়াছে। মুচিরামের কোন গুণ ছিল না, এমত বলি না, তাহা হইলে এ ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। মুচিরামের কণ্ঠস্বর ভাল ছিল বলিয়াছি—গুণ নম্বর এক। গুণ নম্বর দুই, তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইল। আর কিছুই হইল না। ঈশান বাবু মুচিরামকে ইংরেজি স্কুলে পাঠাইলেন।

মুচিরাম ধেড়ে ছেলে, স্কুলে ঢুকিয়া বড় বিপদ্গ্রস্ত হইল। মাষ্টারেরা তামাসা করে, ছোট ছোট ছেলেরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসে। মুচিরাম রাগ্ করে, কিন্তু পড়ে না। সুতরাং মাষ্টারেরা হারাণ অধিকারীর পথে গেলেন। আবার কানমলায় কানমলায় মুচিরামের কান রাঙ্গা হইয়া উঠিল। প্রথমে কানমলা, তার পর বেত্রাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, কীলাঘাত এবং যুতাঘাত। ঈশান বাবুর ঘরে তপ্ত লুচির জোরে মুচিরাম নির্ব্বিবাদে সব হজম করিল।

এইরূপে মুচিরাম তপ্ত লুচি ও বেত খাইয়া স্কুলে পাঁচ সাত বৎসর কাটাইল। কিছু হইল না। ঈশান বাবু তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ঈশান বাবুর দয়ার শেষ নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি—মুচিরামের হাতের লেখাও ভাল—ঈশান বাবু মুচিরামের একটি দশ টাকার মুহরিগিরি করিয়া দিলেন, বলিয়া দিলেন, "ঘুসঘাস লইও না বাপু, তা হ'লে তাড়াইয়া দিব।" মুচিরাম শর্ম্মা প্রথম দিনেই একটা হুকুমের চোরাও নকল দিয়া আট গণ্ডা পয়সা হাত করিলেন এবং সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই তাহা প্রতিবাসিনী কুলটাবিশেষের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন।

এ দিকে ঈশান বাবুও প্রাচীন হইয়া আসিয়াছেন। তিনি ইহার পরেই পেন্সন লইয়া স্বকর্ম্ম হইতে অবসর লইলেন এবং মুচিরামকে লইয়া পৃথক্ বাসা করিয়া দিয়া সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। মুচিরাম ঈশান বাবুকে একটু ভয় করিত—এক্ষণে তাহার পোয়াবারো পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পোয়া-বারো—মুচিরাম জেলা লুটিতে লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুই চারি আনা লইত। তার পর দাঁও শিখিল। কেলো সেখের ধানগুলি জমীদার জোর করিয়া কাটিয়া লইতে উদ্যত, সাহেব দয়া করিয়া পুলিসকে হুকুম দিলেন, কেলুর সম্পত্তি রক্ষা করিবে। সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্তু পরওয়ানাখানি লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা মুচিরামের হাত। পরওয়ানা যাইতে যাইতে ধান থাকে না, কেলু মুচিরামকে এক টাকা, দুই টাকা, তিন টাকা, ক্রমে পাঁচ টাকা স্বীকার করিল

—তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির হইল। তখন ম্যাজিষ্ট্রেটেরা স্বহস্তে জোবানবন্দী লইতেন না—এক এক কোণে বসিয়া এক এক জন মুহুরী ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আর যাহা ইচ্ছা, তাহা লিখিত। সাক্ষীরা এক রকম বলিত, মুচিরাম আর এক রকম জোবানবন্দী লিখিতেন, মোকদ্দমা বুঝিয়া কি সাক্ষী প্রতি চারি আনা, আট আনা, এক টাকা পাইতেন। মোকদ্দমা বুঝিয়া মুচি দাঁও মারিতেন, অধিক টাকা পাইলে সব উল্টা লিখিতেন। এইরূপে নানাপ্রকার ফিকির-ফন্দিতে মুচিরাম অনেক টাকা উপার্জন করিতে লাগিলেন—তিনি একা নহে, সকলেই করিত—তবে মুচি কিছু অধিক নির্লজ্জ কখন কখন লোকের ট্যাঁক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।

যাই হোক, মুচি শীঘ্রই বড়মানুষ হইয়া উঠিল—কোন্ মুচি না হয়? অচিরাৎ সেই অকৃতনাম্নী প্রতিবাসিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইল। মদ, গাঁজা, গুলী, চরস, আফিঙ—যাহার নাম করিতে আছে এবং যাহার নাম করিতে নাই—সকলই মুচি বাবুর গৃহকে অহর্নিশি আলোক ও ধূমময় করিতে লাগিল। মুচিরামেরও চেহারা ফিরিতে লাগিল, গালে মাস লাগিল—হাড় ঢাকিয়া আসিল—বর্ণ জাপান বেলার ছাড়িয়া দ্বিতীয় নাম্বরায় পৌঁছিল। পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য জন্মিতে লাগিল—শাদা, কালো, নীল, জরদা, রাঙ্গা, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মুচিরাম সর্ব্বদা রঞ্জিত। রাত্রিদিন মাথায় তেড়িকাটা, অধরে তাম্বূলের রাগ—এবং কণ্ঠে সিন্দুর টিপ্পা। সুতরাং মুচিরামের পোয়াবারো।

দোষের মধ্যে সাহেব বড় খিটখিট করে। মুচিরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কর্ম্ম ভাল করিয়া করিতে পারিত না, তাহাতে আবার দুর্জ্জয় লোভ—সকলতাতে মুচিরাম গালি খাইত। সাহেবটাও বড় বদরাগী—অনেক সময়ে মুচিরামকে কাগজপত্র ছুড়িয়া মারিত। কখন খাইতে খাইতে সাহেব রিপোর্ট শুনিতেছে, সে সময়ে মুচিরামকে রুটী-বিস্কুট ছুড়িয়া মারিত। সাহেবের ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়া ছিল। নচেৎ মুচিরামের চাকরী অধিককাল টিকিত না।

সৌভাগ্যক্রমে সে সাহেব বদলী হইয়া গেল, আর এক জন আসিল। ইংলণ্ড হইতে আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য যে সকল রাজপুরুষ প্রেরিত হন, অনেকেই সুবুদ্ধি ও সুপণ্ডিত বটে, কিন্তু এক এক জন নির্ব্বোধ ব্যক্তি উচ্চবেতন পাইবার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকেন। এই সাহেবটি তাঁহারই এক জন।

এই নূতন সাহেবটির নাম Grongerhom—লিখিবার সময় লোকে গঙ্গারহাম—বলিবার সময়ে বলিত গঙ্গারাম সাহেব। গঙ্গারাম সাহেব মোকদ্দমা করিতে গিয়া কেবল ডিসমিশ করিতেন। ইহাতে দুইটি সুবিধা ছিল—এক, এক ছত্র রায় লিখিলেই হইত, দ্বিতীয়, আপীল নাই। অন্যান্য সকল কর্ম্মের ভার সেরেস্তাদার এবং হেড কেরাণীর উপর ছিল। যত দিন সাহেব ঐ জেলায় ছিলেন, এক দিনের জন্য একখানি চিঠি স্বহস্তে মুশাবিদা করেন নাই—হেড কেরাণী সব করিত।

সাহেব প্রথম আসিয়া, মুচিরামের কালো-কোলো নধর সুচিক্কণ শরীরটি দেখিয়া এবং তাহার আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম দেখিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আফিসের মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। সে বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই গেল না, যাইবারও কোন কারণ ছিল না—কেন না, কাজকর্ম্মের তিনি খবর রাখিতেন না। এক দিন আফিসের মীর মুন্সী, মিরজা গোলাম, সফর খাঁ সাহেবের দুনিয়াদারি নামাফিক মনে করিয়া ফৌত করিলেন। সাহেব পরদিনেই মুচিরামকে ডাকিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। মীর মুন্সীর বেতন কুড়ি টাকা—কিন্তু বেতনে কি করে? পদটি রুধিরে পরিপ্লুত। অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ মুচিরাম শর্ম্মা রুধির সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

দোষ কি? অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। দুইটা এক জনে পারে না—দিওজিনিষ হইতে দর্পনারায়ণ পুতিতুণ্ড পর্য্যন্ত কেহ পারিল না। মুচিরাম বিদ্যাচিন্তা করিতে সক্ষম নহেন, কোষ্ঠীতে লেখে নাই—অতএব বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশানুসারে মৃত্যুভয়রহিত হইয়া অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত। যদি সেই হিতোপদেশগুলি অধীত হইবার যোগ্য হয়—যদি সে গ্রন্থ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও পূজার যোগ্য হয়—তবে মুচিরামও প্রাজ্ঞ। আর এ দেশের সকল মুচিই প্রাজ্ঞ।

বিষ্ণুশর্ম্মা ভারতবর্ষের মাকিয়াবেল্লি—চাণক্য ভারতের রোশ-ফূকেল। যাঁহারা এইরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ে বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছেন, দর্পনারায়ণ তাঁহাদিগকে পাইলে বেত্রাঘাত করিতে ইচ্ছুক আছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুচিরাম দুই তিন বৎসর মীর মুনসীগিরি করিল—তার পর কালেক্টরীর পেস্কারী খালি হইল। পেস্কারীতে বেতন পঞ্চাশ টাকা—আর উপার্জ্জনের ত কথাই নাই। মুচিরাম ভাবিল, কপাল ঠুকিয়া একখানা দরখাস্ত করিব।

তখন কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট পৃথক্ পৃথক ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময়ে হোম নামা এক সাহেব কালেক্টর ছিলেন। হোম সাহেবের মেজাজ-মরজি কিছু বেতর। মুচিরামের আর কোন বুদ্ধি ছিল না—কিন্তু সাহেবের মেজাজ বুঝা বুদ্ধিটা ছিল; প্রায় বানরগোষ্ঠীর সে বুদ্ধি থাকে।

দর্পনারায়ণ ভণে, কে বানর? যে মেজাজ বুঝে, না যাহার মেজাজ বুঝিতে হয়? যে কলা খায়, না যে কদলী প্রলোভন দেখায়?

মুচিরাম একখানি ইংরেজি দরখাস্ত লিখাইয়া লইল—মুচিরামের নিজ বিদ্যা দরখাস্ত পর্য্যন্ত কুলায় না। যে দরখাস্ত লিখিল, মুচিরাম তাহাকে বলিয়া দিলেন, "দেখিও, যেন ভাল ইংরেজি না হয়। আর যাহা হোক, দরখাস্তের ভিতর যেন গোটা কুড়ি 'মাই লর্ড' আর 'ইওর লর্ডশিপ' থাকে।" লিপিকার সেই রকম দরখাস্ত লিখিয়া দিল। তখন শ্রীমুচিরাম বেশভূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার চারখানির ঢিলা পায়জামা পরিত্যাগ করিয়া থানের ধুতি শ্রীঅঙ্গে পরিধান করিলেন, চুড়িদার আস্তীন আরাকার চাপকান পরিত্যাগপূর্ব্বক বুকফাঁক বন্ধকওয়ালা ঢিলে আস্তীন লাংক্লথের চাপকান গ্রহণ করিলেন। লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া স্বহস্তে মাথায় বিড়া জড়াইলেন এবং চাঁদনির আমদানী নূতন চকচকে জুতা ত্যাগ করিয়া চটিতে চারুচরণদ্বয় মণ্ডন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গঙ্গারাম সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া,কাঁদো কাঁদো মুখ করিয়া, একখানি সুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ চিঠি, দরখাস্ত ও বিহিত সজ্জাসহিত সেই শ্রীমুচিরামচন্দ্র, যথায় হোমসাহেব এজলাসে বসিয়া ঢুলিয়া জলুস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া দর্শন দিলেন।

উচ্চ টঙ্গে, রেল দেওয়া পিঁজরের ভিতর হোমসাহেব এজলাস করিতেছেন। চারিদিকে অনেক মাথায় পাগড়ি ও বসিয়াছে—লোকে কথা কহিলেই চাপরাশী বাবাজিউরা দাড়ী ঘুরাইয়া গালি দিতেছেন—সাহেব নখ কামড়াইতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে পার্শ্বস্থ কুকুরটিকে কোলে টানিয়া লইতেছেন। এক কৌটা গুড় পড়িলে যেমন সহস্র সহস্র পিপীলিকা তাহা বেষ্টন করে, খালি চাকরীটির মালিক হোমসাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহেব উমেদওয়ারদিগের দরখাস্ত শুনিতেছেন। অনেক বড় বড় ইংরেজিনবীশ আসিয়াছেন, সেকেলে কোঁদো কোঁদো কলার্শিপ হোল্ডার। সাহেব তাহাদিগকে এক এক কথায় বিদায় করিলেন;—"I dare say you are up in Shakespeare and Milton and Bacon and so forth unfortunately we dont want quotations from Shakespeare and Milton and Bacon in the office, So you can go; Baboo." অনেকে শামলা মাথায় দিয়া চেন ঝুলাইয়া পরিপাটী বেশ করিয়া আসিয়াছিলেন; সাহেব দৃষ্টিমাত্র তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। "You are very rich I see, I want a poor man who works, for his bread, you can go," শামলা-চেনের দল, অভিমন্যুসমুখে কুরুসৈন্যের ন্যায় বিমুখ হইতে লাগিল। বাকি রহিল মুচিরাম এবং তাঁহার সমকক্ষ জনকয়—বানর। সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পড়িলেন, হাসিয়া বলিলেন, "Why do you call me my Lord? I am not a Lord."

মুচিরাম যোড়হাতে হিন্দীতে বলিল, "বান্দা কো মালুম থা কি হজুর লাট ঘরানা হৈঁ।"

এখন হোমসাহেবের সঙ্গে একটা লার্ড হোমের দূরসম্বন্ধ ছিল, সেই জন্য তাঁহার মনে বংশমর্য্যাদা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। মুচিরামের উত্তর শুনিয়া আবার হাসিয়া বলিলেন, "হো শাক্তা; লার্ড ঘরানা হো শাক্তা, লার্ড ঘরানা হোনে সে হি লার্ড হোতা নেহি।"

সকলেই বলিল যে, মুচিরাম কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে, মুচিরাম যোড়হাতে প্রত্যুত্তর করিল, "বান্দালোককোওয়াস্তে হজুর লার্ড হৈঁ!"

সাহেব মুচিরামকে আর দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকেই পেস্কারীতে বাহাল করিলেন।

Struggle for existence. Survival of the Fittest মুচির দলই এ পৃথিবীতে চিরজয়ী।

ছেলেদের আনন্দের সীমা থাকিল না। শেষে মুচিরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছু সন্দেশ বরাদ্দ করিয়া দিয়া সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু আর একটি নূতন গোল হইল। শীতকালে খেজুরে সন্দেশ উঠিল—ময়রারা তাহার নাম দিল ডেপুটী মণ্ডা।

বাজারে যাহা হউক, সাহেবমহলে মুচিরামের বড় সুখ্যাতি হইল। বৎসর বৎসর রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরূপ সুযোগ্য ডেপুটি আর নাই। এরূপ সুখ্যাতির কারণ—

প্রথম। মুচিরাম শুড় মূর্খ, কাজে কাজেই সাহেবদিগের প্রিয়।

দ্বিতীয়। মুচিরাম অতি সামান্য ইংরেজি জানিত, যাহারা ভাল ইংরেজি জানিত, তাহাদিগকে খাটো করিবার জন্য সাহেবেরা বলিতেন, মুচিরাম ইংরেজিতে সুশিক্ষিত, অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানী নহে। তাঁহারা বলিতেন, মুচিরাম তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক ছিলেন, সাহেবেরা অপমান করিলেও সম্মান বোধ করিতেন। একবার তিনি কমিশনর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন মেম সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরমমেজাজ ছিলেন, এত্তালা হইবামাত্র বলিলেন,—"নেকাল দেও শালাকো।" বাহির হইতে মুচিরাম শুনিতে পাইয়া সেখান হইতে দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে।"

চতুর্থ। তোষামোদে মুচিরাম অদ্বিতীয়। তাহার পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে।

পঞ্চম। মুচিরাম ডেপুটির হাতে প্রায় হপ্তম পঞ্চমের কাজ ছিল—অন্য কাজ বড় ছিল না। হপ্তম পঞ্চমের মোকদ্দমায় একে সহজেই বড় বিচার-আচারের প্রয়োজন হইত না, তাতে আবার মুচিরাম বিচার আচারের বড় ধার ধারিতেন না—চোখ বুজিয়া ডিক্রী দিতেন—নথির কাগজও বড় পড়িতেন না। সুতরাং নাসকাবারে দেখিয়া সাহেবেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। জনরব যে, মুচিরামের একেবারে হঠাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পদবৃদ্ধি হইবে, কতকগুলা চেঙ্গড়া ছোঁড়া শুনিয়া বলিল, "আরও পদবৃদ্ধি? ছটা পা হবে না কি?"

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। গোল মিটাইবার জন্য সেখানকার কমিশনর এক জন ভারি বিচক্ষণ ডেপুটি কালেক্টর পাইবার প্রার্থনা করিলেন। বোর্ড বলিলেন, বিচক্ষণ ডেপুটি? সে ত মুচিরাম ভিন্ন আর কাহাকে দেখি না—তাহাকেই চট্টগ্রাম পাঠান হোক্। গবর্ণমেণ্ট সেই কথা মঞ্জুর করিয়া মুচিরামকে চাটিগাঁ বদলী করিলেন।

সংবাদ পাইয়া মুচিরাম বলিলেন, এইবার চাকরী ছাড়িতে হইল। তাঁহার শোনা ছিল, চাটিগাঁ গেলেই লোকে জ্বর-প্লীহা হইয়া মরিয়া যায়। আরও শোনা ছিল যে, চাটিগাঁ যাইতে সমুদ্রপার যাইতে হয়—এক দিন এক রাত্রের পাড়ি। সুতরাং চাটিগাঁ যাওয়া কি প্রকারে হইতে পারে? বিশেষ ভদ্রকালী—ভদ্রকালী এখন পূর্ণযৌবনা। সে বলিল, 'আমি কোনমতেই চাটিগাঁ যাইব না, কি তোমায় যাইতে দিব না। তুমি যদি যাও, তবে আমি বিষ খাইব।" এই বলিয়া ভদ্রকালী একটা বড় খোরা লইয়া তেঁতুল গুলিতে বসিলেন। তেঁতুল ভালবাসিতেন—মুচিরাম বলিতেন, "ওতে ভাবি অম্ল হয়, ও বিষ।" তাই ভদ্রকালী তেঁতুল গুলিতে বসিলেন। মুচিরাম হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন, ভদ্রকালী তাহা না শুনিয়া "বিষ খাইব" বলিয়া সেই তেঁতুলগোলায় লবণ ও শর্করা সহযোগপূর্ব্বক আধসের চালের অন্ন মাখিয়া লইলেন। মুচিরাম অশ্রুপূর্ণ-লোচনে শপথ করিলেন যে, তিনি কখন চাটিগাঁ যাইবেন না। ভদ্রকালী কিছুতেই শুনিল না, সমুদয় তেঁতুলমাখা ভাতগুলি খাইয়া বিষপানের কার্য্য সমাধা করিল। মুচিরাম তৎক্ষণাৎ চাকরীতে ইস্তফা পাঠাইয়া দিলেন।

স্থূল কথা, মুচিরামের জমীদারীর আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ডেপুটিগিরির সামান্য বেতন তাঁহার ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরী ছাড়িয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চাকরী ছাড়িয়া দিয়া মুচিরাম ভদ্রকালীকে বলিলেন, "প্রিয়ে।" (তিনি সখের যাত্রার বাছা বাছা সম্বোধন পদগুলি ব্যবহার করিতেন) "প্রিয়ে, বিষয় যেমন আছে, তেমনি একটি বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত বাড়ী করিলে হয় না?"

ভদ্র। দাদা বলে, এখানে বড় বাড়ী করিলে লোকে বল্‌বে, ঘুষের টাকায় বড়মানুষ হয়েছে।

মুচি। তা, এখানেই বা বাড়ী করায় কাজ কি? এখানে বুক পুরে বড়মানুষী করা যাবে না। চল আর কোথাও গিয়া বাস করি।

ভদ্রকালী সম্মত হইলেন, কিন্তু নিজ পিত্রালয় যে গ্রামে, সেই গ্রামে বাস করাই বিধেয় বলিয়া পরামর্শ দিলেন। ফলে ভদ্রকালী আর কোন গ্রামের নাম বড় জানিতেন না।

মুচিরাম বিনীতভাবে ইহাতে কিছু আপত্তি করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, যত বড়মানুষের বাড়ী কলিকাতায়,তিনিও বড়মানুষ, সুতরাং কলিকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য। এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এঙন ভদ্রকালীর এক মাতুল একদা কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়া এককালে কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং বাটী গিয়া গল্প করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার কুলকামিনীগণ সজ্জিতা হইয়া রাজপথ আলোকিত করে। ভদ্রকালীর সেই অবধি কলিকাতাকে ভূতলস্থ স্বর্গ বলিয়া বোধ ছিল। তাঁহার অনেকগুলি অলঙ্কার হইয়াছে, পরিয়া সর্ব্বজননয়নপথবর্ত্তিনী হইতে পারিলে অলঙ্কারের সার্থকতা হয়। ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় বাস করার প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন।

তখন ভজগোবিন্দ ছুটী লইয়া আগে কলিকাতায় বাড়ী কিনিতে আসিল। বাড়ীর দাম শুনিয়া মুচিরামের বাবুগিরির সাধ কিছু কমিয়া আসিল। যাহা হউক, টাকার অভাব ছিল না—অট্টালিকা ক্রীত হইল। যথাকালে মুচিরাম ও ভদ্রকলী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া নূতন গৃহে বিরাজমান হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনস্কাম পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কলিকাতার কুলকামিনী রাজপথ আলোকিত করা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর কারাগারে নিবদ্ধ, যাহারা রাজপথ কলুষিত করিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা ভদ্রকালী রাখেন না, সুতরাং তাঁহার কলিকাতায় আসা বৃথা হইল। বিশেষ দেখিলেন, অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া কলিকাতায় স্ত্রীলোক হাসে। ভদ্রকালীর অলঙ্কারের গর্ব্ব ঘুচিয়া গেল।

মুচিরামের কলিকাতায় আসা বৃথা হইল না। তিনি প্রত্যহ গাড়ী করিয়া বাজার যাইতেন এবং যাহা দেখিতেন, তাহাই কিনিতেন। বাবুটি নূতন আমদানী দেখিয়া বিক্রেতৃগণ পাঁচ টাকার জিনিসে দেড়শত হাঁকিত এবং নিতান্তপক্ষে পঞ্চাশ টাকা না পাইলে ছাড়িত না। হঠাৎ মুচিরামের নাম বাজিয়া গেল যে, বাবুটি মধুচক্রবিশেষ। পাড়ার যত বানর মধু লুঠিতে ছুটিল,—জুয়াচোর, মাতাল, নিষ্কর্ম্মা। ভাল ধুতি, চাদর, জুতা-লাঠিতে অঙ্গ পরিশোভিত করিয়া চুল ফিরাইয়া বাবুকে সম্ভাষণ করিতে আসিল। মুচিরাম তাহাদিগকে কলিকাতার বড় বড় বাবু মনে করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আড্ডা করিল। তামাক পোড়ায়, খবরের কাগজ পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজনা বাজায়, গান করে, পোলাও ধ্বংসায় এবং বাবুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া আনে, টাকাটায় আপনারা বারো আনা মুনাফা রাখে, বলে, দাঁওয়ে সিকি দামে কিনিয়াছি। উভয়পক্ষের সুখের সীমা রহিল না।

যে গলিতে মুচিরাম বাড়ী লইয়াছিলেন, সেই গলিতে এক জন প্রথম শ্রেণীর বাটপাড় বাস করিতেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র দত্ত। রামচন্দ্র বাবু প্রথমশ্রেণীর বাটপাড়, একটু ব্রাণ্ডি বা একখানা কাটলেটের লোভে কাহারও আনুগত্য করিবার লোক নহেন। তাঁহার ত্রিতল গৃহ, প্রস্তরমুকুর-কাষ্ঠ-কাচকার্পেটাদিতে সকুসুম উদ্যানতুল্য রঞ্জিত, তাঁহার দরওয়াজায় অনেকগুলা দ্বারবান্ গালপাট্টা বাঁধিয়া সিদ্ধি ঘোঁটে, আস্তাবলে অনেকগুলি অশ্বের পদধ্বনি শুনা যায়, তিনখানা গাড়ী আছে, সোনাবাঁধা হুকা, হীরাবাঁধা গৃহিণী, হ্যাণ্ডনোট, ইংরেজ খাদক এবং তাড়াবাঁধা "কাগজ" সকলই ছিল। তথাপি তিনি জুয়াচোর, জুয়াচুরিতেই এ সকল হইয়াছিল। তিনি যখন শুনিলেন, টাকার বোঝা লইয়া একটা গ্রাম্য গর্দ্দভ পাড়ায় আসিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, তখন ভাবিলেন যে, গর্দ্দভের পৃষ্ঠ হইতে টাকার বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করিতে হইবে। আহা! অবোধ পশু! এত ভারি বোঝা বহিবে কি প্রকারে? বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করি।

প্রথম প্রয়োজন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। রামচন্দ্র বাবু বড়লোক—মুচিরামের বাড়ী অগ্রে যাইবেন না। ইঙ্গিত পাইয়া এক জন অনুচর মুচিরামের কানে তুলিয়া দিল, রামচন্দ্র বাবু কলিকাতার অতি প্রধান লোক, আর মুচিরামের প্রতিবাসী—মুচিরামের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অতি ব্যস্ত, সুতরাং মুচিরাম গিয়া উপস্থিত।

এইরূপে উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাতায়াত হইতে লাগিল। ঘন ঘন যাতায়াতে ক্রমে সৌহার্দ্দবৃদ্ধি। রামচন্দ্র বাবুর সেই ইচ্ছা। তিনি চতুর, মুচিরাম নির্ব্বোধ, মুচিরাম গ্রাম্য, তিনি নাগরিক। অল্পকালেই মুচিরাম-মৎস্য ফাঁদে পড়িল। রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিল।

রামচন্দ্র তাঁহার মুরুব্বি হইলেন, মুচিরামের নাগরিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহে শিক্ষাগুরু হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তিনি নাগরিক জীবননির্ব্বাহে মুচিরামের শিক্ষাগুরু—কলিকাতারূপ গোচারণভূমে তাঁহার রাখাল। কালীঘাট হইতে চিৎপুর পর্য্যন্ত যখন মুচিরাম-বলদ সুখের গাড়ী টানিয়া যায়, রাম বাবু তখন তাহার গাড়োয়ান, সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া টাটুটি জুড়িয়া রামচন্দ্র পাকা কোচমানের মত মিঠাকড়া চাবুক লাগাইতেন। তাঁহার হস্তে ক্রমে গ্রাম্য বানর সহুরে বানরে পরিণত হইল! কি গতিকের বানর,তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ পড়িলে বুঝা যাইতে পারে। এই সময় তিনি ভজগোবিন্দকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

"তোমার পুত্রের বিবাহ শুনিয়া আহ্লাদ হইল। টাকার তেমন আনুকূল্য করিতে পারিলাম না, মাপ করিও। দুইখানা গাড়ী কিনিয়াছি, একখানা বেরুষ, একখানা ব্রোনবেরি। একটা আরবের জুড়িতে ২২০ টাকা পড়িয়াছে। ছবিতে, আয়নাতে, কারপেটে অনেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার এত খরচ,তাহা জানিলে কখন আসিতাম না। সেখানে সাত সিকায় কাপড় ও মজুরিসমেত আমার একটা চাপকান তৈয়ার হইত, এখানে একটা চাপকানে ৬৫৲ টাকা পড়িয়াছে। একসেট রূপার বাসনে অনেক টাকা লাগিয়াছে। থাল, বাটি, গেলাস, সে বাসনের কথা বলিতেছি না, এ সেট টেবিলের জন্য। বরকন্যাকে আমার হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।"

এই হলো বাঁদ্‌রামী নম্বর এক। তার পর মুচিরাম, কলিকাতার যে কেহ একটু খ্যাতিযুক্ত, তাহারই বাড়ীতে, রামচন্দ্র বাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন নামজাদা বাবু তাঁহার বাটীতে আসিলে জন্ম সার্থক মনে করিতেন। কিসে আসে, সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। এইরূপ আচরণে, রাম বাবুর সাহায্যে,কলিকাতার সকল বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। টাকার মান সর্ব্বত্র, মুচিরামের টাকা আছে; সুতরাং সকলেরই কাছে তাঁহার মান হইল।

তার পর মুচিরাম কলিকাতার ইংরেজমহল আক্রমণ করিলেন। রাম বাবুর পরিচয়ে যত ছোট বড় ইংরেজের বাড়ী যাতায়াত করিলেন। অনেক জায়গাতেই ঝাঁটা-লাথি খাইলেন। কোন কোন স্থানে মিষ্টকথা পাইলেন। অনেক স্থানেই এক জন মাতালো জমীদার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

তার পর ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-আসোসিয়নে ঢুকিলেন, নাম লেখাইয়া বৎসর বৎসর টাকা দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্গে প্রতি অধিবেশনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। রাম বাবু কথিত মহামহিম মহাসভার 'একটি বড় কামান।" তিনি যখনই বড় কামান দাগিতে যাইতেন, এই ছোট মুচি-পিস্তলটি সঙ্গে লইয়া যাইতেন, সুতরাং পিস্তলটি ক্রমে মুখ খুলিয়া পুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামও ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার এক জন বক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বকিতেন মাথামুণ্ড, কিন্তু ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা বাহির হইত, সে আর একপ্রকার। মুচিরাম নিজে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। যাহারা বুঝে, তাহারা পড়িয়া নিন্দা করিত না। সুতরাং মুচিরাম ক্রমে এক জন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন, যেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, মুচিরাম তাহার কোন জায়গায় যাইতেই ছাড়িতেন না। বেলবিডীরে গেলে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং সে বেলবিডীরে যাইত। যাইতে যাইতে সে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট সুপরিচিত হইল। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে এক জন নম্র, নিরহঙ্কারী, নিরীহ লোক বলিয়া জানিলেন। জমীদারী সভার এক জন নায়ক বলিয়া পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের নিকট পরিচয় পাইয়াছিলেন।

সম্প্রতি বাঙ্গাল কৌন্সিলে একটি পদ খালি

হইল। এক জন জমীদারী সভার অধিনায়ককে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাও লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্থির করিলেন। বাহাদুর মনে মনে ভাবিলেন, "মুচিরামের স্থায় এ পদের যোগ্য কে? নিরহঙ্কারী, বিনীত, ইংরেজি কহিতে ভাল পারে না; অতএব তাহা হইতে কার্য্যের কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। অতএব মুচিরামকে বাহাল করিব।"

অচিরাৎ অনারেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙ্গাল কৌন্সিলে আসন গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বড় বাড়াবাড়িতে অনারেবল মুচিরাম রায়ের রুধির শুকাইয়া আসিল। ভজগোবিন্দ ফিকির-ফন্দিতে অল্পদামে অধিক লাভের বিষয়গুলি কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় ক্রীত সম্পত্তির আয় বাড়িয়াছিল, কিন্তু এখন তাহাতেও অনাটন হইয়া আসিল। দুই একখানি তালুক বাঁধা পড়িল রামচন্দ্র বাবুর কাছে। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্কল্প এত দিনে সিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—এই জন্য তিনি আত্মীয়তা করিয়া মুচিরামকে এত বড় বাবু করিয়া তুলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অর্দ্ধেক মূল্যে তালুক-গুলি বাঁধা রাখিলেন, জানেন যে, মুচিরাম কখনও শুধরাইতে পারিবেন না। অর্দ্ধেক মূল্যে বিষয়গুলি তাঁহার হইবে। আরও তালুক বাঁধা পড়ে, এমন গতিক হইয়া আসিল। এই সময়ে ভজগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুনিয়াছিল যে, গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাহার ভগ্নীপতির হাতধরা। এই সুযোগে একটা বড় চাকরী জোটাইয়া লইতে হইবে, এই ভরসায় ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন, মুচিরামের গতিক ভাল নহে। তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন,—বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কখন তালুকে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে। তালুকে যান।"

মুচিরাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, "তাই ত। এমন সোজা কথাটা আমার মনে আসিল না।" মুচিরাম খুসী হইয়া ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল।

চন্দনপুর নামে তালুক—সেইখানে বাবু গেলেন। প্রজাদিগের অবস্থা বড় ভাল। সে বৎসর নিকটবর্ত্তী স্থানসকলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত—কিন্তু সে মহলে কিছু না। কখন মুচিরাম প্রজাদিগের নিকট মাঙ্গনমাথট লয়েন নাই। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক—তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। আজ ভজগোবিন্দের পরামর্শে সশরীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত, বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, কিছু ভিক্ষা দাও।" প্রজারা দয়া করিল, প্রজা সুখে থাকিলে জমীদারকে সকল সময়ে দয়া করিতে প্রস্তুত। জমীদার আসিয়াছে সংবাদ পাইয়া দলে দলে প্রজা ট্যাঁকে টাকা লইয়া মুচিরামদর্শনে আসিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামের চেষ্ট টাকায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে আর এক দিকে তাঁহার আর এক প্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইল।

প্রজারা দলে দলে মুচিরামদর্শনে আসে, কোন দিন পঞ্চাশ, কোন দিন ষাট, কোন দিন আশী, কোন দিন এক শত, এইরূপ; যাহাদের বাড়ী নিকট, তাহারা দর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, যাহাদের বাড়ী দূর, তাহারা দোকান হইতে খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া একটা বাগানের ভিতর রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়। মহালটি একে খুব বড়—মুচিরামের এত বড় জমীদারী আর নাই, তাহাতে গ্রামগুলির মধ্যে বিল, খাল অনেক থাকায়, দুই চারি জন প্রজাকে প্রায় রাঁধিয়া খাইয়া যাইতে হইত। এক দিন অনেক দূর হইতে প্রায় এক শত প্রজা আসিয়াছে। তাহাদের বাড়ী একটা ভারি জলা পার, নিকাশ প্রকাশে তাহাদের বেলা গেল, তাহারা বাড়ী ফিরিতে পারিল না, বাগানে রাঁধাবাড়া করিতে লাগিল। রাত্রি থাকিতে থাকিতে যাত্রা করিবে। তাহারা যখন খাইতে বসিল, সেই সময়ে নিকটস্থ মাঠ পার হইয়া অশ্বযানে একটি সাহেব যাইতেছিলেন।

সাহেবটির নাম মীন্‌ওয়েল্। তিনি ঐ জেলার প্রধান রাজপুরুষ—ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর। সাহেবটি ভাল লোক—ন্যায়বান্—হিতৈষী, এবং পরিশ্রমী। দোষের মধ্যে বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে বৎসর ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; সাহেব দুর্ভিক্ষ তদারকে বাহির হইয়াছিলেন। নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার তাম্বু পড়িয়াছিল। তিনি এখন অশ্বারোহণে তাম্বুতে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটা বাগানের ভিতর কতকগুলা লোক ভোজন করিতেছে।

দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহারা সকলে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসী দরিদ্র লোক, কোন বদান্য ব্যক্তি ইহাদের ভোজন করাইতেছে। বিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য নিকটে এক জন চাষাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

এখন সাহেবটি লোক বড় ভাল হইলেও আত্ম-গরিমাবর্জ্জিত নহেন। তাঁহার মনে মনে শ্লাঘা ছিল যে, তিনি বাঙ্গালা বড় ভাল জানেন। সুতরাং চাষার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

সাহেব চাষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমা-ডিগের গড়ামে ডুবৃভাখ্‌খা কেমন আছে?"

চাষা ত জানে না "ডুবৃভাখ্‌খা কাহাকে বলে। সে ফাঁপরে পড়িল। ডুবৃভাখ্‌খা কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম হইবে, ইহা এক প্রকার স্থির হইল। কিন্তু "কেমন আছে?" ইহার উত্তর কি দিবে? যদি বলে যে, সে ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা হইলে সাহেব হয় ত এক ঘা চাবুক দিবে, যদি বলে সে ভাল আছে, তাহা হইলে হয় ত ডুবৃভাখ্‌খাকে ডাকিয়া আনিতে বলিবে, তাহা হইলে কি করিবে? চাষা ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, "বেমার আছে।"

"বেমার Sick? সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, "Well there may be much sickness without there being any scaricity—the fellow does not understand perhaps, I am afraid these peop'e don't understand there own language—I say ডুবৃভাখ্‌খা কেমন আছে, অধিক আছে কিংবা অল্প আছে?"

এখন চাষা কিছু ভাব পাইল। স্থির করিল যে, এ যখন সাহেব, তখন অবশ্য হাকিম (সে দেশে নীলকর নাই)। হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, ডুবৃভাখ্‌খা অধিক আছে কি অল্প আছে—তখন ডুবৃভাখ্‌খা একটা টেক্সের নাম না হইয়া যায় না। ভাবিল, কই, আমরা ত ডুবৃভাখ্‌খার টেক্স দিই না, কিন্তু যদি বলি যে, আমাদের গ্রামে সে টেক্স নাই, তবে বেটা এখনই টেক্স বসাইয়া যাইবে, অতএব মিছা কথাই ভাল। সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করি-লেন, "টোমাদের গড়ামে ডুবৃভাখ্‌খা আছে?"

চাষা উত্তর করিল, "হুজুর, আমাদের গাঁয়ে ভারি ডুবৃভাখ্‌খা আছে।"

সাহেব ভাবিলেন, "Humph! I thought as much." পরে বাগানে যে সকল লোক খাইতেছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বোজন করিল?" (উদ্দেশ্য 'করাইল'

চাষা। প্রজারা ভোজন কচ্ছে।

সাহেব চটিয়া, "টাহা হামি জানে, they eat, that I see, but who pays? টাকা কাহাড়?"

এখন সে চাষা জানে যে, যত টাকা আসি-তেছে, সকলই জমীদারের সিন্দুকে যাইতেছে, সে নিজেও কিছু দিয়া আসিয়াছিল, অত এব বিনা বিলম্বে উত্তর করিল, "টাকা জমীদারের।"

সাহেব। Ah! there it, they do their duty—জমীদারের নাম কি?

চাষা। মুচিরাম রায়।

সাহেব। কট ডিবস বোজন করিয়াছে?

চাষা। তা ধর্ম্মাবতার, প্রজারা রোজ রোজ আসে, খাওয়া-দাওয়া করে।

সাহেব। এই গেরামের নাম কি?

চাষা। চন্দনপুর।

সাহেব নোটবুক বাহির করিয়া তাহাতে পেন্সিলে লিখিলেন, For Famine Report Babu Muchiram Ray, Zeminder of Chinonpur feeds every day a large number of his ryots."

সাহেব তখন ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া টাপে চলিলেন। চাষা আসিয়া গ্রামে রটাইল, একটা সাহেব টাকায় আনা হিসাবে টেক্স বসাইতে আসিয়াছিল, চাষামহাশয়ের বুদ্ধি-কৌশলে বিমুখ হইয়াছে।

এ দিকে মীনওয়েল সাহেব যথাকালে ফেমিন্ রিপোর্ট লিখিলেন। একটি পারাগ্রাফ শুধু মুচিরাম রায় সম্বন্ধে। তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, মুচিরাম জমীদারদিগের আদর্শস্থল। এই দুঃসময়ে অন্নদান করিয়া সকল প্রজাগুলির প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

রিপোর্ট কমিশনারের হস্ত হইতে কিছু উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া, কমিশনর সাহেব লেখক ভাল—গভর্ণমেণ্টে গেল। গভর্ণমেণ্টের এই বিবেচনা যে, যার প্রজা, সেই যদি দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহাদের আহার যোগায়, তাহা হইলে "দুর্ভিক্ষ প্রশ্নের" উত্তর-মীমাংসা হয়। অতএব মুচিরামের ন্যায় বদান্য জমীদারদিগকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তজ্জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিলেন যে, বাবু মুচিরাম রায় মহাশয়কে—পাঠক একবার হরি হরি বল, রাজাবাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেণ্ট বলিলেন, তথাস্তু। গেজেট হইল, রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর। তোমরা সবাই আর একবার হরি হরি বল।

সম্পূর্ণ

গদ্য-পদ্য বা কবিতা-পুস্তক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

বিজ্ঞাপন

যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা এই কবিতাপুস্তকে সন্নিবেশিত হইল, প্রায় সকলগুলিই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি—"জলে ফুল" ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। বাল্য-রচনা দুটি কবিতা,বাল্যকালেই পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে কিছু অভাব থাকুক, গীতিকাব্যের অভাব নাই। বিদ্যাপতির পূর্ব্ব হইতে আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গালী কবিরা গীতিকাব্যের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন। এমন সময়ে এই কয়খানি সামান্ত গীতিকাব্য পুনর্মুদ্রিত করিয়া, বোধ হয়, জনসাধারণের কেবল বিরক্তিই জন্মাইতেছি। এ মহাসমুদ্রে শিশিরবিন্দুনিষেকের প্রয়োজন ছিল না। আমারও ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই, এত দিন এ সকল পুনর্মুদ্রিত করি নাই।

তবে কেন এখন এ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম? একদা বঙ্গদর্শন আপিসে এক পত্র আসিল,তাহাতে কোন মহাত্মা লিখিতেছেন যে, বঙ্গদর্শনে যে সকল কবিতা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। তিনি সেই সকল পুনর্মুদ্রিত করিতে চাহেন। অন্তে মনে করিবেন যে, রহস্য মন্দ নহে। আমি ভাবিলাম, এই বেলা আপনার পথ দেখা ভাল, নহিলে কোন্ দিন কাহার হাতে মারা পড়িব। সেই জন্য পাঠককে এ যন্ত্রণা দিলাম। বিশেষ যাহা প্রচারিত হইয়াছে, ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহার পুনঃপ্রচারে নূতন পাপ কিছুই নাই। অনেক প্রকার রচনা সাধারণসমীপস্থ করিয়া আমি অনেক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, শত অপরাধে যদি মার্জ্জনা হইয়া থাকে, তবে আর একটি অপরাধেরও মার্জ্জনা হইতে পারে।

কবিতাপুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল,আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সঙ্গত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয়বিশেষের পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য্য। নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা, এক প্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণ স্বরূপ তিনটি গদ্য কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। অনেকে বলিবেন, এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই। আমার উত্তর যে, এই গদ্য যেরূপ কবিত্বশূন্য, আমার পদ্যও তদ্রূপ। অতএব তুলনার কোন ব্যাঘাত হইবে না।

অন্য কবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে দুইটি বাল্যরচনা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, তাহার কোন মার্জ্জনা নাই। ঐ কবিতাদ্বয়ের কোন গুণ নাই। ইহা নীরস, দুরূহ এবং বালক-সুলভ অসার কথায় পরিপূর্ণ। আমি যখন কালেজের ছাত্র, তখন উহা প্রথম প্রচারিত হয়। পড়িয়া উহার দুরূহতা দেখিয়া আমার এক জন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, "ওগুলি হিঁয়ালি।" অধ্যাপক মহাশয় অন্যায় কথা বলেন নাই। ঐ প্রথম সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না—অনেক কাপি আমি স্বয়ং নষ্ট করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার অনেকগুলি বন্ধু,আমার প্রতি স্নেহবশতঃ ঐ বাল্যরচনা দেখিতে কৌতূহলী। তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যর্থ এই দুইটি কবিতা পুনর্মুদ্রিত হইল।

পুষ্প নাটক

যূথিকা। এসো, এসো, প্রাণনাথ এসো, আমার হৃদয়ের ভিতর এসো, আমার হৃদয় ভরিয়া যাউক। কতকাল ধরিয়া তোমার আশায় ঊর্দ্ধ-মুখী হইয়া বসিয়া আছি, তা কি তুমি জান না? আমি যখন কলিকা, তখন ঐ বৃহৎ আগুনে চাকা—ঐ ত্রিভুবনতাপকর মহাপাপ, কোথায় আকাশের পূর্ব্বদিকে পড়িয়া ছিল। তখন এমন বিশ্বপোড়ান মূর্ত্তিও ছিল না, তখন এর তেজে এত জ্বালাও ছিল না—হায়! সে কত কাল হইল। এখন দেখ, এই মহাপাপ ক্রমে আকাশের মাঝখানে উঠিয়া ব্রহ্মাণ্ড জ্বালাইয়া, ক্রমে পশ্চিমে হেলিয়া, এখন বুঝি অনন্তে ডুবিয়া যায়! যাক্! দূর হোক—তা তুমি এতকাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ? তোমায় পেয়ে দেহ শীতল হইল, হৃদয় ভরিয়া গেল—ছি, মাটীতে পড়িও না। আমার বুকে তুমি আছ, তাতে সেই পোড়া তপন আর আমাকে না জ্বালাইয়া তোমাকে কেমন সাজাইতেছে। সেই রৌদ্র-বিম্বে তুমি কেমন রত্নভূষিত হইয়াছ। তোমার রূপে আমিও রূপসী হইয়াছি,—থাক, থাক, হৃদয়-স্নিগ্ধকর!—আমার হৃদয়ে থাক, মাটীতে পড়িও না।

টগর। (জনান্তিকে কৃষ্ণকলির প্রতি) দেখ ভাই কৃষ্ণকলি—মেয়েটার রকম দেখ্।

কৃষ্ণকলি। কোন মেয়েটার?

টগর। ঐ যূঁইটা। এতকাল মুখ বুজে, ঘাড় হেঁট ক'রে, যেন দোকানের মুড়ির মত পড়িয়া ছিল। তার পর আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা, নবাবের বেটা নবাব, বাতাসের ঘোড়ায় চ'ড়ে একেবারে মেয়েটার ঘাড়ের উপর এসে পড়িল। অমনি মেয়েটা হেসে, ফুটে, একেবারে আটখানা! আঃ, তোর ছেলেবয়স! ছেলেমানুষের রকমই এক স্বতন্ত্র!—

কৃষ্ণকলি আ, ছি! ছি!

টগর। তা দিদি! আমরা কি আর ফুটতে জানি নে? তা, সংসারধর্ম্ম করিতে গেলে দিনেও ফুটতে হয়, দুপুরেও ফুটতে হয়, গরমেও ফুটতে হয়, ঠাণ্ডাতেও ফুটতে হয়, না ফুটলে চল্‌বে কেন বহিন্? আমাদেরই কি বয়স নেই? তা ও সব অহঙ্কার ঠেকার আমরা ভালবাসি না।

কৃষ্ণকলি। সেই কথাই ত বলি।

যূঁই। তা এতকাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ! জান না কি যে, তুমি বিনা জীবনধারণ করিতে পারি না?

বৃষ্টিবিন্দু। দুঃখ করিও না, প্রাণাধিকে। আসিব আসিব অনেক কাল ধরিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই। কি জান, আকাশ হইতে পৃথিবীতে আসা, ইহাতে অনেক বিঘ্ন। একা আসা যায় না, দলবল জুটিয়া আসিতে হয়, সকলের সব সময় মেজাজ মরজি সমান থাকে না, কেহ বাষ্প-রূপ ভালবাসেন, আপনাকে বড়লোক মনে করিয়া আকাশের উচ্চস্তরে অদৃশ্য হইয়া থাকিতে ভাল-বাসেন। কেহ বলেন, একটু ঠাণ্ডা পড়ুক, বায়ুর নিম্নস্তর বড় গরম, এখন গেলে শুকাইয়া উঠিব; কেহ বলেন, পৃথিবীতে নামা, ও অধঃপতন, অধঃ-পাতে কেন যাইব? কেহ বলেন, আর মাটীতে গিয়া কাজ নাই, আকাশে কালামুখো মেঘ হয়ে চিরকাল থাকি, সেও ভাল। কেহ বলেন, মাটীতে গিয়া কাজ নাই, আবার সেই চিরকেলে নদীনালা বিলখাল বেয়ে সেই লোণা সমুদ্রটায় পড়িতে হইবে, তার চেয়ে এসো, এই উজ্জ্বল রৌদ্রে গিয়া খেলা করি, সবাই মিলে রামধনু হইয়া সাজি, বাহার দেখিয়া ভূচর খেচর মোহিত হইবে। তা সব যদি মিলিয়া মিশিয়া আকাশে যোটপাট হওয়া গেল, তবু জাতিবর্গের গোলযোগ মিটে না। কেহ বলেন, এখন থাক্, এখন এসো, কালিমাময়ী কালী করালী কাদম্বিনী সাজিয়া, বিদ্যুতের মালা গলায় দিয়া, আমরা এইখানে বসিয়া বাহার দিই। কেহ বলে, এত তাড়াতাড়ি কেন? আমরা জলবর্ষে ভূলোক উদ্ধার করিতে যাইব, অমনি কি চুপি

চুপি যাওয়া হয় ?—এসো, খানিক ডাক-হাঁক করি। কেহ ডাক-হাঁক করে, কেহ বিদ্যুতের খেলা দেখে—মাগী নানা রঙ্গে রঙ্গিণী—কখন এ মেঘের কোলে, কখন ও মেঘের কোলে, কখন আকাশ-প্রান্তে, কখন আকাশমধ্যে, কখনও মিটি মিটি, কখনও চিকি চিকি—

যূঁই। তা তোমাদের যদি বিদ্যুতেই এত মন মজেছে, ত এলে কেন ? সে হলো বড়, আমরা হলেম ক্ষুদ্র।

বৃষ্টিবিন্দু। আ! ছি! ছি! রাগ কেন ? আমি কি সেই রকম ? দেখ, ছেলে-ছোকরা হাল্‌কা যারা, তারা কেহই আসিল না, আমরা জনকতক ভারি লোক, থাকিতে পারিলাম না, নামিয়া আসিলাম। বিশেষ তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন দেখা-শুনা হয় নাই।

পদ্ম। (পুকুর হইতে) উঃ, বেটা কি ভারী রে! আয় না, তোদের মত দুলাখ দশলাখ আয় না—আমার একটা পাতায় বসাইয়া রাখি।

বৃষ্টিবিন্দু। বাছা, আসল কথাটা ভুলে গেলে ? পুকুর পূরায় কে ? হে পঙ্কজে, বৃষ্টি নহিলে জগতে পাঁকও থাকিত না, জলও থাকিত না, তুমি ভাসিতে পাইতে না, হাসিতেও পাইতে না। হে জলজে, তুমি আমাদের ঘরের মেয়ে, তাই আমরা তোমাকে বুকে করিয়া পালন করি,—নহিলে তোমার এ রূপ ত থাকিত না, এ সুবাসও থাকিত না, এ গর্ব্বও থাকিত না। পাপীয়সি! জানিস্ না—তুই তোর পিতৃকুলবৈরি সেই অগ্নিপিণ্ডটার অনুরাগিণী ?

যূঁই। ছি! প্রাণাধিক! ও মাগীটার সঙ্গে কি অত কথা বলিতে আছে ? ওটা সকাল থেকে মুখ খুলিয়া সেই অগ্নিময় নায়কের মুখপানে চাহিয়া থাকে, যে দিকে যায়, সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, এর মধ্যে কত বোল্‌তা, ভোম্‌রা, মৌমাছি আসে, তাতেও লজ্জা নাই। অমন বেহায়া জলেভাসা, ভোম্‌রা-মৌমাছির আশা, কাঁটার বাসার সঙ্গে কথা কহিতে আছে কি ?-

কৃষ্ণকলি। বলি ও যূঁই, ভোম্‌রা মৌমাছির কথাটা ঘরে ঘরে নয় কি ?

যূঁই। আপনাদের ঘরের কথা কও দিদি, আমি ত এই ফুটিলাম। ভোমরা-মৌমাছির জ্বালা ত এখনও কিছু জানি না।

বৃষ্টিবিন্দু। তুমিই বা কেন বাজে লোকের সঙ্গে কথা কও ? যারা আপনারা কলঙ্কিনী, তারা কি তোমার মত অমল-ধবল শোভা, এমন সৌরভ দেখিয়া সহ্য করিতে পারে ?

পদ্ম। ভাল রে ক্ষুদে! ভাল! খুব বক্তৃতা কর্‌চিস্। ঐ দেখ বাতাস আস্‌চে!

যূঁই। সর্ব্বনাশ! কি বলে রে!

বৃষ্টিবিন্দু। তাই ত! আমার আর থাকা হইল না।

যূঁই। থাক না।

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে পারিব না। বাতাস আমাকে ঝরাইয়া দিবে।—আমি উহার বলে পারি না।

যূঁই। আর একটু থাক না।

(বাতাসের প্রবেশ)

বাতাস। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) নাম্!

বৃষ্টিবিন্দু। কেন মহাশয় ?

বাতাস। আমি এই অমল কোমল সুশীতল সুবাসিত ফুল্ল কলিকা লইয়া ক্রীড়া করিব। তুই বেটা অধঃপতিত, নীচগামী, নীচবংশ,—তুই এই সুখের আসনে বসিয়া থাকিবি ? নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। আমি আকাশ থেকে এয়েছি।

বাতাস। তুই বেটা পার্থিবযোনি—নীচগামী, খালে বিলে খানায় ডোবায় থাকিস্, তুই এ আসনে ? নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। যূথিকে, আমি তবে যাই ?

যূঁই। থাক না।

বাতাস। তুই অত ঘাড় নাড়িস্ কেন ?

যূঁই। তুমি সর।

বাতাস। আমি তোমাকে ধরি সুন্দরি।

[যূথিকার সরিয়া আসিয়া পলায়নের চেষ্টা]

বৃষ্টিবিন্দু। এত গোলযোগে আর থাকিতে পরি না।

যূঁই। তবে আমার যা কিছু আছে, তোমাকে দিই, লইয়া লইয়া যাও।

বৃষ্টিবিন্দু। কি আছে ?

যূঁই। একটু সঞ্চিত মধু—আর একটু পরিমল।

বাতাস। পরিমল আমি নিব, সেই লোভেই আমি এসেছি। দে—

(বায়ুকৃত পুষ্পপ্রতি বলপ্রয়োগ)

যূঁই। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) তুমি যাও—দেখিতেছ না ডাকাত ?

বৃষ্টিবিন্দু। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি

প্রকারে ? যে তাড়া দিতেছে, থাকিতেও পারি না—যাই—যাই।

(বৃষ্টিবিন্দুর ভূপতন)

টগর ও কৃষ্ণকলি। এখন, কেমন স্বর্গবাসি আকাশ থেকে নেমে এয়েচ না ? এখন মাটীতে শোষ, নরদমার পথ, খালে বিলে ভাস।

যূঁই। (বাতাসের প্রতি) ছাড়! ছাড়!

বাতাস। কেন ছাড়িব ? দে, পরিমল দে।

যূঁই। হায়! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, সুন্দর, সূর্য্যপ্রতিঘাত, রসময়, জলকণা ? এ হৃদয় স্নেহে ভরিয়া আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা ? একবার রূপ দেখাইয়া স্নিগ্ধ করিয়া কোথায় মিশিলে, কোথায় শুষিলে, প্রাণাধিক ! হায়, আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলাম না, কেন তোমার সঙ্গে মরিলাম না ? কেন, অনাথ অস্নিগ্ধ পুষ্প-দেহ লইয়া এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম—

বাতাস। নে, কান্না রাখ্, পরিমল দে—

যূঁই। ছাড়, নহিলে যে পথে আমার প্রিয় গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব।

বাতাস। যাস্ যাবি, পরিমল দে।—হুহু-ম্।

যূঁই। আমি মরিব।—মরি, তবে চলিলাম।

বাতাস। হু—হুম্।

(ইতি যূথিকার বৃন্তচ্যুতি ও ভূপতন)

বাতাস। হঃ! হায়! হায়!

যবনিকা-পতন।

EPILOGUE,

প্রথম শ্রোতা। নাটককার মহাশয়! এ কি ছাই হইল ?

দ্বিতীয় ঐ। তাই ত, একটা যূঁই ফুল নায়িকা আর এক ফোঁটা জল নায়ক। বড় ত drama ?

তৃতীয় ঐ। হ'তে পারে কোন moral আছে। নীতিকথা মাত্র।

চতুর্থ ঐ। না হে—এক রকম Tragedy,

পঞ্চম ঐ। Tragedy না একটা Farce ?

ষষ্ঠ ঐ। *Farce* না—Satire, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করা হইয়াছে।

সপ্তম ঐ। তাহা নহে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থ-বিষয়ক কাব্য বলিয়া আমার বোধ হয়। "বাসনা" বা "তৃষ্ণা" নাম দিলেই ইহার ঠিক নাম হইত। বোধ হয়, গ্রন্থকার ভতটা ফুটিতে চান না।

অষ্টম ঐ। এ একটা রূপ বটে। আমি অর্থ করিব ?

প্রথম ঐ। আচ্ছা, গ্রন্থকারই বলুন না, কি এটা ?

গ্রন্থকার। ও সব কিছুই নহে। ইহার ইংরেজী Title দিব—

"A true and faithful account of a lamentable Tragedy which occurred in a flower pot on the evening of the 19th July 1885 Sunday, and of which the writer was an eyewitness.

সংযুক্তা *

১। স্বপ্ন

নিশীথে শুইয়া, রজত-পালঙ্কে
পুষ্পগন্ধি শির, রাখি রামা-অঙ্কে,
দেখিয়া স্বপন, শিহরে সশঙ্কে
মহিষীর কোলে শিহরে রায়।
চমকি সুন্দরী নৃপে জাগাইল,
বলে প্রাণনাথ, এ বা কি হইল,
লক্ষ যোধ রণে, যে না চমকিল
মহিষীর কোলে সে ভয় পায়!

উঠিয়ে নৃপতি কহে মৃদুবাণী
যে দেখিনু স্বপ্ন, শিহরে পরাণী
স্বর্গীয়া জননী, চৌহানের রাণী
মত্তহস্তী তারে মারিতে ধায়।
ভয়ে ভীত প্রাণ রাজেন্দ্র-ঘরণী
আমার নিকটে আসিল অমনি,
বলে পুত্র রাখ, মরিল জননী
মত্ত-হস্তি-শুণ্ডে প্রাণ বা যায়॥

* পৃথ্বীরাজের মহিষী—কান্যকুব্জ রাজার কন্যা। টডকৃত রাজস্থানে সংযুক্তার বিবরণ দেখ।

ধরি ভীম গদা নাশি হস্তিশুণ্ডে,
মা নাশিল গদা, বাড়াইয়া শুণ্ডে,
জননীকে ধরি, উঠাইল মুণ্ডে;
পাড়িয়া ভূমিতে বধিল প্রাণ।
কুস্বপন আজি দেখিলাম রাণি,
কি আছে বিপদ্ কপালে না জানি,
মত্তহস্তী আসি বধে রাজেন্দ্রাণী
আমি পুত্র নারি করিতে ত্রাণ॥

৪

শুনিয়াছি না কি তুরস্কের দল
আসিতেছে হেথা লঙ্ঘি হিমাচল,
কি হইবে রণে ভাবি অমঙ্গল,
বুঝি এ সামান্য স্বপন নয়।
জননী-রূপেতে বুঝি বা স্বদেশ,
বুঝি বা তুরস্ক মত্তহস্তি-বেশ
বার বার বুঝি এইবার শেষ,
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয়॥

৫

শুনি পতিবাণী যুড়ি দুই পাণি,
জয় জয় জয়! বলে রাজরাণী,
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ জয়—
জয় জয় জয়! বলিল বামা।
কার সাধ্য তোমা করে পরাভব,
ইন্দ্র-চন্দ্র-যম-বরুণ-বাসব
কোথাকার ছার তুরস্ক পহ্লব
জয় পৃথ্বীরাজ প্রথিতনামা॥

৬

আসে আসুক না পাঠান পামর,
আসে আসুক না আরবী বানর,
আসে আসুক না নর বা অমর,
কার সাধ্য তব শকতি সয়।
পৃথ্বীরাজ-সেনা অনন্ত মণ্ডল,
পৃথ্বীরাজ-ভুজে অবিজিত বল,
অক্ষয় ও শিরে কিরীট-কুণ্ডল,
জয় জয় পৃথ্বীরাজের জয়॥

৭

এত বলি বামা দিল করতালি,
দিল করতালি গৌরবে উছলি,
ভূষণে শিঞ্জিনী নয়নে বিজলী,
দেখিয়া হাসিল ভারতপতি।
সহসা কঙ্কণে লাগিল কঙ্কণ,
আঘাতে ভাঙ্গিয়া খসিল ভূষণ;
নাচিয়া উঠিল দক্ষিণ-নয়ন,
কবি বলে তালি না দিও সতি।

২। রণসজ্জা।

রণসাজে সাজে চৌহানের বল,
অশ্ব-গজ-রথ-পদাতির দল,
পতাকার রবে পবন চঞ্চল,
বাজিল বাজনা—ভীষণ নাদ।
ধূলিতে পূরিল গগনমণ্ডল,
ধূলিতে পূরিল যমুনার জল,
ধূলিতে পূরিল অলক কুন্তল,
যথা কুলনারী গণে প্রমাদ॥

২

দেশ দেশ হ'তে এলো রাজগণ,
থানেশ্বর-পদে বধিতে যবন,
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা অগণন,
হর হর বলে যতেক বীর।
মেবার [১] হ'তে আইল সমর, [২]
আবু হ'তে এলো দুরন্ত প্রমর,
আর্য্য বীরদল ডাকে হর! হর!
উছলে কাঁপিয়া কালিন্দী-নীর॥

গ্রীবা বাঁকাইয়া চলিল তুরঙ্গ,
শুণ্ড আছাড়িয়া চলিল মাতঙ্গ,
বাহু আস্ফালিয়া—শুনিয়া আতঙ্ক—
দলে দলে দলে পদাতি চলে।
বসি বাতায়নে কনৌজ-নন্দিনী
দেখিলা অদূরে চলিছে বাহিনী,
ভারত-ভরসা, ধরমরক্ষিণী—
ভাসিলা সুন্দরী নয়নজলে।

সহসা পশ্চাতে দেখিল স্বামীরে,
মুছিয়া অঞ্চলে নয়নের নীরে,
যুড়ি দুই কর বলে "হেন বীরে
রণসাজে আমি সাজাব আজ।"

১। মেবার।
২। সমরসিংহ।

পরাইল ধনী কবচ-কুণ্ডল,
মুকুতার দাম বক্ষে ঝলমল,
ঝলসিলা রত্নকিরীট-মণ্ডল
বহ্নিতেজে হাসে রাজেন্দ্ররাজ

৫

সাজাইয়া নাথে যোড় করি পাণি,
ভারতের রাণী কহে মৃদুবাণী,
সুখী প্রাণেশ্বর তোমার বাখানি
এ বাহিনী-পতি চলিলা রণে
লক্ষ যোধ প্রভু তব আজ্ঞাকারী,
এ রণসাগরে তুমি হে কাণ্ডারী,
মথিবে সে সিন্ধু নিরত প্রহারি
সেনার তরঙ্গ তরঙ্গ সনে।

৬

আমি অভাগিনী জনমি কামিনী
অবরোধে আজি রহিনু বন্দিনী,
না হ'তে পেলাম তোমার সঙ্গিনী,
অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া রহিনু পাছে।
যবে পশি তুমি সমর-সাগরে
খেদাইবে দূরে ঘোরীর বানরে,
না পাব দেখিতে, দেখিবে ত পরে,
তব বীরপণা! না রব কাছে॥

৭

সাধ প্রাণনাথ সাধ নিজ কাজ,
তুমি পৃথ্বীপতি মহা মহারাজ,
হানি শত্রুশিরে বাসবের বাজ,
ভারতের বীর আইস ফিরে।
নহে যদি শম্ভু হয়েন নির্দ্দয়,
যদি হয় রণে পাঠানের জয়,
না আসিও ফিরি—দেহ যেন রয়,
রণক্ষেত্রে ভাসি শত্রু-রুধিরে॥

৮

কত সুখ প্রভু ভুঞ্জিলে জীবনে!
কি সাধ বা বাকি এ তিন ভুবনে?
নয় গেল প্রাণ ধর্ম্মের কারণে,
চিরদিন নহে জীবন কার।
যুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে যশ,
গৌরবে পূরিত হবে দিক্ দশ,
ঐ কান্ত শরীর এ কান্ত বয়স
স্বর্গে গিয়ে প্রভু পাবে আবার॥

৯

করিলাম পণ শুন হে রাজন্,
নাশিয়া ঘোরীরে জিনি এই রণ,
নাহি যতক্ষণ কর আগমন,
না খাব কিছু না করিব পান।
জয় জয় বীর জয় পৃথ্বীরাজ,
হও পূর্ণ জয় সমবেত আজ
যুগে যুগে প্রভু ঘোষিবে এ কাজ,
হর হর শম্ভো কর কল্যাণ॥

১০

হর হর হর! বম্ বম্ কালী!
বম্ বম্ বলি রাজার দুলালি,
করতালি দিল—দিল করতালি,
রাজ-রাজপতি ফুল্ল হৃদয়
ডাকে বামা জয় জয় পৃথ্বীরাজ—
জয় জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ—
জয় জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজের জয়॥
কর দুর্গে, পৃথ্বীরাজের জয়।

১১

প্রসারিয়া রাজা মহাভুজদ্বয়ে,
কমনীয় বপু ধরিল হৃদয়ে,
পড়ে অশ্রুধারা চারি গণ্ড বয়ে,
চুম্বিল সুবাহু চন্দ্রবদনে।
স্মরি ইষ্টদেবে বাহিরিল বীর,
মহা গজপৃষ্ঠে শোভিল শরীর,
মহিষীর চক্ষে বহে ঘন নীর!
কে জানে এতই জল নয়নে॥

১২

লুটাইয়া পড়ি ধরণীর তলে,
তবু চন্দ্রাননী জয় জয় বলে,
জয় জয় বলে—নয়নের জলে,
জয় জয় কথা না পায় ঠাঁই
কবি বলে মাতা মিছে গাও জয়
কাঁদ যতক্ষণ দেহে প্রাণ রয়,
ও কান্না রহিবে এ ভারতময়,
আজিও আমরা কাঁদি সবাই॥

৩। চিতারোহণ

১

কত দিন-রাত প'ড়ে রহে রাণী,
না খাইল অন্ন, না খাইল পানি,
কি হইল রণে কিছুই না জানি,
মুখে বলে পৃথ্বীরাজের জয়।
হেন কালে দূত আসিল দিল্লীতে—
রোদন উঠিল পল্লীতে পল্লীতে,—
কেহ নারে কারে ফুটিয়া বলিতে,
হায় হায় শব্দ! ফাটে হৃদয়।

২

মহারবে যেন সাগর উছলে,
উঠিল রোদন ভারতমণ্ডলে,
ভারতের রবি গেল অস্তাচলে,
প্রাণ ত গেলই, গেল যে মান
আসিছে যবন সামাল সামাল।
আর হোথা নাই কে ধরিবে চাল?
পৃথ্বীরাজ বীরে হরিয়াছে কাল,
এ ঘোর বিপদে কে করে ত্রাণ

৩

ভূমি-শয্যা ত্যজি উঠে চন্দ্রাননী,
সখীজনে ডাকি বলিল তখনি,
সম্মুখ-সমরে বীর-শিরোমণি
গিয়াছে চলিয়া অনন্ত স্বর্গে।
আমিও যাইব সেই স্বর্গপুরে,
বৈকুণ্ঠেতে গিয়া পূজিব প্রভুরে,
পুরাও রে সাধ; দুঃখ যাক্ দূরে,
সাজা মোর চিতা সজনীবর্গে॥

৪

যে বীর পড়িল সম্মুখ-সমরে,
অনন্ত মহিমা তার চরাচরে,
সে নহে বিজিত, অমরে কিন্নরে,
গাহিছে তাহার অনন্ত জয়।
বল সখি সবে জয় জয় বল,
জয় জয় বলি চড়ি গিয়া চল,
জলন্ত চিতায় প্রচণ্ড অনল,
জয় জয় পৃথ্বীরাজের জয়॥

৫

চন্দনের কাঠ, এলো রাশি রাশি,
কুসুমের হার যোগাইল দাসী,
রতন-ভূষণ কত পরে হাসি
বলে যাব আজি প্রভুর পাশে।
আয় আয় সখি চড়ি চিতানলে,
কি হবে রহিয়ে ভারতমণ্ডলে?
আয় আয় সখি যাইব সকলে
যথা প্রভু মোর বৈকুণ্ঠবাসে॥

৬

আরোহিলা চিতা কামিনীর দল,
চন্দনের কাঠে জলিল অনল,
সুগন্ধে পূরিল গগনমণ্ডল—
মধুর মধুর সংযুক্তা হাসে।
বলে সবে বল পৃথ্বীরাজ জয়,
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ জয়,
করি জয়ধ্বনি সঙ্গে সখীচয়
চলি গেলা সতী বৈকুণ্ঠধামে॥

৭

কবি বলে মাতা কি কাজ করিলে,
সন্তানে ফেলিয়া নিজে পলাইলে,
এ চিতা-অনল কেন বা জ্বালিলে,
ভারতের চিতা পাঠান-ভয়ে।
সেই চিতানল, দেখিল সকলে,
আর না নিবিল ভারতমণ্ডলে,
দহিল ভারত তেমনি অনলে,
শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে!

আকাঙ্ক্ষা

(সুন্দরী)

১

কেন না হইলি তুই, যমুনার জল,
রে প্রাণবল্লভ!
কিবা দিবা কিবা রাতি, কূলেতে থাকত পাতি,
শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদু রব॥
রে প্রাণবল্লভ!

২

কেন না হইলি তুই, যমুনা-তরঙ্গ,
মোর শ্যামধন!
দিবারাত জলে পশি, থাকিতাম রঙ্গে পশি,
করিবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন,
ওহে শ্যামধন!

৩

কেন না হইলি তুই মলয়-পবন,
ওহে ব্রজরাজ!
আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে হরি,
নিশ্বাস যাইত মোর, হৃদয়ের মাঝ।
ওহে ব্রজরাজ!

৪

কেন না হইলি তুই, কানন-কুসুম,
রাধাপ্রেমাধার!
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,
চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার।
মোর প্রাণাধার!

৫

কেন না হইলে তুমি চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষিকেশ!
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী,
বাতায়ন-পথে তুমি লভিতে প্রবেশ।
আমার প্রাণেশ!

৬

কেন না হইলে তুমি চিকণ বসন,
পীতাম্বর হরি!
নীলবাস তেয়াগিয়ে, তোমারে পরি কালিয়ে,
রাখিতাম যত্ন ক'রে হৃদয়-উপরি!
পীতাম্বর হরি!

৭

কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে
সংসারে সুন্দর।
কিরাতের আঁখি যথা, দেখিতে পেতাম তথা,
মনোহর এ সংসারে, রাধামনোহর।
শ্যামল সুন্দর!

(সুন্দর)

১

কেন না হইনু আমি, কপালের দোষে,
যৌবনেতে টল-টল।
লইয়া কমল-কলসী, সে জল-মাঝারে পশি,
হাসিয়া ফুটিতে আসি রাধিকা-কমল—
যমুনার জল॥

২

কেন না হইনু আমি তোমার তরঙ্গ
তপননন্দিনি!
রাধিকা আসিলে জলে, নাচিয়া হিল্লোলছলে,
দোলাতাম দেহ তার নবীন নলিনী—
যমুনাজলহংসিনী॥

৩

কেন না হইনু আমি, তোর অনুরূপী,
মলয়-পবন!
ভ্রমিতাম কুতূহলে, রাধার কুন্তল দলে,
কহিতাম কানে কানে, প্রণয়বচন—
সে আমার প্রাণধন॥

৪

কেন না হইনু হায়! কুসুমের দাম,
কণ্ঠের ভূষণ।
এক নিশা স্বর্গসুখে, থাকিয়া রাধার বুকে,
ত্যজিতাম নিশি গেলে জীবন-যাতন—
যেথে ঐরূপ চন্দন॥

৫

কেন না হইনু আমি, চন্দ্রকর-লেখা,
রাধার বরণ।
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়া রেখে,
ভুলাতাম রাধারূপে, অন্তজনমন—
পর-ভুলান কেমন?

৬

কেন না হইনু আমি, চিকণ বসন,
দেহ-আবরণ।
তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে,
অঞ্চল হইয়ে ভূলে ছুঁতেম চরণ,—
তুমি ও চাঁদবদন॥

৭

কেন না হইনু আমি, যেখানে যা আছে
সংসারে সুন্দর।
কে হতে না অভিলাষে, রাধা যাহা ভালবাসে,
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অন্তর—
প্রেম-সুখ-রত্নাকর ?

অধঃপতন সঙ্গীত

১

বাগানে যাবে রে ভাই ? চল সবে মিলে যাই,
যথা হর্ম্ম্য সুশোভন সরোবর-তীরে।
যথা ফুটে পাতি পাতি, গোলাপ মল্লিকা জাতি,
বিনোদিয়া লতা দোলে মৃদুল সমীরে॥
নারিকেল বৃক্ষরাজি, চাঁদের কিরণে সাজি,
নাচিছে দোলায়ে মাথা ঠমকে ঠমকে।
চন্দ্রকর-লেখা তাহে বিজলী চমকে॥

২

চল যথা কুঞ্জবনে, নাচিবে নাগরীগণে,
রাঙ্গা সাজ পেশোয়াজ, পরশিবে অঙ্গে।
তম্বুরা তবলা চাটি, আবেশে কাঁপিবে মাটী,
সারঙ্গ তরঙ্গ তুলি, সুর দিবে সঙ্গে॥
থিনি থিনি থিনি থিন, ঝিনিক ঝিনিক ঝিন্,
তাধিম তাধিম তেরে গাওনা বাজনা।
চমকে চাহনি চারু, ঝলকে গা না॥

৩

ঘরে আছে পদ্মমুখী, কভু না করিল সুখী,
শুধু ভালবাসা নিয়ে, কি হবে সংসারে,
নাহি জানে নৃত্য-গীত, ইয়ারকিতে নাহি চিত,
একা বসি ভালবাসা ভাল লাগে কারে ?
গৃহধর্ম্মে রাখে মন, হিত ভাবে অনুক্ষণ,
সে বিনা দুঃখের দিনে অন্যগতি নাই।
এ হেন সুখের দিনে, তারে নাহি চাই॥

৪

আছে ধন গৃহপূর্ণ, যৌবন যাইবে তূর্ণ,
যদি না ভুঞ্জিনু সুখ কি কাজ জীবনে ?
ঠুসে মদ্য লও সাথে, যেন না ফুরায় রাতে,
সুখের নিশান গাড় প্রমোদ-ভবনে॥

বাক্স লও বাছা বাছা, দাড়ি দেখে লও চাচা,
চপ সুপ কারি কোর্ম্মা করিবে বিচিত্র।
বাঙ্গালীর দেহ-রত্ন, ইহাতে করিও যত্ন;
সহস্র পাদুকা স্পর্শে হয়েছে পবিত্র।
পেটে খায় পিঠে সয় আমার চরিত্র॥

৫

বন্দে মাতা সুরধনী, কাগজে মহিমা শুনি,
বোতলবাহিনী পুণ্যে একশা-নন্দিনি !
করি ঢক ঢক নাদ, পুরাও ভকত-সাধ,
লোহিতবরণি বামা তারেতে বন্দিনি !
প্রণমামি মহানীরে, ছিপির কিরীট শিরে,
উঠ শিরে ধীরে ধীরে যকৃৎ-জননি !
তোমার কৃপার জন্য, যেই পড়ে সেই ধন্য,
শয্যায় পতিত রাখ, পতিতপাবনি !
বাকস-বাহনে চল ভজন ভজনি॥

৬

কি ছার সংসারে আছি, বিষম অরণ্যে মাছি,
মিছা করি ভন্ ভন্ চাকরি-কাঁঠালে।
মারে জুতা সই মুখে, লম্বা কথা বলি সুখে,
উচ্চ করি ঘুসা তুলি দেখিলে কাঙ্গালে॥
শিখিয়াছি লেখা-পড়া, ঠাণ্ডা দেখে হই কড়া,
কথা কই চড়া চড়া ভিখারী ফকিরে।
দেখ ভাই রোখ কত, বাঙ্গালী-শরীরে॥

৭

পূর পাত্র মদ্য ঢালি, দাও সবে করতালি,
কেন তুমি দাও গালি কি দোষে আমার !
দেশের মঙ্গল চাও ? কিসে তার ত্রুটি পাও ?
লেকচরে কাগজে বলি, কর দেশোদ্ধার ;
ইংরেজের নিন্দা করি, আইনের দোষ ধরি,
সংবাদ-পত্রিকা পড়ি, লিখি কভু তায়।
আর কি করিব বল স্বদেশের দায় ?

৮

করেছি ডিউটির কাজ, বাজা ভাই পাকোয়াজ;
কামিনী গোলাপী সাজ তাসি আজ রঙ্গে।
গেলাস পূরে দে মদ দে, দে দে আরো আরো দে,
দে দে এরে দে ওরে দে ছড়ি দে সারঙ্গে।
কোথায় ফুলের মালা, আইস দে না ? তাল বালা,
"বংশী বাজায় চিকণ কালা !" সুর দাও সঙ্গে।
ইন্দ্র স্বর্গে খায় সুধা, স্বর্গ ছাড়া কি বসুধা ?
কত স্বর্গ বাঙ্গালায় মদের তরঙ্গে।
টলমল বসুন্ধরা ভবানী ভ্রূভঙ্গে॥

যে ভাবে দেহের হিত, না বুঝি তাহার চিত,
আত্মহিত ছাড়ি কেবা পরহিতে চলে ?
না জানি দেশ বা কার ?, দেশে কার উপকার ?
আমার কি লাভ বল, দেশ ভাল হলে ?
আপনার হিত করি, এত শক্তি নাহি ধরি,
দেশ-হিত করিব কি, একা ক্ষুদ্র প্রাণী।
ঢাল মদ ! তামাক দে ! ল্যাণ্ড ব্র্যাণ্ডি পানি ॥

১০

মনুষ্যত্ব ? কাকে বলে ? স্পিচ দিই টৌনহলে,
লোকে আসে দলে দলে শুনে পাই প্রীত।
নাটক নবেল কত, লিখিয়াছি শত শত,
এ কি নয় মনুষ্যত্ব ? নয় দেশ-হিত ?
ইংরাজি বাঙ্গালা কেঁদে, পলিটিক্স লিখি কেঁদে,
পদ্য লিখি নানা ছাঁদে বেচি সস্তা দরে।
অশিষ্টে অথবা শিষ্টে, গালি দিই অষ্টে-পৃষ্টে,
তবু বল দেশ-হিত কিছু নাহি করে ?
নিপাত যাউক দেশ। দেখি ব'সে ঘরে ॥

১১

হা চামেলি ফুলিচম্পা ! মধুর অধর কম্পা !
হাম্বীর কেদার ছায়ানট সুমধুর !
হুক্কা না ফুরন্ত বোলে ! শের যে ফুল না ডোলে,
পিয়ালা ভর দে মুঝে রঙ্গ ভরপুর।
সুপ চপ কটলেট, আন বাবা পেট পেট,
কুক্ বেটা কাষ্টরেট যত পার খাও !
মাথা মুণ্ড পেটে দিয়ে, পড় বাপু জমী নিয়ে,
জনমি বাঙ্গালীকুলে সুখ ক'রে যাও।
পতিতপাবনী সুরে পতিতে তরাও ॥

১২

যাব ভাই অধঃপাতে, কে যাইবে আর সাথে,
কি কাজ বাঙ্গালী নাম রেখে ভূমণ্ডলে ?
লেখা-পড়া ভস্ম ছাই, কে কবে শিখিছে ভাই,
লইয়া বাঙ্গালী দেহ, এই রঙ্গস্থলে ?
হংসপুচ্ছ লয়ে করে, কেরাণীর কাজ করে,
মুন্সেফ চাপরাশি আর ডিপুটী পিয়াদা।
অথবা স্বাধীন হয়ে, ওকালতি পাশ লয়ে,
খোষামুদি জুয়াচুরি শিখিছে জিয়াদা !
সার কথা বলি ভাই, বাঙ্গালীতে কাজ নাই,
কি কাজ সাধিব মোরা এ সংসারে থাকি,
মনোবৃত্তি আছে যাহা, ইন্দ্রিয়-সাগরে তাহা,
বিসর্জন করিয়াছি কিবা আছে বাকি ?
কেন দেহ-ভার বয়ে বয়ে দাও ফাঁকি ?

১৩

ধর তবে গ্লাস আঁটি, জলন্ত বিষের বাটি,
শুন তবলার চাটি বাজে খন খন।
নাচে বিবি নানা ছন্দ, সুন্দর খাম্বিরা গন্ধ,
গম্ভীর জীমূতমন্দ্র হুঙ্কার গর্জন ॥
সেজে এসো সবে ভাই, চল অধঃপাতে যাই,
অধম বাঙ্গালী হতে হবে কোন্ কাজ ?
ধরিতে মনুষ্য-দেহ নাহি করে লাজ ?

১৪

মর্কটের অবতার, রূপ গুণ সব তার,
বাঙ্গালীর অধিকার বাঙ্গালীর ভূষণ !
হা ধরণি কোন্ পাপে, কোন্ বিধাতার শাপে,
হেন পুত্রগণ গর্ভে করিলে ধারণ ?
বঙ্গদেশ ডুবাবারে, মেঘে কিংবা পারাবারে,
ছিল না কি জলরাশি ? কে শোষিল নীরে ?
আপনা ধ্বংসিতে রাগে, কতই শকতি লাগে,
নাহি কি শকতি তত বাঙ্গালী শরীরে ?
কেন আর জ্বলে আলো বঙ্গের মন্দিরে ?

১৫

মরিবে না ? এসো তবে, উন্নতি সাধিয়া সবে,
লভিতাম পৃথিবীতে পিতৃ সমতুল।
ছাড়ি দেহ খেলা-ধুলা, ভাঙ্গ বাস্তভাণ্ডগুলা,
মারি খেদাইয়া দাও নর্ত্তকীর কুল।
মারিয়া লাঠির বাড়ি, বোতল ভাঙহ পাড়ি,
বাগান ভাঙ্গিয়া ফেল পুকুরের জলে।
সুখ নামে দিয়ে ছাই, দুঃখ সার কর ভাই,
কভু না মুছিবে কেহ নয়নের জলে,
যত দিন বাঙ্গালীকে লোকে ছি ছি বলে ॥

সাবিত্রী

তমিস্রা রজনী ব্যাপিয়া ধরণী
দেখি মনে মনে পরমাদ গণি
বনে একাকিনী বসিয়া রমণী
কোলেতে করিয়া স্বামীর দেহ

আঁধার গগন ভুবন আঁধার
অন্ধকার গিরি বিকট আকার
দুর্গম কান্তার ঘোর অন্ধকার
চলে না, ফেরে না, নড়ে না কেহ॥

২

কে শুনেছে হেথা মানবের রব?
কেবল গরজে হিংস্র পশু সব,
কখন খসিছে বৃক্ষের পল্লব,
কখন বসিছে পাখী শাখায়।
ভয়েতে সুন্দরী বনে একেশ্বরী,
কোলে আরো টানে পতি-দেহ ধরি,
পরশে অধর অনুভব করি,
নীরবে কাঁদিয়া চুম্বিছে তায়

৩

হেরে আচম্বিতে এ ঘোর সঙ্কটে
ভয়ঙ্কর ছায়া আকাশের পটে,
ছিল যত তারা তাহার নিকটে
ক্রমে ম্লান হয়ে গেল নিবিয়া
সে ছায়া পশিল কাননে—অমনি
পলায় শ্বাপদ উঠে পদধ্বনি,
বৃক্ষশাখা কত ভাঙ্গিল আপনি
সতী ধরে পতি বুকে আঁটিয়া

৪

সহসা উজলি ঘোর বনস্থলী,
মহাগদা-প্রভা যেন বা বিজলী,
দেখিলা সাবিত্রী যেন রত্নাবলী,
ভাসিল নির্ঝরে আলোক তার
মহা গদা দেখি প্রণমিলা সতী,
জানিল কৃতান্ত পরলোকপতি,
এ ভীষণা ছায়া তাঁহারই মূরতি,
ভাগ্যে যাহা থাকে হবে এবার

৫

গভীর নিঃস্বনে কহিলা শমন,
থর থর করি কাঁপিল গহন,
পর্ব্বতগহ্বরে ধ্বনিল বচন,
চমকিল পশু বিবরমাঝে।
"কেন একাকিনী মানবনন্দিনি,
শব লয়ে কোলে যাপিছ যামিনী,
ছাড়ি দেহ শবে; তুমি ত অধীনী,
মম সঙ্গে তব বাদ কি সাজে?

৬

এ সংসারে কাল বিরাম-বিহীন
নিয়মের রথে ফিরে রাত্রিদিন,
যাহার পরশে সে মম অধীন,
স্থাবর-জঙ্গম জীব সবাই।
সত্যবানে আসি কাল পরশিল,
লভে তারে মম কিঙ্কর আসিল,
সাধ্বী-অঙ্গ ছুঁয়ে লইতে নারিল,
আপনি লইতে এসেছি তাই॥"

৭

সব হলো বৃথা না শুনিল কথা,
না ছাড়ে সাবিত্রী শবের মমতা,
নারে পরশিতে সাধ্বী পতিব্রতা,
অধর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মের পতি।
তখন কৃতান্ত কহে আরবার,
"অনিত্য জানিও এ ছার সংসার,
স্বামী পুত্র বন্ধু নহে কেহ কার,
আমার আলয়ে সবার গতি॥

৮

রত্নচ্ছত্র শিরে রত্নভূষা অঙ্গে,
রত্নাসনে বসি মহিষীর সঙ্গে,
ভাসে মহারাজা সুখের তরঙ্গে,
আঁধারিয়া রাজ্য লই তাহারে।
বীরদর্প ভাঙ্গি লই মহাবীরে,
রূপ নষ্ট করি লই রূপসীরে,
জ্ঞান লোপ করি গরাসি জ্ঞানীরে,
সুখ আছে শুধু মম অগোচরে॥

৯

অনিত্য সংসার পুণ্য কর সার,
কর নিজ কর্ম্ম নিরত যে যার,
দেহান্তে সবার হইবে বিচার,
দিই আমি সবে করম-ফল।
যত দিন সতি তব আয়ু আছে,
করি পুণ্যকর্ম্ম এস স্বামি-পাছে—
অনন্ত যুগান্ত রবে কাছে কাছে,
ভুঞ্জিবে অনন্ত মহা মঙ্গল॥

১০

অনন্ত বসন্তে তথা অনন্ত যৌবন,
অনন্ত প্রণয়ে তথা অনন্ত মিলন,
অনন্ত সৌন্দর্য্যে হয় অনন্ত দর্শন,
অনন্ত বাসনা তৃপ্তি অনন্ত।

দম্পতি আছয়ে নাহি বৈধব্য-ঘটনা,
মিলন আছয়ে নাহি বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা,
প্রণয় আছয়ে নাহি কলহ-গঞ্জনা,
রূপ আছে, নাহি রিপু দুরন্ত ॥

১১

রবি তথা আলো করে, না করে দাহন,
নিশি স্নিগ্ধকরী নহে তিমির কারণ,
মৃদু গন্ধবহ ভিন্ন নাহিক পবন,
কলা নাহি চাঁদে নাই কলঙ্ক।
নাহিক কণ্টক তথা কুসুম-রতনে
নাহিক তরঙ্গ স্বচ্ছ কল্লোলিনীগণে,
নাহিক অশনি তথা সুবর্ণের বনে,
পঙ্কজ সরসে নাহিক পঙ্ক ॥

১২

নাহি তথা মায়াবশে কথায় রোদন,
নাহি তথা ভ্রান্তিবশে বৃথায় মনন,
নাহি তথা রিপুবশে বৃথায় যতন,
নাহি শ্রমলেশ নাহি অলস।
ক্ষুধা তৃষ্ণা তন্দ্রা নিদ্রা শরীরে না রয়,
নারী তথা প্রণয়িনী বিলাসিনী নয়,
দেবের কৃপায় দিব্য জ্ঞানের উদয়,
দিব্য নেত্রে নিরখে দিক্ দশ ॥

১৩

জগতে জগতে দেখে পরমাণুরাশি,
মিলিছে ভাঙিছে পুনঃ ঘুরিতেছে আসি,
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গড়ি ফেলিছে বিনাশি,
অচিন্ত্য অনন্ত কাল-তরঙ্গে।
দেখ লক্ষ কোটি ভানু অনন্ত গগনে,
বেড়ি তাহে কোটি কোটি ফিরে গ্রহগণে,
অনন্ত বর্ত্তন রব শুনিছে শ্রবণে,
মাতিছে চিত্ত সে গীতের সঙ্গে ॥

১৪

দেখ কর্ম্মক্ষেত্রে নর কত দলে দলে,
নিয়মের জালে বাঁধা ঘুরিছে সকলে,
ভ্রমে পিপীলিকা যেন নেমির মণ্ডলে,
নির্দ্দিষ্ট দূরতা লঙ্ঘিতে নারে।
ক্ষণকাল তরে সবে ভবে দেখা দিয়া,
জলে যেন জলবিম্ব যেতেছে মিশিয়া,
পুণ্যবলে পুণ্যধামে মিলিছে আসিয়া,
পুণ্যই সত্য, অসত্য সংসারে ॥

১৫

তাই বলি কন্যে, ছাড়ি দেহ-মায়া,
ত্যজ বৃথা ক্ষোভ, ত্যজ পতি-কায়া,
ধর্ম্ম-আচরণে হও তার জায়া,
গিয়া পুণ্যধাম।
গৃহে যাও ত্যজি কানন বিশাল,
থাক যত দিন না পরশে কাল,
কালের পরশে মিটিবে জঞ্জাল,
সিদ্ধ হবে কাম ॥"

১৬

শুনি যমবাণী যোড় করি পাণি,
ছাড়ি দিয়া শবে তুলি মুখখানি,
ডাকিছে, সাবিত্রী—"কোথায় না জানি,
কোথা ওহে কাল।
দেখা দিয়ে রাখ এ দাসীর প্রাণ,
কোথা গেলে পাব কালের সন্ধান,
পরশিয়ে কর এ সঙ্কটে ত্রাণ,
মিটাও জঞ্জাল ॥

১৭

স্বামিপদ যদি সেবে থাকি আমি,
কায়-মনে যদি পূজে থাকি স্বামী,
যদি থাকে বিশ্বে কেহ অন্তর্যামী,
রাখ মোর কথা।
সতীত্বে যদ্যপি থাকে পুণ্যফল,
সতীত্বে যদ্যপি থাকে কোন বল,
পরশি আমারে দিয়ে পদে স্থল,
জুড়াও এ ব্যথা।"

১৮

নিয়মের রথ ঘোষিল ভীষণ,
আসি প্রবেশিল সে ভীমকানন,
পরশিল কাল সতীত্ব-রতন,
সাবিত্রী সুন্দরী!
মহা গদা তবে চমকে তিমিরে,
শব-পদরেণু তুলি লয়ে শিরে,
ত্যজে প্রাণ সতী অতি ধীরে ধীরে,
পতি কোলে করি ॥
বরষিল পুষ্প অমরের দলে,
সুগন্ধি পবন বহিল ভূতলে,
তুলিল কৃতান্ত শরীর-যুগলে
বিচিত্র বিমানে।

জন্মিল তথা দিব্য তরুবর,
সুগন্ধি কুসুমে শোভে নিরন্তর,
বেড়িল তাহাতে লতা মনোহর,
সে বিজন স্থানে

আদর

মরুভূমি-মাঝে যেন একই কুসুম,
পূর্ণিত সুবাসে।
বর্ষার রাত্রে যেন একই নক্ষত্র,
আঁধার আকাশে॥
নিদাঘ-সন্তাপে যেন একই সরসী
বিশাল প্রান্তরে।
রতন-শোভিত যেন একই তরণী
অনন্ত সাগরে।
তেমনি আমার তুমি, প্রিয়ে সংসার-ভিতরে॥

২

চিরদরিদ্রের যেন একই রতন,
অমূল্য, অতুল।
চিরবিরহীর যেন দিনেক মিলন
বিধি অনুকূল॥
চিরবিদেশীর যেন একই বান্ধব,
স্বদেশ হইতে।
চিরবিধাতার যেন একই স্বপন,
পতির পীরিতে।
তেমনি আমার তুমি, প্রাণাধিকে, এ মহীতে॥

৩

সুশীতল ছায়া তুমি, নিদাঘ-সন্তাপে,
রম্য বৃক্ষতলে।
শীতের আগুন তুমি মোর, ছত্র
বরষার জলে॥
বসন্তের ফুল তুমি, তিরপিত আঁখি,
রূপের প্রকাশে।
শরতের চাঁদ তুমি, চাঁদবদনি লো,
আমার আকাশে।
কৌমুদী মধুর হাসি, দুখের তিমির নাশে॥

৪

অঙ্গের চন্দন তুমি, পাখার ব্যজন,
কুসুমের বাস।
নয়নের তারা তুমি, শ্রবণেতে শ্রুতি,
দেহের নিশ্বাস॥
মনের আনন্দ তুমি, নিদ্রার স্বপন,
জাগ্রতে বাসনা।
সংসারে সহায় তুমি, সংসার-বন্ধন,
বিপদে সান্ত্বনা।
তোমারি লাগিয়া সই, ঘোর সংসার-যাতনা॥

বায়ু

১

জন্ম মম সূর্য্য-তেজে, আকাশমণ্ডলে।
যথা ডাকে মেঘরাশি,
হাসিয়া বিকট হাসি,
বিজলী উজলে॥
কেবা মম সম বলে,
হুহুঙ্কার করি যবে, নামি রণস্থলে—
কাননে ফেলি উপাড়ি,
গুঁড়াইয়া ফেলি বাড়ী,
হাসিয়া ভাঙিয়া পাড়ি,
অটল অচলে।
হাহাকার শব্দ তুলি এ সুখ অবনীতলে॥

২

পর্ব্বত-শিখরে নাচি, বিষম তরাসে,
মাতিয়া মেঘের সনে,
পিঠে করি বহি ঘনে,
সে ঘন বরষে।
হাসে দামিনী সে রসে।
মহাশব্দে ক্রীড়া করি, সাগর-উরসে॥
মথিয়া অনন্ত জলে,
সফেন তরঙ্গদলে,
তাড়ি ডুবে নভস্তলে,
ব্যাপি দিগ্দশে।
শীকরে আঁধারি জগৎ ভাসাই দেশ অনায়াসে॥

৩

বসন্তে নবীন লতা, ফুল দোলে তায়।
যেন বায়ু সে বা নহি,
অতি মৃদু মৃদু বহি,
প্রবেশি তথায়।

হেসে মরি যে লজ্জায়—
পুষ্প চুরি করি, মাখি নিজ গায়।
সরোবরে স্নান করি,
যাই যথায় সুন্দরী,
বসে বাতায়নোপরি,
গ্রীষ্মের জ্বালায়।
তাহার অলকা ধরি,
মুখ চুম্বি ঘর্ম হরি,
অঞ্চল চঞ্চল করি,
স্নিগ্ধ করি কায়।
আমার সমান কেবা যুবতী-মন ভুলায়?

৪

বেণুখণ্ডমধ্যে থাকি, বাজাই বাঁশরী।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে যাই আসি,
আমিই মোহন বাঁশী,
সুরের লহরী।
আর কার গুণে হরি,
ভুলাইত বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনেশ্বরী?
চল চল চল চল,
চঞ্চল যমুনা-জল,
নিশীথ কূলে উজল,
কানন-মঞ্জরী,
তার মাঝে বাজিতাম বংশীনাদরূপ ধরি।

৫

জীবকণ্ঠে যাই আসি আমি কণ্ঠস্বর।
আমি বাক্য, ভাষা আমি,
সাহিত্য-বিজ্ঞান-স্বামী,
মহীর ভিতর॥
সিংহের কণ্ঠেতে আমিই হুঙ্কার,
ঋষির কণ্ঠেতে আমিই ওঙ্কার,
গায়ক-কণ্ঠেতে আমিই ঝঙ্কার,
বিশ্ব-মনোহর।
আমিই রাগিণী আমিই ছয় রাগ,
কামিনীর মুখে আমিই সোহাগ,
বালকের বাণী অমৃতের ভাগ
মম রূপান্তর॥
গুণ গুণ রবে ভ্রমরে ভ্রমর,
কোকিল কুহরে বৃক্ষের উপর,
কলহংস নাদে সরসী-ভিতর,
আমারি কিঙ্কর।
আমি হাসি আমি কান্না, স্বরূপে শাসি নর॥

৬

কে বাঁচিত এ সংসারে আমায় বিহনে?
আমি না থাকিলে ভুবনে?
আমিই জীবের প্রাণ,
দেহে করি অধিষ্ঠান,
নিশ্বাস বহনে।
উড়াই খগে গগনে।
দেশে দেশে লয়ে যাই, বহি যত জনে।
আনিয়া সাগর-নীরে
ঢালে তারা গিরিশিরে
সিক্ত করি পৃথিবীরে,
বেড়ায় গগনে।
মম সম দোষে গুণে দেখেছ কি কোন জনে?

৭

মহাবীর দেব অগ্নি জ্বালি সে অনলে।
আমিই জ্বালাই যারে,
আমিই নিবাই তারে,
আপনার বলে॥
মহাবলে বলী আমি, মন্থন করি সাগর।
রসে সুরসিক আমি, কুসুমকুলনাগর॥
শিহরে পরশে মম কুলের কামিনী।
মজাইনু বাঁশী হয়ে গোপের গোপিনী॥
বাক্যরূপে জ্ঞান আমি স্বরূপে গীত।
আমারি কৃপায় ব্যক্ত ভক্তি দম্ভ প্রীত॥
প্রাণবায়ুরূপে আমি রক্ষা করি জীবগণ।
হহ হহ! মম সম গুণবান্ আছে কোন্ জন?

আকবর শাহের খোস্‌রোজ

১

রাজপুরীমাঝে কি সুন্দর আজি
বসেছে রাজার রসের ঠাট।
রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে
লেগেছে রমণী-রূপের হাট॥
বিশালা সে পুরী নবমীর চাঁদ
সাথে সাথে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে
খরিদার ডাকে হাসিয়া ছলে॥
ফুলের তোরণ ফুল-আবরণ
ফুলের স্তবকে ফুলের মালা।

ফুলের দোকান ফুলের নিশান
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা ॥
লহরে লহরে ছুটিছে গোলাপ
উঠিছে ফুয়ারা জলিছে জল ;
তাধিনি তাধিনি নাচিতেছে নটী
গায়িছে মধুর গায়িকা-দল ॥
রাজপুরী-মাঝে লেগেছে বাজার
বড় গুল্‌জার সরস ঠাট।
রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে
লেগেছে রমণী-রূপের হাট ॥
কত বা সুন্দরী রাজার দুলালী
ওমরাহ-জায়া, আমীর-জাদী।
নয়নেতে আলা অধরেতে হাসি
অঙ্গেতে ভূষণ মধুরনাদী ॥
হীরা মতি চুণি, বসন-ভূষণ
কেহ বা বেচিছে কিনে বা কেউ।
কেহ বেচে কথা নয়ন ঠারিয়ে
কেহ কিনে হাসি রসের ঢেউ ॥
কেহ বলে সখি এ রতন বেচি
হেন মহাজন এখানে কই ?
সুপুরুষ পেলে আপনা বেচিয়ে
বিনা মূল্যে কেনা হইয়া রই ॥
কেহ বলে সখি পুরুষ দরিদ্র
কি দিয়ে কিনিবে রমণী-মণি।
চারি কড়া দিয়ে পুরুষ কিনিয়ে
গৃহেতে বাঁধিয়া রাখ লো ধনি ॥
পিঞ্জরেতে পুরি খেতে দিও ছোলা
সোহাগ-শিকলি বাঁধিও পায়।
অবোধ বিহঙ্গ পড়িবে আটক
তালি দিয়ে ধনি নাচায়ো তায় ॥

২

এক চন্দ্রাননী মরাল-গামিনী
এ রসের হাটে ভ্রমিছে একা।
কিছু নাহি বেচে কিছু নাহি কিনে
কাহার (ও) সহিত না করে দেখা ॥
প্রভাত-নক্ষত্র জিনিয়া রূপসী
দিশাহারা যেন বাজারে ফিরে।
কাণ্ডারী বিহনে তরণী যেন বা
ভাসিয়া বেড়ায় সাগর-নীরে ॥
রাজার দুলালী রাজপুতবালা
চিতোরসম্ভবা কমলকলি।
পতির আদেশে আসিয়াছে হেথা
সুখের বাজার দেখিব বলি ॥
দেখে শুনে বামা সুখী না হইল
বলে ছি ছি এ কি লেগেছে ঠাট।
কুলনারীগণে বিকাইতে লাজ
বসিয়াছে কেঁদে রসের হাট ॥
ফিরে যাই ঘরে কি করিব একা
এ রঙ্গ-সাগরে সাঁতার দিয়ে ?
এত বলি সতী ধীরি ধীরি ধীরি
নির্গমের দ্বারে গেল চলিয়ে ॥
নির্গমের পথ অতি সে কুটিল
পেঁচে পেঁচে ফিরে, না পায় দিশে।
হায় কি করিনু বলিয়া কাঁদিল
এখন বাহির হইব কিসে ?
না জানি বাদশা কি কল করিল
ধরিতে পিঞ্জরে কুলের নারী।
না পায় ফিরিতে নারে বাহিরেতে
নয়নকমলে বহিল বারি ॥

৩

সহসা দেখিল, সম্মুখে সুন্দরী
বিশাল উরস পুরুষ বীর।
রতনের মালা দুলিতেছে গলে
মাথায় রতন জলিছে স্থির ॥
যোড় করি কর, তায় বিনোদিনী
বলে মহাশয় কর গো ত্রাণ।
না পাই যে পথ পড়েছি বিপদে
দেখাইয়া পথ রাখ হে প্রাণ ॥
বলে সে পুরুষ অমিয় বচনে
আহা মরি হেন না দেখি রূপ।
এসো এসো ধনি আমার সঙ্গেতে
আমি আক্‌বর—ভারত-ভূপ ॥
সহস্র রমণী রাজার দুলালী
মম আজ্ঞাকারী চরণ সেবে।
তোমাসমা রূপে নহে কোন জন
তব আজ্ঞাকারী আমি হে এবে ॥
চল চল ধনি আমার মন্দিরে
আজি খোসরোজ সুখের দিন।
এ ভারত-ভূমে কি আছে কামনা
বলিও আমারে শোধিব ঋণ ॥
এত বলি তবে রাজরাজপতি
বলে মোহিনীরে ধরিল করে।

যূথপতি বল সে ভুজবিটপে
টুটিল কঙ্কণ তাহার তরে ॥
শুকায় বামার বদন-নলিনী
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি হে দুর্গে।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি বাঁচাও জননি !
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি হে দুর্গে ॥
ডাকে কালী কালী ভৈরবী করালী
কৌষিকী কপালী কর মা ত্রাণ।
অপর্ণা অম্বিকে চামুণ্ডে চণ্ডিকে
বিপদে বালিকে হারায় প্রাণ ॥
মানুষের সাধ্য নহে গো জননি
এ ঘোর বিপদে রক্ষিতে লাজ।
সমররঙ্গিণি অসুরঘাতিনি
এ অসুরে নাশি বাঁচাও আজ ॥

আজি-নারী হাতে হারাবে জীবন
ঘুচাইব যশ মারিয়ে ছুরি ॥
জয়মল বীরে ছলেতে বধিলে
ছলেতে লুঠিলে চারু চিতোর।
নারী-পদাঘাতে আজি ঘুচাইব
তব বীরপণা ধরম-চোর !
এত বলি বামা হাত ছাড়াইল,
বলেতে ধরিল রাজার অসি।
কাড়িয়া লইয়া অসি ঘুরাইয়া
মারিতে তুলিল নবরূপসী ॥
ধন্য ধন্য বলি রাজা বাখানিল
এমন কখন দেখি নে নারী।
মানিতেছি ঘাট ধন্য সতী তুমি
রাখ তরবারি মানিনু হারি ॥

৪

বহুল পুণ্যেতে অনন্ত শূন্যেতে
দেখিল রমণী, জ্বলিছে আলো।
হাসিছে রূপসী নবীনা ষোড়শী
মৃগেন্দ্র-বাহনে যুবতী কালো ॥
নরমুণ্ডমালা দুলিছে উরসে
বিজলী ঝলসে লোচন তিনে।
দেখা দিয়ে মাতা দিতেছে অভয়
দেবতা সহায় সহায়হীনে ॥
আকাশের পটে নগেন্দ্র-নন্দিনী
দেখিয়া যুবতী প্রফুল্ল মুখ।
হৃদি-সরোবর পুলকে উছলে
সাহসে ভরিল নারীর বুক ॥
তুলিয়া মস্তক গ্রীবা হেলাইল
দাঁড়াইল ধনী ভীষণ রাগে।
নয়নে অনল অধরেতে ঘৃণা
বলিতে লাগিল নৃপের আগে ॥
ছিছি ছিছি ছিছি তুমি হে সম্রাট্
এই কি তোমার রাজধরম।
কুলবধূ ছলে গৃহেতে আনিয়া
বলে ধর তারে নাহি সরম ॥
বহু রাজ্য তুমি বলেতে লুঠিলে
বহু বীর নাশি বলাও বীর।
বীরপণা আজি দেখাতে এসেছ
রমণী-চক্ষে বহাতে নীর ?
পর-বাহুবলে পররাজ্য হর
পরনারী হর করিয়ে চুরি।

৫

হাসিয়া রূপসী নামাইল অসি,
বলে মহারাজ এ বড় রস।
রমণীর রণে হারি মানি তুমি
পৃথিবীপতির বাড়িল যশ ॥
দুলায়ে কুন্তল অধরে অঞ্চল
হাসে খল খল ঈষৎ হেলে।
বলে মহাবীর, এই বলে তুমি
রমণীরে বধ করিতে এলে ?
পৃথিবীতে যারে তুমি দাও প্রাণ
সেই প্রাণে বাঁচে বলে হে সবে।
আজি পৃথ্বীনাথ আমার চরণে
প্রাণভিক্ষা লও বাঁচিবে তবে ॥
যোড়ো হাত দুটো, দাঁতে ক'রে কুটো
করহ শপথ ভারত-প্রভু।
শপথ করহ হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু ॥
তুমি না করিবে রাজ্যেতে না দিবে
হইতে কখন এ হেন দোষ।
হিন্দু-ললনারে যে দিবে লাঞ্ছনা
তাহার উপরে করিবে রোষ ॥
শপথ করিল পরশিয়ে অসি
নারী-আজ্ঞামত ভারত-প্রভু।
আমার রাজ্যেতে হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু ॥
বলে শুন ধনি হইয়াছি প্রীত
দেখিয়া তোমার সাহস বল।

যাহা ইচ্ছা তব   মাগি লও সতি
পুরাও বাসনা ছাড়িয়া ছল ॥
এই তরবারি   দিনু হে তোমারে
হীরকখচিত ইহার কোষ ॥
বীরবালা তুমি   তোমার সে যোগ্য
না রাখিও মনে আমার দোষ ।
আজি হতে তোমা   ভগিনী বলিনু
ভাই তব আমি ভাবিও মনে ।
যা থাকে বাসনা   মাগি লও বর,
যা চাইবে তাই দিব এখানে ॥
তুষ্ট হয়ে সতী   বলে ভাই তুমি,
সম্প্রীত হইনু তোমার ভাবে ।
ভিক্ষা যদি দিবা   দেখাইয়া দাও
নির্গমের পথ যাইব বাসে ॥
দেখাইল পথ,   আপনি রাজন
বাহিরিল সতী, সে পুরী হতে ।
সবে বলে জয়   হিন্দুকন্যা জয়
হিন্দুমাত থাক ধর্ম্মের পথে ॥

৬

রাজপুরীমাঝে   কি সুন্দর আজি
বসেছে বাজার রসের ঠাট ।
রমণীতে কিনে   রমণীতে বেচে
লেগেছে রমণী রূপের হাট ॥
ফুলের তোরণ   ফুল আবরণ
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা ।
ফুলের দোকান   ফুলের নিশান
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা ॥
নবমীর চাঁদ   বরষে চন্দ্রিকা
লাখে লাখে দীপ উজলি জলে ।
দোকানে দোকানে   কুলবালাগণে
ঝলকে কটাক্ষ হাসিয়া ছলে ॥
এ হতে সুন্দর,   রমণী ধরম,
আর্য্যনারী ধর্ম্ম সতীত্বব্রত ।
জয় আর্য্য নামে   আজও আর্য্যধামে
আর্য্যধর্ম্ম রাখে রমণী যত ॥
জয় আর্য্য কন্যা,   এ ভুবনে ধন্যা,
ভারতের আলো, ঘোর আঁধারে ।
হায় কি কারণে,   আর্য্যপুত্রগণে
আর্য্যের ধরম রাখিতে নারে ॥

মন এবং সুখ

১

এই মধুমাসে,   মধুর বাতাসে,
শোন লো মধুর বাঁশী ।
এই মধুবনে,   শ্রীমধুসূদনে,
দেখ লো সকলে আসি ॥
মধুর সে গায়,   মধুর বাজায়,
মধুর মধুর তানে ।
মধুর আদরে,   মধুর অধরে,
মধুর মধুর হাসে ॥
মধুর শ্যামল   বরন কমল,
মধুর চাহনি তার
কনক-নূপুর,   মধুকর যেন,
মধুর বাজিছে পায় ॥
মধুর-ইঙ্গিতে,   আমার সঙ্কেতে,
কহিল মধুর-বাণী ।
সে অবধি চিতে,   মাধুরী হেরিতে
ধৈরয নাহিক মানি ॥
এ সুখ-রঙ্গেতে,   পর লো অঙ্গেতে,
মধুর কিরণ বাস ।
তুলি মধুফুল,   পর কাণে দুল,
পুরাও মনের আশ ।
গাঁথি মধুমালা   পর গোপবালা,
হাস লো মধুর হাসি ।
চল যথা বাজে,   যমুনার কূলে,
শ্যামের মোহন বাঁশী

২

চল যথা বাজে,   যমুনার কূলে,
ধীরে ধীরে ধীরে বাঁশী ।
ধীরে ধীরে যথা,   উঠিছে চাঁদনি,
স্থল-জল পরকাশি ॥
ধীরে ধীরে যাই,   চল ধীরে যাই,
ধীরে ধীরে ফেল পদ ।
ধীরে ধীরে শুন,   নাচিছে যমুনা,
কলকল গদগদ ॥
ধীরে ধীরে জলে,   রাজহংস চলে,
ধীরে ধীরে ভাসে ফুল ।
ধীরে ধীরে বায়ু,   বহিছে কাননে,
দোলায়ে আমার দুল ॥
ধীরে যাবি তথা,   ধীরে কবি কথা,
রাখিবি যৌহার মান ।

ধীরে ধীরে তায়, বাঁশীটি কাড়িবি,
ধীরেতে পূরিবি তান ॥
ধীরে শ্যাম নাম, বাঁশীতে বলিবি,
শুনিব কেমন বাজে।
ধীরে ধীরে চূড়া, কাড়িয়া পরিবি,
দেখিব কেমন সাজে ॥
ধীরে বনমালা, গলাতে দোলাবি,
দেখি কেমন দোলে।
ধীরে ধীরে তায়, মন করি চুরি,
লইয়া আসিবে চ'লে ॥

৩

ভজ মোর মন, মধুরে মধুরে,
জীবন করহ সার।
ধীরে ধীরে ধীরে, মরণ সুপথে,
নিজ গতি রেখ তার ॥
এ সংসার ব্রজ কৃষ্ণ তাহে সুখ,
মন তুমি ব্রজনারী।
নিতি নিতি তার, বাঁশীরব শুনি,
হতে চাও অভিসারী ॥
যাও যাবে মন, কিন্তু দেখ যেন,
একাকী যেও না রঙ্গে।
মাধুর্য্য ধৈরয, সহচরী দুই,
রেখ আপনার সঙ্গে ॥
ধীরে ধীরে ধীরে, কাম নদীতীরে,
ধরম-কদম্ব-তলে,
মধুর সুন্দর, সুখ নটবর,
ভজ মন কুতূহলে

জলে ফুল

১

কে ভাসাল জলে তোরে কানন-সুন্দরি
বসিয়া পল্লবাসনে, ফুটেছিলি কোন্ বনে,
নাচিতে পবন সনে, কোন্ বৃক্ষোপরে ?
কে ছিঁড়িল শাখা হ'তে শাখার মঞ্জরী ?

২

কে আনিল তোরে ফুল, তরঙ্গিণী তীরে,
কাহার কুলের বালা, আনিয়া ফুলের ডালা,
কুলের আঙুলে তুলে ফুল দিল নীরে ?
কূল হ'তে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে।

৩

ভাসিছ সলিলে যেন, আকাশের তারা।
কিংবা কাদম্বিনী-গায়, যেন বিহঙ্গিনী প্রায়,
কিংবা যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারা;
কোথায় চলেছে ধরি, তরঙ্গিণীধারা ?

একাকিনী ভাসি যাও, কোথায় অবলে!
তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকট হাসি,
তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কুতূহলে ?
কে ভাসাল তোরে ফুল কালনদী-জলে ?

কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে ?
কাল-স্রোতে তোর(ই) মত, ভাসি আমি অবিরত,
কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে ?
ফেলিছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে!

৬

শাখার মঞ্জরী আমি তোরই মত ফুল।
বোঁটা ছিঁড়ে শাখা ছেড়ে, ঘুরি আমি স্রোতে পড়ে,
আশার আবর্ত্ত বেড়ে, নাহি পায় কূল।
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল।

৭

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে।
কেহ না ধরিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে,
অনন্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে।
চল যাই দুই জনে অনন্ত উদ্দেশে

ভাই ভাই

(সমবেত বাঙ্গালীদিগের সভা দেখিয়া)

১

এক বঙ্গভূমে জনম সবার,
এক বিদ্যালয়ে জ্ঞানের সঞ্চার,
এক দুঃখে সবে করি হাহাকার,
ভাই ভাই সবে, কাঁদ রে ভাই।
এক শোকে শীর্ণ সবার শরীর,
এক শোকে বয় নয়নের নীর,
এক অপমানে সবে নতশির,
অধম বাঙ্গালী মোরা সবাই।

নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব,
নাহি আশা কিছু নাহিক বৈভব,
বাঙ্গালীর নামে করে ছি ছি রব,
কোমল স্বভাব, কোমল দেহ।
কোমল করেতে ধর কমলিনী,
কোমল শয্যাতে, কোমল শিঞ্জিনী,
কোমল শরীর, কোমল যামিনী,
কোমল পিরীতি, কোমল স্নেহ॥

শিখিয়াছ শুধু উচ্চ চীৎকার!
"ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!" সার,
দেহি দেহি দেহি বল বার বার,
না পেলে গালি দাও মিছামিছি।
দানের অযোগ্য চাও তবু দান,
মানের অযোগ্য চাও তবু মান,
বাঁচিতে অযোগ্য, রাখ তবু প্রাণ,
ছি ছি ছি ছি! ছি ছি ছি ছি ছি ছি!

কার উপকার করেছ সংসারে?
কোন্ ইতিহাসে তব নাম করে?
কোন্ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালীর ঘরে?
কোন্ রাজ্য তুমি করেছ জয়?
কোন্ রাজ্য তুমি শাসিয়াছ ভাল?
কোন্ মারাধনে ধরিয়াছ ঢাল?
এই বঙ্গভূমি এ কাল সে কাল
অরণ্য, অরণ্য, অরণ্যময়॥

কে মেলিল আজি এ চাঁদের হাট?
কে খুলিল আজি মনের কপাট?
পড়াইব আজি এ দুখের পাঠ,
শুনি ছি ছি রব, বাঙ্গালী নামে!
য়ুরোপে মার্কিণে ছি ছি ছি ছি বলে,
শুনি ছি ছি রব হিমালয়তলে,
শুনি ছি ছি রব, সমুদ্রের জলে
স্বদেশে বিদেশে নগরে গ্রামে॥
কি কাজ বহিয়া এ ছার জীবনে,
কি কাজ রাখিয়া এ নাম ভুবনে,
[illegible] থাকিতে কি ভয় মরণে?
চল সবে মরি পশিয়া জলে।
গলে গলে ধরি চল সবে মরি,
সারি সারি সারি, চল সবে মরি,
শীতল সলিলে এ জ্বালা পাসরি,
লুকাই এ নাম সাগরতলে॥

দুর্গোৎসব *

১

বর্ষে বর্ষে এসো যাও এ বাঙ্গালা ধামে
কে তুমি ষোড়শী কন্যা মৃগেন্দ্রবাহিনী।
চিনিয়াছি তোরে দুর্গে, তুমি না কি ভব-দুর্গে,
দুর্গতির একমাত্র সংহারকারিণী॥
মাটী দিয়ে গড়িয়াছি, কত গেল খড় কাছি,
সৃজিবারে জগতের সৃজনকারিণী।
গড়ে পিটে হলে খাড়া, বাজা ভাই ঢোল কাঁড়া,
কুমারের হাতে গড়া ঐ দীনতারিণী॥
বাজা—ঠমকি, ঠমকি, খিনিকি খিনিকি ঠিনি॥

কি সাজ সেজেছে মাতা রাঙ্গতার সাজে!
এ দেশে যে রাঙ্গতা সাজ কে তোরে শিখালে?
সন্তানে রাঙ্গতা দিলে, আপনি তাই পরিলে,
কেন মা রাঙ্গের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে?
ভারত রতন-খনি রতন কাঞ্চন মণি,
সে কালে এ দেশে মাতা, কত না ছড়ালে?
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, আজি তাই রাঙ্গতা পরা,
ছেঁড়া ধুতি রিপু করা, ছেলের কপালে?
তবে বাজা ভাই ঢোল, কাঁশি মধুর খেম্‌টা তালে॥

কারে মা এনেছ সঙ্গে, অনন্তরঙ্গিণি।
কি শোভা হয়েছে আজি দেখ রে সবায়।
আমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষ্মী খাড়া,
ঘরে হতে খাই তাড়া, ঘর খরচ নাই!
হয়েছিল হাতে খড়ি, ছাপার কাগজ পড়ি,
সরস্বতী তাড়াতাড়ি, এলো বুঝি তাই?
করো না মা বাড়াবাড়ি, তোমার আমার ছাড়াছাড়ি,
চড়ে না মা ভাতের হাঁড়ি, বিদ্যায় কাজ নাই।
তাক্ তাক্ ধিনাক্ ধিনাক্ বাজনা বাজা রে ভাই॥

---

* এই বাক্যে ছন্দের নিয়ম পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘিত হইয়াছে—ব্যাকরণের ত কথাই নাই!—লেখক।

দশভুজে দশায়ুধ কেন মাতা ধরে ?
কেন মাতা চাপিয়াছ সিংহটার ঘাড়ে ?
তুমি দেখে ভয় পাই, ঢাল খাঁড়া কাজ নাই,
ও সব রাখুক গিয়ে রামদীন পাঁড়ে।
সিংহ চড়া ভাল নয়, দাঁত দেখে পাই ভয়,
প্রাণ যেন খাবি খায়, পাছে লাফ ছাড়ে।
আছে ঘরে বাঁধা গাই, চড়তে হয় চড় তাই,
তাও কিছু ভয় পাই পাছে শিঙ নাড়ে।
সিংহ-পৃষ্ঠে মেয়ের পা! দেখে কাঁপি হাড়ে হাড়ে ॥

৫

তোমারে বাপের কাঁধে—নগেন্দ্রের ঘাড়ে।
তুঙ্গ শৃঙ্গোপরে সিংহ—দেখ গিরিবালে।
সিমলা পাহাড়ে ধ্বজা, উড়ায় করিয়া মজা,
পিতৃসহ বন্দী আছে, হর্ম্যক্ষের জালে।
তুমি যারে কৃপা কর, সেই হয় ভাগ্যধর,
সিংহেরে চরণ দিয়ে কতই বাড়ালে।
জনমি ব্রাহ্মণকুলে, শতদল পদ্ম তুলে,
আমি পূজে পাদপদ্ম পড়িনু আড়ালে।
রুটি মাখন খাব মা গো! আলোচাল ছাড়ালে ॥

৬

এই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন,
সিংহের গভীর কণ্ঠ ইংরেজ কামান ?
দুড়ুম দুড়ুম দুম, প্রভাতে ভাঙ্গায় ঘুম,
দুপুরে প্রদোষে ডাকে শিহরায় প্রাণ!
ছেড়ে ফেলে ছেঁড়া ধুতি, জলে ফেলে খুঙ্গী পুঁথি,
সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণসন্তান।
লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বসে মটন খাই,
দেখি মা পাই না পাই, তোমার সন্ধান।
গোলা টুপি মাথায় দিয়ে পাব জগতের সম্মান ॥

৭

এসেছ মা বিরহরে কিসের কারণে ?
বিরহর এ বাঙ্গালা তা কি আছে মনে।
এসেছ মা শক্তিধরে, দেখি কত শক্তি ধরে,
মেরেছ মা বারে বারে দুষ্টাসুরগণে।
মেরেছ তারকাসুর, আজি বঙ্গ ক্ষুধাতুর,
মার দেখি ক্ষুধাসুর সমাজের রণে।
অসুরে করিয়া জের, মায়ে পোয়ে মারলে ঢের,
মার দেখি এ অসুরে ধরি ও চরণে।
তখন—নাচ গো রণে! বাজাব প্রফুল্ল মনে ॥

৮

তোমার মহিমা মাতা বুঝিতে নারিনু,
কিসের লাগিয়া আন কাল বিষধরে ?
ঘরে পরে বিষধর, বিষে অঙ্গ জর জর,
আবার এ অজগর দেখাও কিহরে ?
হই মা পরের দাস, বাঁধি আঁটি কেটে ঘাস,
নাহিক ছাড়ি নিশ্বাস কালসাপ-ভয়ে।
নিতি নিতি অপমান, বিষে জর-জর প্রাণ,
কত বিষ কণ্ঠমাঝে, নীলকণ্ঠ ধরে,
বিষের জ্বালায় সদা প্রাণ ছটফট করে ॥

৯

দুর্গা দুর্গা বল ভাই দুর্গা-পূজা এলো,
পুতিয়া কলার তেড় সাজাও তোরণ।
বেছে বেছে তোল ফুল, সাজাব ও পদমূল,
এবার হৃদয় খুলে পূজিব চরণ ॥
বাজা ভাই ঢাক ঢোল, কাড়ানাগরা গণ্ডগোল,
দেহ ভাই পাঁটার ঝোল সোনার বরণ।
ক্ষান্তরত্ন এসো সাজি, প্রতিপদ হল আজি,
জাগাও দেখি চণ্ডীরে বসায়ে বোধন ॥

১০

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু—ছায়া রূপ ধরে।
কি পুঁথি পড়িলে বিপ্র! কাঁদিল হৃদয়।
সর্ব্বভূতে সেই ছায়া, হইল পবিত্র কায়া,
ঘুচিল সংসার-মায়া যদি তাই হয় ॥
আবার কি শুনি কথা, শক্তি নাকি যথা তথা,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, শক্তিরূপে রয় ?
বাঙ্গালী ভূতের দেহ, শক্তি ত না দেখে কেহ,
ছিলে যদি শক্তিরূপে কেন হলে লয় ?
আদ্যাশক্তি শক্তি দেহ, জয় মা চণ্ডীর জয় ॥

১১

পরিল এ বঙ্গবাসী, নূতন বসন,
জীবন্ত কুসুমসজ্জা যেন বা, ধরায়।
কেহ বা আপনি পরে, কেহ বা পরায় পরে,
যে যাহারে ভালবাসে, সে তারে সাজায়।
বাজারেতে হুড়াহুড়ি, আফিসেতে তাড়াতাড়ি,
লুচি মণ্ডা ছড়াছড়ি ভাত কেবা খায় ?
সুখের বড় বাড়াবাড়ি, টাকার বেলা তাড়াতাড়ি,
এই দশা ত সকল বাড়ী দোষিব বা কায় ?
বর্ষে বর্ষে তুমি মা গো বড়ই টাকার দায়

১২

হাহাকার বঙ্গদেশে টাকার জ্বালায়।
তুমি এলে শুভঙ্করি! বাড়ে আরো দায়।
কেন এসো কেন যাও, কেন চাল কলা খাও,
তোমার প্রসাদে যদি টাকা না কুলায়॥
তুমি ধর্ম তুমি অর্থ, তার বুঝি এই অর্থ,
তুমি মা টাকারূপিণী ধরম টাকায়।
.টাকা কাম টাকা মোক্ষ, রক্ষ মাতঃ রক্ষ রক্ষ,
টাকা দাও লক্ষ লক্ষ নৈলে প্রাণ যায়॥
টাকা ভক্তি টাকা মতি. টাকা মুক্তি টাকা গতি,
না জানি ভকতি স্তুতি নমামি টাকায়।
হা টাকা যো টাকা দেবি, মরি যেন টাকা সেবি,
অন্তিমকালে পাই মা যেন রূপার চাকায়॥

১৩

তুমিই বিষ্ণুর হস্তে চক্র সুদর্শন।
হে টাকে। ইহজগতে তুমি সুদর্শন।
শুন প্রভু রূপচাঁদ, তুমি ভানু তুমি চাঁদ,
ঘরে এসো সোনার চাঁদ দাও দরশন॥
আ মরি কি হেরি শোভা,ছেলে-বুড়ার মনোলোভা,
হৃদে ধরি বিবির মুণ্ড, লতায় বেষ্টন।
তব ঝন ঝন নাদে, হারিয়া বেহালা কাঁদে,
তম্বুরা মৃদঙ্গ বীণা কি ছার বাদন!
পশিয়া মরমমাঝে, নারীকণ্ঠ মৃদু বাজে,
তাও ছার তুমি যদি কর ঝন্ ঝন্।
টাকা টাকা টাকা টাকা। বাক্সেতে এস রে ধন॥

১৪

তোর লাগি সর্ব্বত্যাগী ওরে টাকা ধন,
জনমি বাঙ্গালী কুলে তুলিছু ও রূপে!
তেয়াগিয়া পিতা মাতা, শত্রু যে ভগিনী ভ্রাতা,
দেখি মরি জাতি গোষ্ঠী তোরে প্রাণ সঁপে॥
বুঝিয়া টাকার মর্ম্ম, ত্যজিছি যে ধর্ম্ম, কর্ম্ম,
করেছি নরকে ঠাঁই ঘোর কৃমিকূপে।
দুর্গে দুর্গে ডাকি আজ, এ লোভে পড়ুক বাজ,
অসুরনাশিনী চণ্ডি আর চণ্ডীরূপে!
এ অসুরে নাশ মাতঃ! শুম্ভে নাশিলে যেরূপে॥

১৫

এসো এসো জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী উমে!
হিসাব নিকাশ আমি করি তব সনে।
আজি পূর্ণ বারমাস, পূর্ণ হলো কোন্ আশ?
আবার পূজিব তোমা কিসের প্রসঙ্গে?
সেই ত কঠিন মাটী, দিবারাত্রি দুখে হাঁটি,
সেই রৌদ্র সেই বৃষ্টি পড়িতেছে অঙ্গে।
কি জন্ত গেল বা বর্ষ? বাড়িয়াছে কোন্ হর্ষ,
মিছামিছি আয়ুক্ষয় কালের ক্রভঙ্গে॥
বর্ষ কেন গণি ভবে, কেন তুমি এস তবে,
পিঞ্জর যন্ত্রণা সবে মনের বিহঙ্গে?
ভাঙ্গ মা দেহ-পিঞ্জর! উড়িব মনের রঙ্গে॥

১৬

ওই শুন বাজিতেছে গুম্ গাম্ গুম্।
ঢাক ঢোল কাড়া কাঁসি নৌবত নাগরা।
প্রভাত সপ্তমী নিশি, নেয়েছে শঙ্করী পিসী,
রাঁধিবে ভোগের রান্না হাঁড়ি মালসা ভরা॥
কাঁদি কাঁদি কেটে কলা, ভিজাইছে ডাল ছোলা,
'মোচা কুমড়া আলু বেগুন আছে কাঁড়ি করা॥
আর মা চাও বা কি, মটকী ভরা আছে ঘি,
মিহিদানা সীতাভোগ লুচি মনোহরা।
আজ এ পাহাড়ে মেয়ের ভাল করে পেট ভরা॥

১৭

আর কি খাইবে মাতঃ! ছাগলের মুণ্ড?
রুধিরে প্রবৃত্তি কেন হে শক্তিরূপিণি!
তুমি গো মা জগন্মাতা তুমি খাবে কার মাথা?
তুমি দেহ তুমি আত্মা সংসারব্যাপিনী।
তুমি কার কে তোমার, কেন তোমার মাংসাহার,
ছাগলে এ তৃপ্তি কেন সর্ব্বসংহারিণি!
করি তোমায় কৃতাঞ্জলি, তুমি যদি চাও বলি,
বলি দিব সুখ দুঃখ চিত্তবৃত্তি জিনি;
ছ্যাডাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাং! নাচ গো রণরঙ্গিণি॥

১৮

ছয়রিপু বলি দিব শক্তির চরণে!
ঐশিকী মানসী শক্তি! তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী।
বলি ত দিয়াছি সুখ, এখন বলি দিব দুখ,
শক্তিতে ইন্দ্রিয় জিনি হইব বিজয়ী॥
এ শক্তি দিতে কি পার? ঠুসে ভবে পাঁঠা মার,
প্রণমামি মহামায়ে তুমি ব্রহ্মময়ী।
নৈলে তুমি মাটীর ঢিপি, দশমীতে গলা টিপি,
তোমায় ভাসিয়ে গাঁজা টিপি সিদ্ধিরস্তু কই।
ঐটুকু মা ভাল দেখি পূজি তোমায় মৃন্ময়ী॥

১৯

মন-বোতলে ভক্তি-ধেনো রাখিয়াছি তারা।
এঁটেছি সন্দেহ-ছিপি বিভার গালাতে।

শিখিয়াছি লেখা-পড়া, দেবতার মেজাজ কড়া,
হইয়াছি আধপোড়া, সংসার-জ্বালাতে॥
সাহেবের হুকুম চড়া, গৃহিণীর নথনাড়া,
ঋণে করলে দেশছাড়া, পারি না পালাতে।
তাতে আবার তুমি এলে, টাকার হিসাব না করিলে,
এতে কি মা ভক্তি মেলে সংসার-লীলাতে।
বোতলে এঁটেছি ছিপি পার কি তুমি খোলাতে?

২০

কাজ নাই সে কথায়, পূজা কর সবে।
দেশের উৎসব এ যে ঠেলিতে কে পারে?
কর সবে গণ্ডগোল, দাও গোলে হরিবোল,
সাপুটি পাঁঠার ঝোল ফিরি দ্বারে দ্বারে—
বাজার লেগেছে ধুম, ছেলে বুড়ার নাহি ঘুম,
দেখ না জ্বলিছে আলো বঙ্গের সংসারে।
দেখ না বাজনা বাজে, দেখ না রমণী সাজে,
কুসুমিত তরু যেন কাতারে কাতারে।
তবু ত এনেছে সুখ মাতা বন্দ-কারাগারে॥

২১

বর্ষে বর্ষে এসো মা গো, খাও লুচি পাঁটা,
ছোলা কলা কচু ঘেচু যা যোটে কপালে।
যে হলো দেশের দশা, নাই বড় সে ভরসা,
আসবে যাবে খাবে নেবে সংবৎসর কালে।
তুমি খাও কলা মুলো, তোমার সন্তানগুলো,
মারিতেছে ব্রাণ্ডিপানি, মুর্গী পালে পালে।
দীন কবি আমি মাতা, পাতিয়া আম্রট পাতা,
তোমার প্রসাদ খাই ঘৃত আলো চালে।
প্রসীদ প্রসীদ দুর্গে, প্রসীদ নগেন্দ্র-বালে॥

রাজার উপর রাজা

গাছ পুঁতিলাম ফলের আশায়,
পেলেম কেবল কাঁটা।
সুখের আশায় বিবাহ করিলাম,
পেলেম কেবল ঝাঁটা॥

বাসের জন্য ঘর করিলাম ঘর গেল পুড়ে।
বুড়া বয়সের জন্য পুঁজি করিলাম, সব গেল উড়ে

চাকুরির জন্যে বিদ্যা করিলাম, ঘটিল উমেদারি।
যশের জন্য কীর্ত্তি করিলাম, ঘটিল টিটকারী॥

সুদের জন্য কর্জ্জ দিলাম, আসল গেল মারা।
প্রীতির জন্য প্রাণ দিলাম শেষে কেঁদে সারা॥

ধানের জন্য মাঠ করিলাম, হলো খড় কুটো।
পারের জন্য নৌকা করিলাম, নৌকা হলো ফুটো॥

লাভের জন্য ব্যবসা করিলাম
সব লহনা বাকি।
সেটাম দিয়া আদালত করিলাম,
ডিগ্রীর বেলায় ফাঁকি॥

তবে আর কেন ভাই বেড়াও
ঘুরে বেড়ে ভবের হাট।
জলে নৌকা যেমন
খড়ের কুটো জলন্ত আগুনের কাঠ॥

মুখে বল হরিনাম ভাই হৃদে ভাব হরি।
এ ব্যবসায় লোকসান নেই ভাই এস লাভে ঘর ভরি॥

এক গুণেতে শত লাভ শত গুণে হাজার।
হাজারেতে লক্ষ লাভ তারি কলাও কারবার॥

তাই বল হরি হরিবোল ভাঙ্গ ভবের হাট।
রাজার উপর হওগে রাজা লাট সাহেবের লাট॥

মেঘ

আমি বৃষ্টি করিব না। কেন বৃষ্টি করিব? বৃষ্টি করিয়া আমার কি সুখ? বৃষ্টি করিলে তোমাদের সুখ আছে। তোমাদের সুখে আমার প্রয়োজন কি?

দেখ, আমার কি যন্ত্রণা নাই? এই দারুণ বিদ্যুদগ্নি আমি অহরহঃ হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। আমার হৃদয়ে সেই সুহাসিনীর উদয় দেখিয়া তোমাদের চক্ষু আনন্দিত হয়, কিন্তু ইহার স্পর্শ মাত্রে তোমরা দগ্ধ হও। সেই অগ্নি আমি হৃদয়ে ধরি, আমি ভিন্ন কাহার সাধ্য এ আগুন হৃদয়ে ধরে?

দেখ, বায়ু আমাকে সর্ব্বদা অস্থির করিতেছে। বায়ুর দিগ্বিদিক্ বোধ নাই, সকল দিক্ হইতে বহিতেছে। আমি যাই জলভার গুরু, তাই বায়ু আমাকে উড়াইতে পারে না। তোমরা ভয় করিও না, আমি এখনই বৃষ্টি করিতেছি—পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। আমার পূজা দিও।

আমার গর্জ্জন অতি ভয়ানক—তোমরা ভয় পাইও না। আমি যখন মন্দ্রগম্ভীর গর্জ্জন করি,

বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত করিয়া, শিখিকুলকে নাচাইয়া, বৃহদগম্ভীর গর্জ্জন করি, তখন ইন্দ্রের হৃদয়ে মন্দারমালা দুলিয়া উঠে, নন্দসুন্দরীর্বকে শিখিপুচ্ছ কাঁপিয়া উঠে, পর্ব্বতগুহায় মুখরা প্রতিধ্বনি হাসিয়া উঠে। আর বৃত্রনিপাতকালে, বজ্রসহায় হইয়া যে গর্জ্জন করিয়াছিলাম, সে গর্জ্জন শুনিতে চাহিও না—ভয় পাইবে।

বৃষ্টি করিব বৈ কি? দেখ, কত নবযূথিকাদাম আমার জলকণার আশায় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া আছে। তাহাদিগের শুভ্র, সুবাসিত বদনমণ্ডলে স্বচ্ছ বারিনিষেক, আমি না করিলে কে করে?

বৃষ্টি করিব বৈ কি? দেখ, তটিনীকুলের দেহের এখনও পুষ্টি হয় নাই; তাহারা যে আমার প্রেরিত বারিরাশি প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ হৃদয়ে হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া নাচিয়া কল কল শব্দে উভয় কূল প্রতিহত করিয়া অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া কাহার না বর্ষিতে সাধ করে?

আমি বৃষ্টি করিব না। দেখ, ঐ পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক আমারই প্রেরিত বারি, নদী হইতে কলসী পুরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেছে এবং "পোড়া দেবতা একটু ধরণ কর না" বলিয়া আমাকেই গালি দিতেছে। আমি বৃষ্টি করিব না।

দেখ, কৃষকের ঘরে জল পড়িতেছে বলিয়া আমায় গালি দিতেছে। নহিলে সে কৃষক কেন? আমার জল না পাইলে তাহার চাষ হইত না—আমি তাহার জীবনদাতা। তাই আমি বৃষ্টি করিব না। সেই কথাটি মনে পড়িল।

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মযূরশ্চাতকস্তে সগর্ব্বঃ।

কালিদাসাদি যেখানে আমার স্তাবক, সেখানে আমি বৃষ্টি করিব না কেন?

আমার ভাষা শেলি বুঝিয়াছিল। যখন বলি, Being fresh showers for the thirsting flowers, তখন সে গম্ভীরা বাণীর মর্ম্ম শেলি না হলে কে বুঝিবে? কেন জান? সে আমার মত হৃদয়ে বিদ্যুদগ্নি বহে। প্রতিভাই তাহার বিদ্যুৎ।

আমি অতি ভয়ঙ্কর। যখন অন্ধকারে কৃষ্ণ-করালরূপ ধারণ করি, তখন আমার করাল ভ্রুকুটি কে সহিতে পারে? এই আমার হৃদয়ে কালাগ্নি বিদ্যুৎ তখন পলকে পলকে ঝলসিতে থাকে। আমার নিশ্বাসে স্থাবর-জঙ্গম উড়িতে থাকে, আমার রবে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়।

আবার আমি কেমন মনোরম! যখন পশ্চিম-গগনে সন্ধ্যাকালে লোহিত ভাস্করাঙ্কে বিহার করিয়া স্বর্ণতরঙ্গের উপর স্বর্ণতরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করি, তখন কে না আমার দেখিয়া ভুলে? জ্যোৎস্নাপরিপ্লুত আকাশে মন্দ পবনে আরোহণ করিয়া কেমন মনোহর মূর্ত্তি ধরিয়া আমি বিচরণ করি। শুন পৃথ্বী-বাসিগণ! আমি বড় সুন্দর, তোমরা আমাকে সুন্দর বলিও। আর একটা কথা আছে, তাহা বলা হইলেই আমি বৃষ্টি করিতে যাই। পৃথিবীতলে একটি পরম গুণবতী কামিনী আছে, সে আমার মনোহরণ করিয়াছে। সে পর্ব্বতগুহায় বাস করে, তাহার নাম প্রতিধ্বনি। আমার সাড়া পাইলেই সে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করে। বোধ হয়, আমায় ভালবাসে। আমিও তাহার আলাপে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমরা কেহ সম্বন্ধ করিয়া আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পার?

বৃষ্টি

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু একা এক জনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে—পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কণা মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্ত। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ ভাইসকল, কেহ একা নামিও না—অর্দ্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে, এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্ব্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব, নির্ঝরপথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহা কল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু? ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র, তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম্য অট্টালিকা স্রোতোমুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, জানালা দিয়া লোকের ঘরে

চুকি। যুবতীর যত্ন-নির্ম্মিত শয্যা ভিজাইয়া দিই—সুপ্ত সুন্দরীর গায়ের উপর গা ঢালি। বায়ু! বায়ু ত আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যেই বল—নহিলে আমরা কেহ নই। চল, আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি-বিন্দু কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ লতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু-পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি-বিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

তবে আয়, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, নবনীল-কাদম্বিনী বৃষ্টিকুল-প্রসূতি! আয় মা দিঙ্মণ্ডল-ব্যাপিনি! সৌরতেজঃ-সংহারিণি! এসো গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি। এসো ভগিনি, সুচারু-হাসিনি চঞ্চলে! বৃষ্টিকুলমুখ আলো কর। আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে ভূতলে নামি। তুমি বৃত্র-মর্ম্মভেদী বজ্র, তুমিও ডাক না—এ উৎসবে তোমার মত বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পড়িবে? পড়, কিন্তু কেবল গর্ব্বোন্নতের মস্তকের উপর পড়িও। এই ক্ষুদ্র পরোপকারী শস্যমধ্যে পড়িও না—আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ ত এই পর্ব্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গ, পোড়াও ত ঐ উচ্চ-দেবালয়-চূড়া পোড়াও। ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও না—আমরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।

দেখ দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে—ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষা চষিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে; কেবল বেনে-বউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা, দুই একখানা রেখে যা না—আমরা খাব! সে মাগীর কাপড় ভিজিয়ে দে।

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গ-রস জানি! লোকের চাল ফুটা করিয়া উঁকি মারি—দম্পতির গৃহে ছাদ ফুটা করিয়া টু দিই। যে পথে সুন্দর বউ জলের কলসী লইয়া যাইবে, সেই পথে, পিছল করিয়া রাখি। মল্লিকার মধু ধুইয়া লইয়া গিয়া ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি মুড়কির দোকানে দেখিবে, প্রায় মলায় মাখিয়া দিয়া যাই। রাখী চাকরাণী কাপড় শুকুতে দিলে প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি। ভণ্ড বামুনের জন্য আচমনীয় যাইতেছে দেখিলে, তাহার জাতি মারি। আমরা কি কম পাত্র, তোমরা সবাই বল—আমরা রসিক।

তা যাক্—আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্ব্বত-কন্দর দেশ প্রদেশ ধুইয়া লইয়া নূতন দেশ নির্ম্মাণ করিব। বিশীর্ণা সূত্রাকারা তটিনীকে কূলপ্লাবিনী দেশমার্জ্জিনী অনন্ত দেহধারিণী অনন্ত-তরঙ্গিণী জল-রাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব, কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব। অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে?

খদ্যোত

খদ্যোত যে কেন আমাদিগের উপহাসের স্থল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বোধ হয়, চন্দ্রসূর্য্যাদির আলোকাধার সংসারে আছে বলিয়াই জোনাকির এত অপমান। যেখানেই অল্পগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহাস করিতে হইবে, সেইখানেই বক্তা বা লেখক জোনাকির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাই যে, জোনাকির অল্প হউক, অধিক হউক, কিছু আলো আছে—কই, আমাদের কিছুই নাই। এই অন্ধকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার পথ আলো করিলাম? কে আমাকে দেখিয়া অন্ধকারে, দুস্তরে,প্রান্তরে, দুর্দ্দিনে, বিপদে, বিপাকে, বলিয়াছে, এস ভাই, চল চল ঐ দেখ আলো জ্বলিতেছে। চল, ঐ আলো দেখিয়া পথ চল। অন্ধকার, এ পৃথিবী তাই বড় অন্ধকার! পথ চলিতে পারি না। যখন চন্দ্র সূর্য্য থাকে, তখন চলি—নহিলে পারি না। তারাগণ আকাশে উঠিয়া কিছু আলো করে বটে, কিন্তু দুর্দ্দিনে ত তাহাদের দেখিতে পাই না। চন্দ্র সূর্য্যও সুদিনে—দুর্দ্দিনে, কুসময়ে, যখন মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের ছটা, একে রাত্রি, তাহাতে ঘোর বর্ষা তখন কেহ না, মনুষ্য-নির্ম্মিত বস্ত্রের ন্যায় তাহারাও বলে Hora non numero nisi serenos! কেবল তুমি খদ্যোত, ক্ষুদ্র, হীনাভাস, ঘৃণিত সহজে হন্তব্য, সর্ব্বদা হত—তুমিই সেই অন্ধকারে আলো। আমি তোমায় ভালবাসি।

আমি তোমাকে ভালবাসি, কেন না তোমার অল্প, অতি অল্প,আলো আছে—আমিও মনে জানি, আমারও অল্প, অতি অল্প, আলো আছে, তুমিও অন্ধকারে, আমিও তাই, ঘোর অন্ধকারে। অন্ধকারে সুখ নাই কি? তুমিও অনেক অন্ধকারে বেড়াইয়াছ—তুমি বল দেখি? যখন নিশীথ মেঘে

জগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষা হইতেছে, ছাড়িতেছে, ছাড়িতেছে হইতেছে, চন্দ্র নাই, তারা নাই, আকাশের নীলিমা নাই—পৃথিবীর দীপ নাই, প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা পর্য্যন্ত নাই, কেবল অন্ধকার, অন্ধকার। কেবল অন্ধকার আছে,—আর তুমি আছ—তখন বল দেখি, অন্ধকারে কি সুখ? সেই তপ্ত রৌদ্র-প্রদীপ্ত কর্কশ স্পর্শপীড়িত কঠোর শব্দে শব্দায়মান অসহ্য সংসারের পরিবর্ত্তে, সংসার আর তুমি. জগতে অন্ধকার; আর মুদিত কামিনীকুসুম জলনিষেক-তরুণায়িত বৃক্ষের পাতায় পাতায় তুমি? বল দেখি ভাই, সুখ আছে কি না?

আমি ত বলি আছে। নহিলে কি সাহসে তুমি ঐ বস্তান্ধকারে, আমি এই সামাজিক অন্ধকারে এই ঘোর দুর্দ্দিনে ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতাম? আছে—অন্ধকারে মাতিয়া আমোদ আছে। কেহ দেখিবে না, অন্ধকারে তুমি জ্বলিবে—আর অন্ধকারে আমি জ্বলিব, অনেক জ্বালায় জ্বলিব। জীবনের তাৎপর্য্য বুঝিতে অতি কঠিন—অতি গূঢ়, অতি ভয়ঙ্কর ক্ষুদ্র হইয়া কেন জ্বল, ক্ষুদ্র হইয়া আমি কেন জ্বলি? তুমি তা ভাব কি? আমি ভাবি। তুমি যদি না ভাব, তুমি সুখী। আমি ভাবি—আমি অসুখী। তুমিও কীট—আমিও কীট, ক্ষুদ্রাধিক ক্ষুদ্র কীট—তুমি সুখী—কোন্ পাপে আমি অসুখী? তুমি ভাব কি, তুমি কেন জগৎ-সবিতা সূর্য্য হইলে না, এককালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভা যে সুধাকর, কেন তাই হইলে না, কেন গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহারিকা কিছু না হইয়া কেবল জোনাকি হইলে, ভাব কি? যিনি এ সকলকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই তোমার সৃজন করিয়াছেন, যিনিই উহাদিগকে আলোক দিয়াছেন, তিনিই তোমাকে আলোক দিয়াছেন—তিনি একের বেলা বড় ছাঁদে, অন্যের বেলা ছোট ছাঁদে গড়িলেন কেন। অন্ধকারে এত বেড়াইলে, ভাবিয়া কিছু পাইয়াছ কি?

তুমি ভাব, না ভাব, আমি ভাবি। আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি যে, বিধাতা তোমায় আমায় কেবল অন্ধকার রাত্রের জন্য পাঠাইয়াছেন। আলো একই—তোমার আলো ও সূর্য্যের আলো—উভয়ই জগদীশ্বর-প্রেরিত—তবে তুমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য, আমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য কাঁদি।

এসো কাঁদি, বর্ষার সঙ্গে তোমার আমার সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধ কেন? আলোকময় নক্ষত্রপ্রোজ্জ্বল বসন্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন? বসন্ত চন্দ্রের জন্য, সুখীর জন্য, নিশ্চিন্তের জন্য, বর্ষা তোমার জন্য, দুঃখীর জন্য, আমার জন্য, সেই জন্য কাঁদিতে চাহিতেছিলাম—কিন্তু কাঁদিব না। যিনি তোমার আমার জন্য এই সংসার অন্ধকারময় করিয়াছেন, কাঁদিয়া তাঁহাকে দোষ দিব না, যদি অন্ধকারের সঙ্গে তোমার আমার নিত্য সম্বন্ধই তাঁহার ইচ্ছা, আইস, অন্ধকারই ভালবাসি, আইস, নবীন নীলকাদম্বিনী দেখিয়া এই অনন্ত অসংখ্য জগন্ময় ভীষণ বিশ্বমণ্ডলের করাল ছায়া অনুভূত করি, মেঘগর্জ্জন শুনিয়া সর্ব্বধ্বংসকারী কালের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন স্মরণ করি,—বিদ্যুদ্দাম দেখিয়া কালের কটাক্ষ মনে করি। মনে করি, এই সংসারই ভয়ঙ্কর ক্ষণিক—আমি ক্ষণিক বর্ষার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলাম, কাঁদিবার কথা নাই। আইস, জ্বলিতে জ্বলিতে, অনেক জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে সকল সহ্য করি।

নহিলে, আইস, মরি। তুমি দীপালোক বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মর, আমি আশারূপ প্রবল প্রোজ্জ্বল মহাদীপ বেড়িয়া পুড়িয়া মরি, দীপালোকে তোমার কি মোহিনী আছে, জানি না,—আশার আলোকে আমার যে মোহিনী আছে, তাহা জানি। এ আলোকে কতবার ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। কতবার পুড়িলাম, কিন্তু মরিলাম না। এ মোহিনী কি, আমি জানি, জ্যোতিষ্মান্ হইয়া এ সংসারে আলো বিতরণ করিব—বড় সাধ, কিন্তু হায়, আমরা খদ্যোত, এ আলোকে কিছুই আলোকিত হইবে না। কাজ নাই। তুমি ঐ বকুলকুঞ্জ-কিসলয়রক্ত অন্ধকারমধ্যে তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাও, আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে হউক, দুঃখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই।

মনুষ্য-খদ্যোত।

গদ্য-পদ্য বা কবিতা-পুস্তক সমাপ্ত

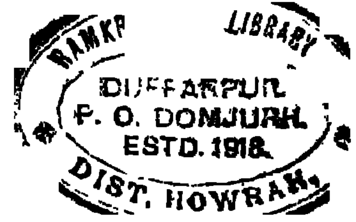
লোকরহস্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

[তৃতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

লোকরহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অর্দ্ধেক পুরাতন ও অর্দ্ধেক নূতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নূতন, আটটি পুরাতন, এবং একটি রামায়ণের সমালোচনা পুরাতন হইলেও নূতন করিয়া লিখিতে হইয়াছে। সকলগুলি বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত।



লোকরহস্য

ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল

একদা সুন্দরবনমধ্যে ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা সমবেত হইয়াছিল। নিবিড় বনমধ্যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে ভীমাকৃতি বহুতর ব্যাঘ্র লাঙ্গূলে ভর করিয়া, দংষ্ট্রা-তায় অরণ্যপ্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাঙ্গূলাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"অদ্য আমাদিগের কি শুভদিন! অদ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাষী ব্যাঘ্রকুলতিলক সকল পরস্পরের মঙ্গল-সাধনার্থ এই অরণ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছি। আহা! কুৎসাকারী, খল-স্বভাব অন্যান্য পশুবর্গে রটনা করিয়া থাকে যে, আমরা বড় অসামাজিক, একা একা বনেই বাস করিতে ভালবাসি, আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত সুসভ্য ব্যাঘ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সভ্যতার যেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শীঘ্রই ব্যাঘ্রেরা সভ্য জাতির অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনারা দিন দিন এইরূপ জাতি-হিতৈষিতা প্রকাশ পূর্ব্বক পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন করিতে থাকুন।"

(সভামধ্যে লাঙ্গূল-চটচটারব)

"এক্ষণে হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-সমাজে বিদ্যার চর্চ্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাদিগের বিশেষ অভিলাষ হইয়াছে, আমরা বিদ্বান্ হইব। কেন না, আজি-কালি সকলেই বিদ্বান্ হইতেছে। আমরাও হইব, বিদ্যার আলোচনার জন্য এই ব্যাঘ্রসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইহার অনুমোদন করুন।"

সভাপতির এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভ্যগণ হাউ মাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তখন যথারীতি কয়েকটি প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভ্যগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হইল, সে সকল ব্যাকরণ শুদ্ধ এবং অলঙ্কারবিশিষ্ট বটে, তাহাতে শব্দবিন্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর। বক্তৃতার চোটে সুন্দরবন কাঁপিয়া গেল।

পরে সভার অন্যান্য কার্য্য হইলে সভাপতি বলিলেন, "আপনারা জানেন যে, এই সুন্দরবনে বৃহল্লাঙ্গূল নামে এক অতি পণ্ডিত ব্যাঘ্র বাস করেন। অদ্য রাত্রে তিনি আমাদিগের অনুরোধে মনুষ্য-চরিত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।"

মনুষ্যের নাম শুনিয়া কোন কোন নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে পবলিক ডিনরের সূচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গর্জ্জনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং পথিকের ভীতিবিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন,—

"সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! মনুষ্য এক প্রকার দ্বিপদ জন্তু। তাহারা পক্ষবিশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না, বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদের সাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদগণের যে যে অঙ্গ আছে, মনুষ্যেরও সেইরূপ আছে। অতএব মনুষ্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের যেরূপ গঠনের পারিপাট্য, মনুষ্যের তাদৃশ নাই। কেবল ঈদৃশ প্রভেদের জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে যে, আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।

চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে, এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।

মনুষ্য-পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। (শুনিয়া সভ্যগণ সকলে আপন আপন মুখ চাটিলেন) তাহারা সচরাচর অনায়াসেই মারা পড়ে। মৃগাদির ন্যায় তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ মহিষাদির ন্যায় বলবান্ বা শৃঙ্গাদি-আয়ুধ-যুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই জগৎ-সংসার ব্যাঘ্র-জাতির সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সেই জন্য ব্যাঘ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেন নাই। বাস্তবিক মনুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত—নখ-দন্ত-শৃঙ্গাদি-বর্জ্জিত, গমনে মন্থর এবং কোমলপ্রকৃতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যাঘ্রজাতির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না।

এই সকল কারণে,বিশেষ তাহাদিগের মাংসের কোমলতা হেতু,আমরা মনুষ্যজাতি বড় ভালবাসি। দৃষ্টিমাত্রেই ধরিয়া খাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারাও বড় ব্যাঘ্রভক্ত। এই কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন,তবে তাহার উদাহরণ-স্বরূপ আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বলি। আপনারা অবগত আছেন,আমি বহুকালাবধি দেশ-ভ্রমণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি। আমি যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাঘ্রভূমি সুন্দর-বনের উত্তরে আছে। তথায় গো-মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস্র পশুগণই বাস করে। তথাকার মনুষ্য দ্বিবিধ, এক জাতি কৃষ্ণবর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ। একদা আমি সেই দেশে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম।"

শুনিয়া মহোদংষ্ট্রা নামে এক জন উদ্ধতস্বভাব ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিষয়কর্ম্মটা কি ?"

বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় কহিলেন, "বিষয়কর্ম্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্যলোক আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয়-কর্ম্ম বলে, এমত নহে। সম্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কর্ম্ম,অসম্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্ত্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি, বলবানের আহারান্বেষণ দস্যুতা, লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না, তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্য্যের নাম দস্যুতা, যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা যখন সভ্যসমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন সেই সকল নামবৈচিত্র্য স্মরণ করিবেন, নচেৎ লোক অসভ্য বলিবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই, এক উদরপূজা নাম রাখিলে বীরত্বাদি সকলই বুঝাইতে পারে।

সে যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাম শ্রবণ করুন। মনুষ্যেরা বড় ব্যাঘ্রভক্ত। আমি একদা মনুষ্য-বসতি-মধ্যে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছেন, কয়েক বৎসর হইল, এই সুন্দরবনে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল।"

মহাদংষ্ট্রা পুনরায় বক্তৃতা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি কিরূপ জন্তু ?"

বৃহল্লাঙ্গূল কহিলেন, 'তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি। ঐ জন্তুর আকার,হস্তপদাদি কিরূপ, জিঘাংসাই বা কেমন ছিল, ঐ সকল আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি, ঐ পশু মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত, মনুষ্য-দিগেরই হৃদয়শোণিত পান করিত এবং তাহাতে বড় মোটা হইয়া মরিয়া গিয়াছে। মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপন আপন বধোপায় সর্ব্বদাই আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই এ কথার প্রমাণ। মনুষ্যবধই ঐ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য। শুনিয়াছি, কখন কখন সহস্র সহস্র মনুষ্য প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে। আমার বোধ হয়, মনুষ্যগণ পরস্পরের বিনাশার্থ এই 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি' নামক রাক্ষসের সৃজন করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, আপনারা স্থির হইয়া এই মনুষ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মধ্যে মধ্যে রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বক্তৃতা হয় না। সভ্যজাতিদিগের এরূপ নিয়ম নহে। আমরা একণে সভ্য হইয়াছি, সকল কাজে সভ্য-দিগের নিয়মানুসারে চলা ভাল।

আমি একদা সেই 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পা-নির বাসস্থান মাতলায় বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে

গিয়াছিলাম। তথায় এক বংশমণ্ডপ-মধ্যে একটা কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস দৃষ্টি করিয়া তদাস্বাদনার্থ মণ্ডপমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ঐ মণ্ডপ ভৌতিক—পশ্চাৎ জানিয়াছি, মনুষ্যেরা উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশমাত্র আপনা হইতে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতকগুলি মনুষ্য তৎপরে সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া পরমানন্দিত হইল এবং আহ্লাদসূচক চীৎকার, হাস্য-পরিহাসাদি করিতে লাগিল। তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেহ আমার দন্তের, কেহ নখের, কেহ লাঙ্গুলের গুণ-গান করিতে লাগিল, এবং অনেকে আমার উপর প্রীত হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। পরে তাহারা ভক্তিভাবে আমাকে মণ্ডপ সমেত স্কন্ধে বহন করিয়া, এক শকটের উপর উঠাইল। দুই অমলশ্বেতকান্তি বলদ ঐ শকট বহন করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অর্দ্ধভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম। আমি সুখে শকটারোহণ করিয়া ছাগমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের আবাসে উপস্থিত হইলাম। সে আমার সম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল এবং লৌহদণ্ডাদিভূষিত এক সুরম্য গৃহমধ্যে আমার অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তথায় সজীব বা সদ্যোহত ছাগ-মেষ-গবাদির উপাদেয় মাংসশোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত, অন্যান্য দেশ-বিদেশীয় বহুতর মনুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বুঝিতে পারিতাম যে, উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইত।

আমি বহুকাল ঐ লৌহজালাবৃত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। আহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম। হে মাতঃ সুন্দরবন! আমি কি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব? আহা! তোমাকে যখন মনে পড়িত, তখন আমি ছাগমাংস ত্যাগ করিতাম, মেষমাংস ত্যাগ করিতাম! (অর্থাৎ অস্থি এবং চর্ম্ম মাত্র ত্যাগ করিতাম)—এবং সর্ব্বদা লাঙ্গুলাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের চিন্তা লোককে জানাই-তাম। হে জন্মভূমি! যত দিন তোমাকে দেখি নাই, তত দিন ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই, নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা যাই নাই। দুঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব, পেটে যাহা ধরিত, তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর দুই চারি সের মাত্র মাংস খাইতাম। আর খাইতাম না।"

তখন বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় জন্মভূমির প্রেমে অভি-ভূত হইয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারাপতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাঘ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গুলের অশ্রুপতনের চিহ্ন নহে। মনুষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই ব্যাঘ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল।

লেকচারার তখন ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াই হউক, আর ভুলক্রমেই হউক, আমার ভৃত্য এক দিন আমার মন্দির-মার্জ্জনান্তে, দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যান-রক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম।

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া আসি-য়াছি—মনুষ্য চরিত্র সবিশেষ অবগত আছি—শুনিয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। অন্য পর্য্যটকদিগের ন্যায় অমূলক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি, আমি সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্রজীব হইয়াও পর্ব্বতাকার বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করে। ঐরূপ পর্ব্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐরূপ গৃহ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার বোধ হয়, তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্ব্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি, তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট

দেখিয়া বুদ্ধিজীবী মনুষ্যপশু তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে। *

মনুষ্যজন্তু উভয়াহারী। তাহারা মাংসভোজী এবং ফলমূলও আহার করে। বড় বড় গাছ খাইতে পারে না। ছোট ছোট গাছ সমূলে আহার করে। মনুষ্যেরা ছোট গাছ এত ভালবাসে যে, আপনারা তাহার চাষ করিয়া বেরিয়া রাখে। ঐরূপ রক্ষিত ভূমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে। এক মনুষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না।

মনুষ্যেরা ফলমূল লতা-গুল্মাদি ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় কি না, বলিতে পারি না। কখন কোন মনুষ্যকে ঘাস খাইতে দেখি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার এক সংশয় আছে। শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান্ মনুষ্যেরা বহুযত্নে আপন আপন উদ্যানে ঘাস তৈয়ার করে। আমার বিবেচনায় উহারা ঐ ঘাস খাইয়া থাকে। নহিলে ঘাসে তাহাদের এত যত্ন কেন? এরূপ আমি এক জন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখে শুনিয়াছিলাম। সে বলিতেছিল, দেশটা উচ্ছন্ন গেল—যত সাহেবসুবো বড় মানুষে ব'সে ব'সে ঘাস খাইতেছে। সুতরাং প্রধান মানুষেরা যে ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়।

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, আমি কি ঘাস খাই? আমি জানি, মনুষ্যদিগের স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে। অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে।

মনুষ্যেরা পশু-পূজা করে। আমার যত প্রকার পূজা করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। অশ্বদিগেরও উহারা ঐরূপ পূজা করিয়া থাকে; অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গাত্র ধৌত ও মার্জনাদি করিয়া দেয়। বোধ হয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়াই মনুষ্যেরা তাহার পূজা করে।

মনুষ্যেরা ছাগ, মেষ, গবাদিও পালন করে। গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে। তাহারা গরুর দুগ্ধ পান করে, ইহাতে পূর্ব্বকালের ব্যাঘ্র-পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা কোন কালে গোরুর বৎস ছিল। আমি ততদূর বলি না, কিন্তু এই কারণেই বোধ করি, গোরুর সঙ্গে মানুষের-বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

সে যাই হউক, মানুষেরা আহারের সুবিধার জন্য গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া থাকে, ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই। আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব করিব যে, আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।

গো, অশ্ব, ছাগ ও মেষের কথা বলিলাম। ইহা ভিন্ন হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, কুক্কুর, বিড়াল, এমন কি, পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য-জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।

মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম। সে সকল বানর দ্বিবিধ,—এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুলশূন্য। সলাঙ্গুল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্থ। বোধ হয়, বংশমর্য্যাদা বা জাতিগৌরব ইহার কারণ।

মনুষ্য-চরিত্র অতি বিচিত্র। তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। তদ্ভিন্ন তাহাদিগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর। ক্রমে ক্রমে তাহা বিবৃত করিতেছি।"

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি অমিতোদর, দূরে একটি হরিণ-শিশু দেখিতে পাইয়া চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। অমিতোদর এইরূপ দূরদর্শী বলিয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতিকে অকস্মাৎ বিদ্যালোচনায় বিমুখ দেখিয়া, প্রবন্ধপাঠক কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এক জন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না, সভাপতি মহাশয় বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে দৌড়িয়াছেন। হরিণের পাল আসিয়াছে, আমি ঘ্রাণ পাইতেছি।"

* পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গুলের ভারশাস্ত্রে বুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে মোক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এরূপ তর্কে জেমস মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি এবং সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা। বস্তুতঃ ব্যাঘ্র-পণ্ডিতে এবং মনুষ্যপণ্ডিতে অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

এই কথা শুনিবামাত্র মহাবিজ্ঞ সভ্যেরা লাঙ্গুলোত্থিত করিয়া, যিনি যে দিকে পারিলেন, সেই দিকে বিষয়কর্ম্মের চেষ্টায় ধাবিত হইলেন। লেকচারারও এই বিদ্যার্থীদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলেন। এইরূপে সেদিন ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা অকালে ভঙ্গ হইল।

পরে তাঁহারা অন্য এক দিন সকলে পরামর্শ করিয়া আহারান্তে সভার অধিবেশন করিলেন। সে দিন নির্ব্বিঘ্নে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত হইল। তাহার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলে আমরা প্রকাশ করিব।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

সভাপতি মহাশয়, বাঘিনীগণ এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ!

আমি প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, মানুষের বিবাহ-প্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভদ্রের অঙ্গীকারপালনই প্রধান ধর্ম্ম, অতএব আমি একেবারেই আমার বিষয়ে প্রবেশ করিলাম।

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সকলেই মধ্যে মধ্যে অবকাশ-মতে বিবাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যদিগের কিছু বৈচিত্র্য আছে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি সভ্য পশু-দিগের দার-পরিগ্রহ কেবল প্রয়োজনাধীন, মনুষ্য-পশুর সেরূপ নহে—তাহাদের মধ্যে অনেকেই এককালীন জন্মের মত বিবাহ করিয়া রাখে।

মনুষ্যবিবাহ দ্বিবিধ,—নিত্য এবং নৈমিত্তিক। তন্মধ্যে নিত্য অর্থাৎ পৌরোহিত বিবাহই মান্য। পুরোহিতকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই পৌরোহিত বিবাহ।

মহাদংষ্ট্রা। পুরোহিত কি?

বৃহল্লাঙ্গুল।—অভিধানে লেখে, পুরোহিত চালকলাভোজী বঞ্চনাব্যবসায়ী মনুষ্যবিশেষ। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দুষ্ট। কেন না, সকল পুরোহিত চাল-কলাভোজী নহে, অনেক পুরোহিত মদ্য-মাংস খাইয়া থাকেন; অনেক পুরোহিত সর্ব্বভুক্। পক্ষান্তরে, চালকলা খাইলেই পুরোহিত হয়, এমন নহে। বারাণসী নামক নগরে অনেকগুলি ষাঁড় আছে—তাহারা চাল-কলা খাইয়া থাকে। তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ, তাহারা বঞ্চক নহে। বঞ্চকে যদি চালকলা খায়, তাহা হইলেই পুরোহিত হয়।

পৌরোহিত বিবাহে এইরূপ একজন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্ত্তী হইয়া বসে। বসিয়া কতকগুলা বকে। এই বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে। তাহার অর্থ কি, আমি সবিশেষ অবগত নহি, কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাহাতে ঐ সকল মন্ত্রের এক প্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত করিয়াছি। বোধ হয়, পুরো-হিত বলে, "হে বরকন্যা! আমি আজ্ঞা করি-তেছি, তোমরা বিবাহ কর। তোমরা বিবাহ করিলে আমি নিত্য চালকলা পাইব অতএব তোমরা বিবাহ কর। এই কন্যার গর্ভাধানে, সীমন্তোন্নয়নে, সূতিকাগারে চাল-কলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। সন্তানের ষষ্ঠীপূজায়, অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চূড়াকরণে বা উপনয়নে—অনেক চাল-ডাল পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। তোমরা সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বদা ব্রত-নিয়মে, পূজা-পার্ব্বণে, যাগ-যজ্ঞে রত হইবে; সুতরাং আমি অনেক চাল-কলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। বিবাহ রহিত করিও না। যদি রহিত কর, তবে আমার চালকলার বিশেষ বিঘ্ন হইবে। তাহা হইলে এক এক চপেটাঘাতে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-দিগের এইরূপ আজ্ঞা।"

বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিত বিবাহ কখন রহিত হয় না।

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। মনুষ্যমধ্যে এরূপ বিবাহও সচরাচর প্রচলিত। অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, নিত্য-নৈমিত্তিক উভয়-বিধ বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ প্রভেদ এই যে, নিত্য বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণ-পণে গোপন করে। যদি এক জন মনুষ্যের নৈমি-ত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে। আমার বিবেচনায় পুরোহিতেরাই এই অনর্থের মূল। নৈমিত্তিক বিবাহে তাহারা চাল-কলা পায় না—সুতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশ্য—তাহাদের শিক্ষামতে সকলেই নৈমিত্তিক বিবাহকারীকে ধরিয়া প্রহার করে। কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই যে, অনেকেই গোপনে স্বয়ং নৈমিত্তিক বিবাহ করে, অথচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধরিয়া প্রহার করে।

ইহাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক

মনুষ্যই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মুখ ফুটিতে পারে না। আমি মনুষ্যালয়ে বাসকালীন জানিয়া আসিয়াছি, অনেক উচ্চশ্রেণীস্থ মানুষের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর। যাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশুবৃত্ত, তাঁহারাই এ বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণ করিয়া থাকেন। আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষ্যজাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মনুষ্যপণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেছেন। তাঁহারা স্বজাতিহিতৈষী, সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায় সম্মানবর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে এই ব্যাঘ্রসমাজে অনরারি মেম্বর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। ভরসা করি, তাঁহারা সভাস্থ হইলে, আপনারা তাঁহাদিগকে জলযোগ করিবেন না। কেন না, তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষী।

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে। তাহা হইলেই মৌদ্রিক বিবাহ সম্পন্ন হয়

মহাদংষ্ট্রা। মুদ্রা কি?

বৃহল্লাঙ্গূল। মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতাবিশেষ, যদি আপনাদিগের কৌতূহল থাকে, তবে আমি সবিশেষ সেই মহাদেবীর গুণ কীর্ত্তন করি। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইঁহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইঁহার প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। লৌহ, টিন, কাষ্ঠে ইঁহার মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম্ম প্রভৃতিতে ইঁহার সিংহাসন গঠিত হয়। মানুষগণ রাত্রিদিন ইঁহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়ীতে টাকা আছে জানে, অহরহঃ সেই বাড়ীতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে,—এমন ভক্তি, কিছুতেই সে বাড়ী ছাড়ে না—মারিলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুষ্যেরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যুক্তকরে স্তব-স্তুতি করিতে থাকে। যদি মুদ্রাদেবীর অধিকারী একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করে, তাহা হইলে তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন।

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রী নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্ম্মই নাই যে, এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইঁহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে, যাহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্যসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক বলে—মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান্ হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয় আমরা যদি "বড় বাঘ" বলি, তবে অমিতোদর, মহাদংষ্ট্রা প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্রগণকে বুঝাইবে। কিন্তু মনুষ্যালয়ে "বড় মানুষ" বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না—আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই বড় মানুষ বলে। যাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে "ছোট লোক" বলে।

মুদ্রাদেবীর এইরূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, মনুষ্যালয় হইতেই ইহাকে আনিয়া ব্যাঘ্রালয়ে স্থাপন করিব। কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম। শুনিলাম যে, মুদ্রাই মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাঘ্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্ব্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুদ্রা-পূজাই ইহার কারণ। মুদ্রার লোভে সকল মনুষ্যেই পরস্পরের অনিষ্ট-চেষ্টায় রত। প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, মনুষ্যেরা সহস্রে সহস্রে প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে হনন করে। মুদ্রাই তাহার কারণ। মুদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সর্ব্বদাই মনুষ্যেরা পরস্পরে হত, আহত, পীড়িত, অবরুদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কৃত করে। মনুষ্যলোকে বোধ হয়, এমন অনিষ্টই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহ-প্রেরিত নহে। ইহা আমি জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার পূজার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃতাতেই

বলিয়াছি যে, মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিণাম-দর্শী—সর্ব্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল-চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের স্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনুষ্যদিগের বিবাহতত্ত্ব যেমন কৌতুকাবহ, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রূপ। তবে পাছে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে আপনাদিগের বিষয়-কর্ম্মের সময় পুনরুপস্থিত হয়, এই জন্য অদ্য এইখানে সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।

এইরূপে বক্তৃতা সমাধা করিয়া পণ্ডিতবর ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, বিপুল লাঙ্গুলচটচটার মধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন দীর্ঘনখ নামে এক সুশিক্ষিত যুবা ব্যাঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া, হাউ-মাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

দীর্ঘনখ মহাশয় গর্জ্জনান্তে বলিলেন, "হে ভদ্র ব্যাঘ্রগণ। আমি অদ্য বক্তার সদ্বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করি। কিন্তু ইহা বলাও কর্ত্তব্য যে, বক্তৃতাটি নিতান্ত মন্দ, মিথ্যা-কথা-পরিপূর্ণ, বক্তা অতি গণ্ডমূর্খ।"

অমিতোদর। আপনি শান্ত হউন। সভ্য-জাতীয়েরা অত স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।

দীর্ঘনখ। যে আজ্ঞা। বক্তা অতি সত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশ কথা অপ্রাকৃত হইলেও, দু একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। তিনি অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা যাহা পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে বক্তৃতার সকল কথায় সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি না। বিশেষ আদৌ মনুষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে, বক্তা তাহাই অবগত নহেন। ব্যাঘ্রজাতির কুল-রক্ষার্থ যদি কোন বাঘ বাঘিনীকে আপন সহচরী করে, (সহচরী, সঙ্গে চরে) তাহাকেই আমরা বিবাহ বলি, মানুষের বিবাহ সেরূপ নহে। মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং প্রভুভক্ত। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটি প্রভু চাহি। সকল মনুষ্যই এক এক জন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে। যখন তাহারা কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রভু নিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পৌরোহিত বিবাহ বলা যায়। সাক্ষীর নাম পুরোহিত। বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় বিবাহমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ। সে মন্ত্র এইরূপ,—

পুরোহিত। বল, আমাকে কি বিষয়ে সাক্ষী হইতে হইবে?

বর। আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভুত্বে নিযুক্ত করিলাম।

পুরো। আর কি?

বর। আর আমি জন্মের মত ইঁহার শ্রীচরণের গোলাম হইলাম। আহার-যোগানের ভার আমার উপর,—খাবার ভার উঁহার উপর।

পুরো। (কন্যার প্রতি) তুমি কি বল?

কন্যা। আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভৃত্যটিকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণসেবা করিতে দিব। যে দিন ইচ্ছা না হইবে, সে দিন নাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিব।

পুরো। শুভমস্তু।

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে, যথা—মুদ্রাকে বক্তা মনুষ্যপূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা দেবতা নহে। মুদ্রা এক প্রকার বিষচক্র। মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষ-প্রিয়, এই জন্য সচরাচর মুদ্রাসংগ্রহ জন্য যত্নবান্। মনুষ্যগণকে মুদ্রাভক্ত জানিয়া আমি পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, না জানি কেমনই উপাদেয় সামগ্রী, আমাকে এক দিন খাইয়া দেখিতে হইবে। একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মনুষ্যকে হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটি মুদ্রা পাইলাম। পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম। পরদিবস আমার উদরের পীড়া উপস্থিত হইল। সুতরাং মুদ্রা যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি?

দীর্ঘনখ এইরূপে বক্তৃতা করিলে পর অন্যান্য ব্যাঘ্র মহাশয়েরা উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন। পরে সভাপতি অমিতোদর বলিতে লাগিলেন,—

"এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয়-কর্ম্মের সময় উপস্থিত। বিশেষ হরিণের পাল কখন্ আইসে, তাহার স্থিরতা কি? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কালহরণ কর্ত্তব্য নহে। বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে—এবং বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই বলিতে চাহি যে, আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা

শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন যে, মনুষ্য অতি অসভ্য পশু। আমরা অতি সভ্য পশু। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে, আমরা মনুষ্যগণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি, মনুষ্যদিগকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সুন্দরবনভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। বিশেষ মনুষ্যেরা সভ্য হইলে তাহাদের মাংস আরও কিছু সুস্বাদ হইতে পারে এবং তাহারা আরও সহজে ধরা দিতে পারে। কেন না, সভ্য হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, ব্যাঘ্রাদির আহারার্থ শরীর দান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এইরূপ সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই। অতএব আপনারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য যে, মনুষ্যদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন।"

সভাপতি মহাশয় এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া লাঙ্গুলচটচটার মধ্যে উপবেশন করিলেন, তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ-প্রদানানন্তর ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে যথায় পারিলেন, বিষয়কর্ম্মে প্রয়াণ করিলেন।

যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারিপার্শ্বে কতকগুলিন বড় বড় গাছ ছিল। কতকগুলিন বানর তদুপরি আরোহণ করিয়া, বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতা শুনিতেছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে একটি বানর মুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, "বলি ভায়া, ভালে আছ ?"

দ্বিতীয় বানর বলিল, "আজ্ঞে, আছি।"

প্রথম বানর। আইস, আমরা এই ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

দ্বি, বা। কেন ?

প্র, বা। এই বাঘেরা আমাদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।

দ্বি, বা। অবশ্য কর্ত্তব্য। কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে।

প্র, বা। আচ্ছা, তবে দেখ, বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত ?

দ্বি, বা। তথাপি আপনি একটু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন।

প্র, বা। সেই কথাই ভাল। নহিলে কি জানি, কোন্ দিন কোন্ বাঘের সম্মুখে পড়িব, আর ভোজন করিয়া ফেলিবে।

দ্বি, বা। বলুন কি দোষ ?

প্র, বা। প্রথম ব্যাকরণ অশুদ্ধ। আমরা বানরজাতি ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত। ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাঁদুরে ব্যাকরণের মত নহে।

দ্বি, বা। তার পর ?

প্র, বা। ইহাদের ভাষা বড় মন্দ।

দ্বি, বা। হাঁ, উহারা বাঁদুরে কথা কয় না।

প্র, বা। ঐ যে অমিতোদর বলিল, ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগকে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন, ইহা না বলিয়া যদি বলিত, অগ্রে মনুষ্যদিগকে ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন, তাহা হইলে সঙ্গত হইত।

দ্বি, বা। সন্দেহ কি,—নহিলে আমাদের বানর বলিবে কেন ?

প্র, বা। কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, তাহা উহারা জানে না। বক্তৃতার কিছু কিচমিচ করিতে হয়, কিছু লম্ফ ঝম্প করিতে হয়, দুই একবার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই একবার কদলী ভোজন করিতে হয়, উহাদের কর্ত্তব্য, আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয়।

দ্বি, বা। আমাদিগের কাছে শিক্ষা পাইলে উহারা বানর হইত, ব্যাঘ্র হইত না।

এমত সময়ে আরও কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উঠিল। এক বানর বলিল, "আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেকগুলিন নূতন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্ব্বলেখকদিগের চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে, তাহা নিতান্ত দূষ্য। আমরা বানরজাতি চিরকাল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া বানরলোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি—ব্যাঘ্রাচার্য্য যে তাহা করেন নাই, ইহা মহাপাপ।"

তখন রূপী বানর বলিয়া উঠিল, "আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি। আমি হাজার এক স্থানে বুঝিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, তাহা মহা দোষ বই আর কি ?"

আর একটি বানর কহিল, "আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পার না। কিন্তু আমি নানারকম মুখভঙ্গী করিতে পারি, এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রকাশ করিতে পারি।"

এইরূপে বানরের ব্যাঘ্রদিগের নিন্দাবাদে

প্রবৃত্ত রহিল। দেখিয়া এক স্থূলোদর বানর বলিল যে, "আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম, তাহাতে বুদ্ধলাঙ্গুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে। আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।"

ইংরাজস্তোত্র

(মহাভারত হইতে অনুবাদিত)

হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১॥

তুমি নানাগুণে বিভূষিত, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট, বহুল সম্পদ্‌যুক্ত, অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২॥

তুমি হর্ত্তা—শত্রুদলের, তুমি কর্ত্তা—আইন-আদির, তুমি বিধাতা—চাকরি প্রভৃতির। অতএব হে ইংরাজ। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৩॥

তুমি সমরে দিব্যাস্ত্রধারী, শীকারে বল্লমধারী, বিচারাগারে অর্দ্ধ-ইঞ্চি-পরিমিত ব্যাস-বিশিষ্ট বেত্রধারী, আহারে কাঁটা-চামচেধারী, অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৪॥

তুমি এক রূপে রাজপুরীমধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর, আর এক রূপে পণ্যবীথিকা-মধ্যে বাণিজ্য কর, আর এক রূপে কাছাড়ে চায় চাষ কর, অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৫॥

তোমার সত্ত্বগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ, তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ, তোমার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ।—অতএব হে ত্রিগুণাত্মক! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৬॥

তুমি আছ, এই জন্যই তুমি সৎ, তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিৎ এবং তুমি উমেদারবর্গের আনন্দ, অতএব হে সচ্চিদানন্দ! তোমাকে আমি প্রণাম করি। ৭॥

তুমি ব্রহ্মা, কেন না, তুমি প্রজাপতি, তুমি বিষ্ণু, কেন না, কমলা তোমার প্রতিই কৃপা করেন এবং তুমি মহেশ্বর, কেন না, তোমার গৃহিণী গৌরী। অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৮॥

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র, তুমি চন্দ্র, ইন্‌কম্ টেক্স তোমার কলঙ্ক; তুমি বায়ু, রেইলওয়ে তোমার গমন, তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৯॥

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইতেছে, তুমিই অগ্নি, কেন না, সব খাও, তুমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের। ১০॥

তুমিই বেদ, আর ঋক্‌যজুরাদি মানি না, তুমি স্মৃতি—মন্বাদি ভুলিয়া গিয়াছি, দর্শন, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি তোমারই হাত। অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১১॥

হে শ্বেতকান্ত! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-শুভ্র মহাশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব, অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১২॥

তোমার হরিতকপিশ, পিঙ্গললোহিত, কৃষ্ণশুভ্রাদি নানাবর্ণশোভিত, অতিযত্নরঞ্জিত, ভল্লুকমেদোমার্জ্জিত কুন্তলাবলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব, অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৩॥

তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গাবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া, পেণ্টুলন সেই ধড়া আর হুইপ সেই মোহন মুরলী—অতএব হে গোপীবল্লভ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৪॥

হে বরদ! আমাকে বর দাও। আমি শামলা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৫॥

হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমাকে খোসামদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার মন-রাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৬॥

হে মানদ! আমায় টাইটল্ দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও,—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৭॥

হে ভক্তবৎসল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—তোমার করস্পর্শে লোকমণ্ডলে মহামানাস্পদ হইতে বাসনা করি,—তোমার স্বহস্তলিখিত দুই একখানা পত্র বাক্সমধ্যে রাখিবার স্পর্দ্ধা করি—অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৮॥

হে অন্তর্যামিন্! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য! তুমি দাতা বলিবে

বলিয়া আমি দান করি, তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি, তুমি বিদ্বান্ বলিবে বলিয়া আমি লেখা-পড়া করি। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৯॥

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিস্পেন্সরি করিব, তোমার প্রীত্যর্থ স্কুল করিব, তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২০॥

হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব। আমি বুট পাণ্টলুন পরিব, নাকে চসমা দিব, কাঁটা-চামচ ধরিব, টেবিলে খাইব।— তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২১॥

হে মিষ্টভাষিন্! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব, পৈতৃকধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিব, বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২॥

হে সুভোজক! আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাঁউরুটি খাই; নিষিদ্ধ মাংস নহিলে আমার ভোজন হয় না, কুক্কুট আমার জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে চরণে রাখিও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৩॥

আমি বিধবার বিবাহ দিব, কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেন না, তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৪॥

হে সর্ব্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও,—সর্ব্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।২৫॥

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আটহোমে নিমন্ত্রণ কর, বড় বড় কমিটীর মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, জুষ্টিস কর, অনরারী-মাজিষ্ট্রেট কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৬॥

আমার স্পীচ শুন, আমার এসে পড়, আমার বাহবা দাও,—আমি তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি। ২৭॥

হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন, আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি মনে রাখিও, হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি। ২৮॥

বাবু

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে এক প্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর! আমি সেই বিচিত্রবুদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলী বাবুগণকে আখ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমি সেই চসমা-অলঙ্কৃত, উদারচরিত্র, বহুভাষী, সন্দেশপ্রিয় বাবুদিগের চরিত্র কীর্ত্তিত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন্! যাঁহারা চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল, এবং মহাপাদুক, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী, তাঁহারাইবাবু। মহারাজ! এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন। যাঁহাদিগের দশেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিশুদ্ধ, যাঁহাদিগের কেবল রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু। যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম, দুর্ব্বল হইলেও লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে সুপটু,—চর্ম্ম কোমল হইলেও সাগরপার-নির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহারসহিষ্ণু, যাঁহাদের ইন্দ্রিয়-মাত্রেই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জ্জন করিবেন, উপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু।

মহারাজ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে। যাঁহারা কলিযুগে ভারতবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট "বাবু" অর্থে কেরাণী বা বাজার-সরকার বুঝাইবে। নির্ধনদিগের নিকটে "বাবু" শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভৃত্যের নিকট "বাবু" অর্থে প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক্ কেবল বাবু-জন্মনির্ব্বাহাভিলাষী কতকগুলিন মনুষ্য জন্মিবেন। আমি কেবল

তাঁহাদিগেরই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। যিনি বিপরীতার্থ করিবেন, তাঁহার এই মহাভারত-শ্রবণ নিষ্ফল হইবে। তিনি গো-জন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন।

হে নরাধিপ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফাটিক পাত্র ইঁহাদিগের গণ্ডূষ। অগ্নি ইঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন—"তামাক" এবং "চুরুট" নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রিদিন ইঁহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন। ইঁহাদিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবেন এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের রথস্থ যুগল-প্রদীপে জ্বলিবেন। ইঁহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি "মদন-আগুন" এবং "মনাগুনরূপে" পরিণত হইবেন। বারবিলাসিনীদিগের মতে ইঁহাদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন। বায়ুকেই ইঁহারা ভক্ষণ করিবেন—ভদ্রতা করিয়া সেই দুষ্কর্ম কার্য্যের নাম রাখিবেন "বায়ুসেবন।"—চন্দ্র ইঁহাদের গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাকিবেন—কদাপি অবগুণ্ঠনাবৃত, কেহ প্রথমরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র, শেষরাত্রে শুক্লপক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ তদ্বিপরীত করিবেন। সূর্য্য ইঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন না। যম ইঁহাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন। কেবল অশ্বিনীকুমারদিগের মন্দিরের নাম হইবে "আস্তাবল।"

হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধ-কোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু। যিনি কাব্যের কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি বারযোষিতের চীৎকারমাত্রকে সঙ্গীত বিবেচনা করিবেন, যিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিবেন, তিনিই বাবু। যিনি রূপে কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্ম্মে জড়ভরত এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু। যিনি উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতী-পূজা করিবেন এবং পাঁঠার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই বাবু। যাঁহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান ব্রাণ্ডারস এবং আহার কদলীদগ্ধ, তিনিই বাবু। যিনি মহাদেবের তুল্য মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজাসিসৃক্ষু এবং বিষ্ণুর তুল্য লীলাপটু, তিনিই বাবু। হে কুরুকুলভূষণ! বিষ্ণুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সাদৃশ্য হইবে। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদের লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েই থাকিবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহারাও অনন্ত-শয্যা-শায়ী হইবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগের দশ অবতার—যথা কেরাণী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমীদার, সংবাদপত্র-সম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা। বিষ্ণু ন্যায় ইঁহারা সকল অবতারেই অমিতবল-পরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী, মাষ্টার অবতারে বধ্য ছাত্র, ষ্টেসন-মাষ্টার অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক, ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চালকলাপ্রত্যাশী পুরোহিত, মুৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক্ ইংরাজ, ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী; উকীল অবতারে বধ্য মোয়াক্কেল, হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী, জমীদার অবতারে বধ্য প্রজা, সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্ম্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।

মহারাজ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ "ন্যাশানেল থিয়েটার", তিনিই বাবু। যিনি মিসনরির নিকট খৃষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং মনিব সাহেবের গৃহে গলা-ধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে এবং রাগ কেবল সদ্গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহ তিনিই বাবু।

হে নরনাথ! আমি যাঁহাদিগের কথা বলিলাম, তাঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, আমরা তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া এবং

তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! বাবুদিগের জয় হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।

গর্দ্দভ

হে গর্দ্দভ! আমার প্রদত্ত এই নবীন তৃণ সকল ভোজন করুন।

আমি বহুযত্নে, গোবৎসাদির অগম্য প্রান্তর সকল হইতে, নবজলকণানিষেকস্নিগ্ধ তৃণাগ্রভাগ সকল আহরণ করিয়া আনিয়াছি, আপনি সুন্দর বদনমণ্ডলে গ্রহণ করিয়া, মুক্তানিন্দিত দন্তে ছেদনপূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপাবান্ হউন।

হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে, কেন না, অপনাকেই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, অতএব হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার পূজা গ্রহণ করুন।

আমি পূজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, নানাদেশে নানাস্থলে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি সর্ব্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করিতেছে। অতএব হে দীর্ঘকর্ণ! আমারও পূজা গ্রহণ করুন।

হে গর্দ্দভ! কে বলে, তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র? যেখানে সেখানে তোমারই বড় বিপদ্ দেখিয়া থাকি। তুমি উচ্চাসনে বসিয়া, স্তাবকগণে পরিবৃত হইয়া, মোটা মোটা ঘাসের আঁটি খাইয়া থাক। লোকে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে।

তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া, উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তিসুখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক।

হে বৃহন্মুণ্ড! তখন সেই কাব্যরসে আর্দ্রীভূত হইয়া, তুমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্ব্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্ব্বস্ব কানাইকে দাও, তোমার দয়ার পার নাই।

হে রজকগৃহভূষণ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্গুল সঙ্গোপন পূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া সরস্বতীমণ্ডপমধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দ্দভলোকপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গর্দ্দভলোকে প্রবেশ করিলে, "প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইল" বলিয়া মহা গর্জ্জন করিয়া থাক। শুনিয়া আমরা ভয় পাই।

হে প্রকাণ্ডোদর! তুমিই চতুষ্পাঠীমধ্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া, তৈলনিষিক্ত ললাটপ্রান্তরে চন্দনে নদী অঙ্কিত করিয়া, তুলটহস্তে শোভা পাও। তোমার কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি। অতএব হে মহাপশো! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাঙ্কুর ভোজন কর।

তোমারই প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা—তুমি নহিলে আর কাহারও প্রতি কমলার দয়া হয় না। তিনি তোমাকে কখনও ত্যাগ করেন না, কিন্তু তুমি তাঁহাকে বুদ্ধির গুণে সর্ব্বদাই ত্যাগ করিয়া থাক। এই জন্যই লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য কলঙ্ক। অতএব হে সুপুচ্ছ! তৃণভোজন কর।

তুমিই গায়ক। ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্তস্বরই তোমার কণ্ঠে। অন্যে বহুকাল তোমার অনুকরণ করিয়া, দীর্ঘশ্মশ্রু রাখিয়া, অনেক প্রকার কাসি অভ্যাস করিয়া, তোমার মত স্বর পাইয়া থাকে। হে ভৈরবকণ্ঠ! ঘাস খাও।

তুমি বহুকাল হইতে পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছ। তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নহিলে রাম বনে যাইবেন কেন? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, নহিলে পাশায় স্ত্রী হারিবেন কেন? তুমি কলিযুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেন রাজা ছিলে,—নহিলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন?

তুমি নানারূপে নানা দেশ আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যাবলে, ব্রহ্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে লোমশাবতার! আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর সকল ভক্ষণ কর, আমি আহ্লাদিত হইব।

হে মহাপৃষ্ঠ! তুমি কখনও রাজ্যের ভার বহ, কখন পুস্তকের ভার বহ, কখন ধোপার গাঁটরি বহ। হে লোমশ! কোন্‌টি গুরুভার, আমায় বলিয়া দাও।

তুমি কখন ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থকারের মাথা খাও, হে লোমশ! কোন্‌টি সুভক্ষ্য, অর্ব্বাচীনকে বলিয়া দাও।

হে সুন্দর! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। তুমি যখন গাছতলায় দাঁড়াইয়া নববর্ষাসারসিক্ত হইতে থাক, দুই মহাকর্ণ

উর্দ্ধোত্থিত করিয়া, মুখচন্দ্র বিনত করিয়া, চক্ষু দুটি ক্ষণে মুদ্রিত, ক্ষণে উন্মেষিত করিতে করিতে ভিজিতে থাক,—তোমার পৃষ্ঠে, মুণ্ডে এবং স্কন্ধে বসুধারা বহিতে থাকে, তখন তোমাকে আমি বড় সুন্দর দেখি। হে লোকমনোমোহন! কিছু ঘাস খাও।

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এ জন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই, এ জন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই, এ জন্য তুমি বিদ্বান্ এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এ জন্য তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশোগান করিতেছি, ঘাস খাইয়া সুখী হও।

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন

আমরা স্ত্রীজাতি, নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া আজকালি আমাদিগের উপর বড় অত্যাচার হইতেছে। পুরুষের এক্ষণে বড় স্পর্দ্ধা হইতেছে, ভর্ত্তৃগণ স্ত্রীকে আর মানে না, স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন স্বত্ব সকল লুপ্ত হইতেছে, কেহই আর স্ত্রীর আজ্ঞার বশবর্ত্তী নহে। এই সকল বিষয়ের সুনিয়ম করিবার জন্য আমরা স্ত্রীস্বত্বরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত করিয়াছি। সে সভার পরিচয় যদি সাধারণে সবিশেষ অবগত না থাকেন, তবে তাহার বিজ্ঞাপনী পশ্চাৎ প্রকাশ করিব। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের স্বত্বরক্ষার্থ সভা হইতে একটি বিশেষ সদুপায় হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছি এবং তৎসমভিব্যাহারে ভর্ত্তৃশাসনার্থ একটি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছি।

সকলের স্বত্বরক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে আমাদিগের চিরন্তন স্বত্বরক্ষার্থ কোন আইন হয় না কেন? অতএব এই আইন সত্বরে পাশ হইবে, এই কামনায় স্বামিগণকে অবগত করিবার জন্য আমি তাহা বঙ্গদর্শনে প্রচার করিলাম। অনেক বাবুলোক বাঙ্গালাতে আইন ভাল বুঝিতে পারেন না, বিশেষতঃ আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ সচরাচর ভাল হয় না এবং আইন আদৌ ইংরাজিতেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং ইহার অনুবাদটি ভাল হয় নাই, স্থানে স্থানে ইংরাজির সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে, অতএব আমরা ইংরাজি বাঙ্গালা দুই পাঠাইলাম। ভরসা করি, বঙ্গদর্শনকারক একবার আমাদিগের অনুরোধে ইংরাজির প্রতি বিরাগ ত্যাগ করিয়া ইংরাজিসমেত এই আইন প্রচার করিবেন। সকলে দেখিবেন যে, এই আইনটিতে নূতন কিছু নাই, সাবেক Lex Nor Scripta কেবল লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র।

শ্রীমতী অনৃতসুন্দরী দাসী।
স্ত্রীস্বত্বরক্ষিণী সভার সম্পাদিকা।

THE MATRIMONIAL PENAL CODE

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন

CHAPTER I.

INTRODUCTION.

Where as it is expedient to provide a Special Penal Code for the coercion of refractory husbands and others who disputet he supreme authority of woman, it is hereby enacted as follows :

I. This Act shall be entitled the 'Matrimonial Penal Code' and shall take effect on all natives of India in the married state.

প্রথম অধ্যায়।

স্ত্রীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির সুশাসনের জন্ত বিশেষ আইন করা উচিত, এই কারণে নিম্নের লিখিতমত আইন করা গেল।

১ ধারা। এই আইন "দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন" নামে খ্যাত হইবে। ভারতবর্ষীয় যে কোন দেশী বিবাহিত পুরুষের উপর ইহার বিধান খাটিবে।

CHAPTER II.

DEFINITIONS.

2. A husband is a piece of moving and movable property at the absolute disposal of a woman.

দ্বিতীয় অধ্যায়,—সাধারণ ব্যাখ্যা।

২ ধারা। যে কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে স্বামী বলা যায়।

ILLUSTRATIONS.

(a) A Trunk or a work-box is not a husband as it is not a moving, though a movable piece of property.

উদাহরণ।

(ক) বাক্স, তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না, যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল নহে।

(b) cattle are not husbands, for though capable of locomotion, they are not at the absolute disposal of any woman, as they often display a will of their own.

(খ) গোরু-বাছুরও স্বামী নহে, কেন না, যদিও গোরু-বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদের একটু স্বেচ্ছামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাহারা কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন নহে।

(c) Men in the married state, having no will of their own, are husbands.

(গ) বিবাহিত পুরুষেরাই স্বেচ্ছাধীন কোন কার্য্য করিতে পারেন না, এজন্ত গোরু-বাছুরকে স্বামী না বলিয়া তাঁহাদিগকেই স্বামী বলা যাইতে পারে।

3. A wife is a woman having the right of property in a husband.

৩ ধারা। যে স্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বলিয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী।

EXPLANATION.

The right of property includes the right of flagellation.

অর্থের কথা।

সম্পত্তি বলিয়া যাহার উপর স্বত্বাধিকার থাকে, তাহার মারপিট করিবারও স্বত্বাধিকার থাকিবে।

4. "The married state" is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.

৪ ধারা। পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের জন্ত পুরুষের প্রায়শ্চিত্তবিশেষকে বিবাহ বলে।

CHAPTER III.

OF PUNISHMENTS.

5. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are :—

তৃতীয় অধ্যায়,—দণ্ডের কথা।

৫ ধারা। এই আইনের বিধানমতে অপরাধীদিগের নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে :—

FIRST, IMPRISONMENT.

Which may be either within the four walls of a bed-room, or within the four walls of a house.

প্রথম। কয়েদ।

অর্থাৎ শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ। অথবা বাটীর চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ।

Imprisonment is of two descriptions, namely,

কয়েদ দুই প্রকার।

(1) Rigorous, that is, accompanied by hard words.

(১) কঠিন তিরস্কারের সহিত।

(2) Simple.

(২) বিনা তিরস্কার।

SECONDLY Transportation. that is to another bed-room.

দ্বিতীয়। শয্যান্তর প্রেরণ বা শয্যাগৃহান্তর প্রেরণ।

THIRDLY. Matrimonial servitude.

তৃতীয়। পত্নীর দাসত্ব।

FOURTHLY. Forfeiture of Pocket-money.

চতুর্থ। সম্পত্তিদণ্ড, অর্থাৎ নিজখরচের টাকা বন্ধ।

6. "Capital punishment" under this code, means that the wife shall run away to her peternal roof, or to some of other friendly house, with the intention of not returning in a hurry.

৬ ধারা। এই আইনে "প্রাণদণ্ড" অর্থে বুঝাইবে যে, স্ত্রী বাপের বাড়ী কি ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া যাইবেন, শীঘ্র আসিতে চাহিবেন না।

7. The following punishments are also provided for minor offences.

৭ ধারা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের জন্ত নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে।

FIRST. Contemptuous silence on the part of the wife.

প্রথম। মান।

SECONDLY. Frowns,

দ্বিতীয়। ভ্রূকুটী।

THIRDLY. Tears and lamentation,

তৃতীয়। অশ্রুবর্ষণ বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন।

FOURTHLY, Scolding and abuse,

চতুর্থ। গালি, তিরস্কার।

CHAPTER IV.

GENERAL EXCEPTION.

8. Nothing is an offence which is done by a wife,

চতুর্থ অধ্যায়,—সাধারণ বর্জ্জিত কথা।

৮ ধারা। স্ত্রীকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

9. Nothing is an offence which is done by a husband in obedience to the commands of a wife.

৯ ধারা। স্ত্রীর আজ্ঞানুসারে স্বামিকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

10. No person in the married state shall be entitled to plead any other circumstances as grounds of exemption from the provisions of the Matrimonial Penal Code.

১০ ধারা। ইহা ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার ওজর করিয়া কোন বিবাহিত পুরুষ বলিতে পারিবেন না যে, আমি দাম্পত্য-দণ্ডবিধির আইনানুসারে দণ্ডনীয় নই।

CHAPTER V.

OF ABETMENT,

11. A person abets the doing of a matrimonial offence who,

পঞ্চম অধ্যায়,—অপরাধের সহায়তার বিধি।

১১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি—

FIRST. Instigates persuades, induces or encourages a husband to commit that offence.

প্রথম। অন্য ব্যক্তিকে কোন দাম্পত্য অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেয়, বা উৎসাহিত বা উত্যক্ত করে।

SECONDLY Joins him in the commission of that offence, or keeps him company during its commission.

দ্বিতীয়। বা তৎসঙ্গে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে তাহার সঙ্গে থাকে। তবে বলা যায় যে, ঐ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে।

XPLANATION

A man not in the married state or even a woman, may be abettor.

অর্থের কথা।

অবিবাহিত পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকেও দাম্পত্য-অপরাধের সহায়তা করিতে পারে।

ILLUSTRATIONS.

(a) A the husland of B, and C, an unmarried man drink together. Drinking is matrimonial offence, C has abetted A.

উদাহরণ।

(ক) রাম কামিনীর স্বামী, যদু অবিবাহিত পুরুষ, উভয়ে একত্রে মদ্যপান করিল। মদ্যপান একটি দাম্পত্য অপরাধ। যদু রামের সহায়তা করিয়াছে।

(b) A the mother of B, the husband of C, persuades B to spend money in other ways than those which C approves. As spending money in such ways is a matrimonial offence, A has abetted B.

(খ) হরমণি রামের মা। রাম কামিনীর স্বামী। কামিনী যেরূপে টাকা খরচ করিতে বলে, সেরূপে খরচ না করিয়া রাম হরমণির পরামর্শে অন্য প্রকার খরচ করিল। স্ত্রীর অনভিমত খরচ করা একটি দাম্পত্য অপরাধ। হরমণি তাহার সহায়তা করিয়াছে।

12. When a man in the married state abets another man in the married state in a matrimonial offence, the abettor is liable to the same punishment as the principal. Provided that he can be so punished only by a competent court.

১২ ধারা। যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধে অন্য বিবাহিত পুরুষের সহায়তা করে, তবে সে আসল অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয়। কিন্তু তাহার দণ্ড উপযুক্ত আদালত নহিলে হইবে না।

EXPLANATION.

A competent court means the wife having right of property in the offending husband.

অর্থের কথা।

ঐ ব্যক্তি যে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রীকেই উপযুক্ত আদালত বলা যায়।

13. Abettors who are females or male offenders not in the married state are liable to be punished only with scolding, abuse, frowns, tears and lamentations.

১৩ ধারা। স্ত্রীলোক বা অবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিলে, তিরস্কার, ভ্রূকুটী, এবং অশ্রুবর্ষণ ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র।

CHAPTER VI.

OF OFFENCES AGAINST THE STATE.

14. The "State" shall in this code mean the married state only.

ষষ্ঠ অধ্যায়,—স্ত্রী-বিদ্রোহিতার অপরাধ।

১৪ ধারা। (অনুবাদক অক্ষম)

15. Whoever wages war against his wife or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished capitally, that is by separation, or by transportaion to another bed-room and shall forfeit all his pocket-money.

১৫ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে, কি বিবাদ করিতে উদ্যোগ করে, কি বিবাদ করায় সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে (অর্থাৎ স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিবেন) বা শয্যা গৃহ পৃথক হইবে এবং তাহার খরচের টাকা বন্ধ হইবে।

16. Whoever induces friends or gains over children to side with him or otherwise prepares to wage war with the intention of waging war against the wife shall be punished by transportation to another bed-room and shall also be liable to be punished with scolding and with tears and lamentations,

১৬ ধারা। যে কেহ বন্ধুবর্গকে মুরুব্বি ধরিয়া বা সন্তানদিগকে বশীভূত করিয়া বা অন্য প্রকারে স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাদের উদ্যোগ করে, সে শয্যাগৃহান্তরে প্রেরিত হইবে এবং তিরস্কার, অশ্রুবর্ষণ এবং রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

17, Whoever shall render allegiance to any woman other than his wife, shall be guilty of incontinence,

১৭। যে কেহ আপন স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত, তাহার নাম লাম্পট্য।

EXPLANATION.

(1) To show the slightest kindness to a young woman who is not the wife, is to render such young woman allegiance

অর্থের কথা।

প্রথম। স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য করিলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে।

ILLUSTRATION.

A is the husband of B, and C is a young woman, A likes C's baby because he is a nice child and gives him buns to eat, A has rendered allegiance to C.

উদাহরণ।

রাম কামিনীর স্বামী। বামা অন্য এক যুবতী। বামার শিশু সন্তানটি দেখিতে সুন্দর বলিয়া রাম তাহাকে আদর করে বা তাহার হাতে মিঠাই দেয়। রাম বামার প্রতি আসক্ত।

EXPLANATION.

(2) Wives shall be entitled to imagine offences under this section and no husband shall be entitled to be acquitted on the ground that he has not committed the offence,

The simple accusation shall always be held to be conclusive proof of the offence,

অর্থের কথা।

দ্বিতীয়। স্বামীদিগকে নিকারণে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করা স্ত্রীলোকদিগের অধিকার রহিল। আমি এ অপরাধ করি নাই বলিয়া কোন স্বামী খালাস পাইতে পারিবে না।

"অপরাধ করিয়াছে" বলিলেই এ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হইবে।

EXPLANATION.

(3) The right of imagining offences under this section shall be held to belong in general to old wives, and to women with old and ugly husbands; and a young wife shall not be entitled to assume the right unless she can prove that she has a particularly cross temper, or was brought up a spoilt child or is herself supremely ugly.

18. Whoever is guilty of incontinence shall be liable to all the punishments mentioned in this code and to other punishments not mentioned in the Code,

অর্থের কথা।

তৃতীয়। নিকারণে স্বামিগণকে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিবার অধিকার, প্রাচীনা স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষরূপে বর্ত্তিবে, অথবা যাহাদিগের স্বামী কুৎসিত বা প্রাচীন, তাহাদিগের পক্ষে বর্ত্তিবে। যদি কোন যুবতী স্ত্রী এ অধিকার চাহেন, তবে তাঁহাকে অগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি নিজে বদমেজাজি, আদুরে মেয়ে বা তিনি নিজে কদাকারা।

১৮। যে কেহ লম্পট হইবে, সে এই আইনের

নিষিদ্ধ সকল প্রকার দণ্ডের ;যাহা দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার অন্ত দণ্ডও হইতে পারিবে।

CHAPTER VII.

OF OFFENCES RELATING TO THE ARMY AND NAVY

19. The army and navy shall in this code mean the sons and the daughters and daughters-in law,

সপ্তম অধ্যায়।

পল্টন এবং নাবিকসেনা সম্বন্ধীয় অপরাধ।

১৯ ধারা। এ আইনে পল্টন অর্থে ছেলের দল। নাবিক সেনা ঝি-বউ।

20. Whoever abets the committing of mutiny by a son or a daughter or a daughter-in-law shall be liable to be punished by scolding, and tears and lamentations,

২০ ধারা। যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধূ কর্তৃক গৃহিণীর প্রতি বিদ্রোহিতায় সহায়তা করিবে, সে তিরস্কার ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

CHAPTER VIII

OF OFFENCES AGAINST THE DOMESTIC TRANQUILITY

21. An assembly of two or more husbands is designated an unlawful assembly if the common object of such husbands is,

অষ্টম অধ্যায়—গৃহমধ্যে শান্তিভঙ্গনের অপরাধ।

২১ ধারা। দুই কি তাহার অধিক বিবাহিত ব্যক্তির জনতা হইলে যদি জনতাকারীদের নিম্নের লিখিত কোন অভিপ্রায় থাকে, তবে 'বে-আইনি জনতা" বলা যায়।

FIRST, To drink as defined below or to gamble or to commit any other matrimonial offence.

প্রথম। যদি মদ্যপান করা কি অন্য প্রকার দাম্পত্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায় থাকে।

SECONDLY. To overawe by show of authority their wives from the exercise of the lawful authority of such wives.

দ্বিতীয়। যদি আস্ফালন দ্বারা পত্নীদিগকে আইনমত ক্ষমতা-প্রকাশকরণে নিবৃত্ত করার জন্য ভয়প্রদর্শন করার অভিপ্রায় থাকে।

THIRDLY, To resist the execution of a wife's order,

তৃতীয়। যদি কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কর্মের প্রতিবন্ধক হইবার অভিপ্রায় থাকে।

22. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished by imprisonment with hard words and shall also be liable to contemptuous silence or to scolding.

২২ ধারা। যে কেহ বে-আইন জনতার ব্যক্তি হয়, সে কঠিন তিরস্কারের সহিত কয়েদ হইবে, অথবা মান অথবা তিরস্কারের সহিত দণ্ডনীয় হইবে।

OF DRINKING WINE AND SPIRITS

23. Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel is wine and spirit,

মদ্যপানের কথা।

২৩ ধারা। যে কোন জলবৎ দ্রব্য বোতলে থাকে এবং কাচের পাত্রে পীত হয়, তাহা মদ্য।

24. Whoever has in his prosession wine and spirits as above defined is said to drink,

২৪ ধারা। উক্তরূপ মদ্য যে ঘরে রাখে, সেই মদ্যপায়ী।

EXPLANATION

He is said to drink even though he never touch the liquid himself.

অর্থের কথা।

সে ঐ দ্রব্য হস্তে স্পর্শ না করিলেও মদ্যপায়ী।

25. Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprisonment of either description within the four walls of a bed-room during the evening hours and shall also be liable to scolding.

২৫ ধারা। যে মদ্যপায়ী, সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ থাকিবে এবং তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

OF RIOTING

26. Whoever shall speak in an ungentle voice to his wife shall be guilty of domestic rioting,

২৬ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর প্রতি কর্কশস্বরে কথা কহে, সে হাঙ্গামা করে।

27. Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished by contemptuous silence or by scolding or by tears and lamentation,

২৭ ধারা। যে কেহ গৃহমধ্যে হাঙ্গামা করিবে, তাহার সাজা মান বা তিরস্কার বা অশ্রুবর্ষণ ও রোদন।

বসন্ত ও বিরহ

। সখি, ঋতুরাজ বসন্ত আসি ধরায় উদয় হইয়াছেন। আইস, আমরা বসন্তবর্ণনা করি। বিশেষ আমরা উভয়েই বিরহিণী, পূর্ব্বগামিনী বিরহিণীগণ চিরকাল বসন্তবর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন, আইস, আমরাও তাই করি।

বামী। সই, ভাল বলিয়াছ। আমরা বালিকা-বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শিখিয়া কেবল কুটনো কুটিয়া মরিলাম, আইস, অদ্য কাব্যালোচনা করি।

রামী। সই! তবে আরম্ভ করি। সখি! ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হইয়াছে। দেখ, পৃথিবী কেমন অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছেন! দেখ, চুতলতা কেমন নব মুকুলিত—

বামী। বৃক্ষে বৃক্ষে সজিনা-খাড়া বিলম্বিত—

রামী। মলয়মারুত মৃদু মৃদু প্রবাহিত—

বামী। তদ্বাহিত ধূলায় নত্ত কিচকিচিত।

রামী। দূর ছুঁড়ি—ও কি! শোন্। ভ্রমরগণ পুষ্পের উপর গুণ গুণ করিতেছে—

বামী। মাছিগণ ডালের উপর ভন্ ভন্ করিতেছে—

রামী। বৃক্ষোপরে কোকিলগণ পঞ্চমস্বরে কুহু কুহু করিতেছে—

বামী। না ভাই, তোকে নিয়ে বসন্তবর্ণন হয় না। আমি শ্যামীকে ডাকি। আয় সই শ্যামি, আমরা বসন্ত বর্ণনা করি।

(শ্যামী আসিল)

শ্যামী। আমি ত সখি তোমাদের মত ভাল লেখা-পড়া জানি নি; একটু একটু জানি মাত্র। আমি সকল বুঝিতে পারিব না—আমাকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে হবে।

বামী। আচ্ছা! দেখ দেখি, বসন্ত কি অপূর্ব্ব সময়! কেমন চুতলতা সকল নব মুকুলিত—

শ্যামী। সই, আঁবের গাছই দেখিয়াছি; আঁবের লতা কোন্‌গুলা?

বামী। আঁবের লতা শুনিয়াছি, কিন্তু কখন চক্ষে দেখি নাই। দেখি না দেখি, চুতলতা ভিন্ন চুত-বৃক্ষ কখন পড়ি নাই। তবে চুতলতাই বলিতে হইবে, চুতবৃক্ষ বলা হইবে না।

শ্যামী। তবে বল।

বামী। চুত-লতিকা নবমুকুলিত হইয়া—

শ্যামী। সই! এই বলিলে চুতলতা—আবার লতিকা হইল কেন?

বামী। আরও কিছু মিষ্ট হইল। চুত-লতিকা নব মুকুলিত হইয়া চারিদিকে সৌগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে—

রামী। ভাই, আঁবের বোল যে বসন্তকালে চুঁইয়ে গিয়া করেয়া ধরে।

শ্যামী। বলিলে কি হয়, কেমন মিষ্ট হইল দেখ দেখি।

রামী। তাহাতে ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে শুনিয়া আমাদিগের প্রাণ বাহির হইতেছে।

শ্যামী। আহা, সখি, সত্যই বলিয়াছ। সই, ভ্রমর কাকে বলে?

রামী। মর্ নেকি, তাও জানিসনে? ভ্রমর বলে ভোমরাকে।

শ্যামী। ভোমরা কোন্‌গুলা ভাই?

রামী। ভোমরা বলে ভীমরুলকে।

শ্যামী। তা ভাই, ভীমরুল আঁবের বোল.

দেখে পাগল হয় কেন? ভীমরুলের পাগলামি কেমনতর? ওরা কি আবোল-তাবোল বকে?

রামী। কে বলেছে পাগল হয়?

বামী। ঐ যে তুমি বলিলে "উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে।"

রামী। কোন্ পাজী আর তোদের কাছে বসন্তবর্ণনা করিবে!

বামী। ভাই, রাগ কর কেন? তুমি বেশী লেখা-পড়া শিখেছ, আমি কম শিখেছি—আমায় বুঝাইয়া দিলেই ত হয়। সকলেই কি তোমার মত রসিকে?

রামী। (সাহঙ্কারে) আচ্ছা, তবে শোন্। ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে। তাহাদিগের গুণ গুণ রবে আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে।

বামী। সই, ভোমরার ডাক "গুণ্ গুণ্" না "ভোঁ ভোঁ?"

রামী। কবিরা বলেন "গুণ গুণ।"

বামী। তবে গুণ গুণই বটে। তা উহাতে আমাদের প্রাণ বাহির হয় কেন? ভীমরুল কামড়াইলে প্রাণ বাহির হয় জানি, কিন্তু ভীমরুল ডাকিলেও কি মরিতে হইবে?

রামী। এ পর্য্যন্ত সকল বিরহিণীগণ গুণ গুণ রবে মরিয়া আসিতেছে; তুই কি পীর যে, মরিবি না?

বামী। আচ্ছা ভাই, শাস্ত্রে যদি লেখে ত না হয় মরিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল কি ভীমরুলের ডাকে মরিতে হইবে, না বোল্‌তা, মৌমাছি, গুবরে পোকার ডাক শুনিলেও অন্তর্জলে শুইব?

রামী। কবিরা শুধু ভ্রমরের রবেই মরিতে বলেন।

বামী। কবিদের বড় অবিচার। কেন, গুবরে পোকা কি অপরাধ করেছে?

রামী। তোর মরতে হয় মরিস্, এখন শোন্।

বামী। বল।

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে।

বামী। পঞ্চম স্বর কি ভাই?

রামী। কোকিলের স্বরের মত।

বামী। আর কোকিলের স্বর কেমন?

রামী। পঞ্চম স্বরের মত।

বামী। বুঝিয়াছি। তার পর বল।

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে; তাহাতে বিরহিণীর অঙ্গ জরজর হইতেছে।

বামী। কুঁকড়োর পঞ্চম স্বরে অঙ্গ কেমন করে?

রামী। মরণ আর কি, কুঁকড়োর আবার পঞ্চম স্বর কি লো?

বামী। আমার তাতেই অঙ্গ জরজর হয়। কুঁকড়া ডাকিলেই মনে হয় যে, তিনি বাড়ী এলেই আমায় ঐ সর্ব্বনেশে পাখী রাঁধিয়া দিতে হবে।

রামী। তার পর মলয়-সমীরণ। মৃদু মৃদু মলয়-সমীরণে বিরহিণী শিহরিয়া উঠিতেছে।

বামী। শীতে?

রামী। না—বিরহে। মলয়-সমীরণ অন্যের পক্ষে শীতল, কিন্তু আমাদের পক্ষে অগ্নিতুল্য।

বামী। সই, তা সকলের পক্ষেই। এই চৈত্র মাসের দুপুরে রৌদ্রের বাতাস আগুনের হল্কা বলিয়া কাহার বোধ হয় না?

রামী। ওলো, আমি সে বাতাসের কথা বলিতেছি না।

বামী। বোধ হয়, তুমি উত্তুরে বাতাসের কথা বলিতেছ। উত্তুরে বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, মলয়-বাতাস তেমন নয়।

রামী। বসন্তানিলস্পর্শে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

বামী। গায়ে কাপড় না থাকিলে উত্তুরে বাতাসেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

রামী। মর্ ছুঁড়ি, বসন্তকালে কি উত্তুরে বাতাস বয় যে, আমি বসন্তবর্ণনায় উত্তুরে বাতাসের কথা বলিব?

বামী। উত্তুরে বাতাসই এখন বয়। দেখ, এখনকার যত ঝড় সব উত্তুরে। আমার বোধ হয়, বসন্তবর্ণনে উত্তুরে বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত। আইস, আমরা বঙ্গদর্শনে লিখিয়া পাঠাই যে, ভবিষ্যতে কবিগণ বসন্তবর্ণনে মলয় বাতাস ত্যাগ করিয়া উত্তুরে ঝড়ের বর্ণনা করেন।

রামী। তাহা হইলে বিরহীদের কি উপায় হইবে? তাঁহারা কি লইয়া কাঁদিবেন?

বামী। সখি, তবে থাক একণে তোমার বসন্তবর্ণনা—উহুঃ উহুঃ সখি! মোলেম, মোলেম! গেলেম রে! গেলেম রে!

(ভূমে পতন, চক্ষু মুদ্রিত)

রামী। কেন কেন, সই, কি হয়েছে? হঠাৎ অমন হ'লে কেন?

শ্যামা। (চক্ষু মুদিয়া) ঐ শুনিছে না? ঐ সেওড়াগাছে কোকিল ডাকিতেছে।

রামী। সখি, আকুলা হও, আকুলা হও,—তোমার প্রাণকান্ত শীঘ্রই আসিবেন। সই, আমারও ঐরূপ যন্ত্রণা হইতেছে। ন্যাথের সন্দর্শন ভিন্ন আমার বাঁচা ভার হইয়াছে। (চক্ষু মুছিয়া) পাড়ার সকল পুকুরের যদি জল না শুকাইত, তবে এত দিন ডুবিয়া মরিতাম। হে হৃদয়বল্লভ, জীবিতেশ্বর! হে রমণীজনমনোমোহন! হে নিশাশেষোন্মেষোন্মুখ-কমল-কোরকোপমোত্তেজিতহৃদয়সূর্য্য! হে অতল-জলদ-তলস্থত-রত্ন-রাজিবমহামূল্য-পুরুষ-রত্ন! হে কামিনীকণ্ঠবিলম্বিতরত্নহারাধিক প্রাণাধিক! আর প্রাণ বাঁচে না। আমি অবলা, সরলা, চঞ্চলা, বিকলা, দীনা, হীনা, ক্ষীণা, পীনা, নবীনা, শ্রীহীনা—আর প্রাণ বাঁচে না। আর কত দিন তোমার আশাপথ চাহিয়া থাকিব? যেমন সরোবরে সরোজিনী ভানুর আশা করে, যেমন কুমুদিনী কুমুদবান্ধবের আশা করিয়া থাকে, যেমন চাতক মেঘের আশা করিয়া থাকে—আমি তেমনি তোমার আশা করিতেছি।

শ্যামা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) যেমন রাখাল হারান গোরুর আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন বালকে ময়রার দোকান হইতে লোক ফিরিবার আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন অশ্ব তৃণহারক গ্রাসকটের আশা করিয়া থাকে, হে প্রাণবন্ধো! আমি তেমনি তোমার আশা করিয়া আছি। যেমন মাছ ধুইতে গেলে পরিচারিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মার্জ্জার গমন করে, তেমনি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার মন গিয়াছে। যেমন উচ্ছিষ্টাবশেষ ফেলিতে গেলে বুভুক্ষু কুক্কুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, আমার অবশ চিত্ত তেমনি তোমার পশ্চাৎ গিয়াছে। যেমন কলুর ঘানিগাছে প্রকাণ্ডাকার বলদ ঘুরিতে থাকে, তেমনি আশা নামে আমার প্রকাণ্ড বলদ তোমার প্রণয়রূপ ঘানিগাছে ঘুরিতেছে। যেমন লোহার চাটুতে তপ্ত তৈলে কৈমাছ ভাজে, তেমনি তোমার বিরহ চাটুতে বসন্ত-রূপ তপ্ত তৈলে আমার হৃদয়রূপ কই-মাছকে অহ-রহঃ ভাজিতেছে। যেমন এই বসন্তকালের তাপে সজিনা-খাড়া কাটিতেছে, তোমার বিরহসন্তাপে তেমনি আমার হৃদয়-খাড়া কাটিতেছে। যেমন এক ঝাপটে যোড়া গরু ঘুড়িয়া ক্ষেত্রকে চাষা ক্ষত-বিক্ষত করে, তেমনি এক প্রেমঝাপটে বিরহ এবং মুরলীধ্বনিরূপ যোড়া-গরু ঘুড়িয়া আমার খাদী চাষা আমার হৃদয়-ক্ষেত্রকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন। কথায় আর কি বলিব। বিরহের জ্বালায় আমার ডালে নুণ হয় না, পানে চুণ হয় না, ঝোলে ঝাল হয় না, ক্ষীরে মিষ্টি হয় না। সখি, বিরহের দুঃখ যে দিন মনে হয়, সে দিন আমি তিন বেলা বই খাইতে পারি না, আমার দুধের বাটি অমনি পড়িয়া থাকে। (চক্ষু মুছিয়া) সখি, তোমার বসন্ত-বর্ণনা সমাপ্ত কর, দুঃখের কথায় আর কাজ নাই।

রামী। আমার বসন্ত-বর্ণনা শেষ হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, মলয়-মারুত এবং বিরহ এই চারিটির কথাই বলিয়াছি, আর বাকি কি?

বামী। দড়ি আর কলসী।

সুবর্ণ-গোলক

কৈলাস-শিখরে নবমুকুলশোভিত দেবদারু-তলায় শার্দ্দূলচর্ম্মাসনে বসিয়া হরপার্ব্বতী পাশা খেলিতেছিলেন। বাজি একটি স্বর্ণ-গোলক। মহা-দেবের খেলায় দোষ এই—আড়ি মারিতে পারেন না—তাহা পারিলে সমুদ্রমন্থনের সময় বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়িত না। গৌরী আড়ি মারিতে পটু—প্রমাণ পৃথিবীতে তাঁহার তিন দিন পূজা। আর খেলায় যত হউক না হউক, কান্নাইয়ে অদ্বিতীয়া, কেন না, তিনিই আদ্যাশক্তি! মহা-দেবের ভাল দান পড়িলে কাঁদিয়া হাট বাধান—আপনার যদি পড়ে পাঁচ দুই সাত, তবে হাঁকেন পোয়া বারো। হাঁকিয়া তিন চক্ষে মহাদেবের প্রতি কটাক্ষ করেন—যে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে, দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি।

তখন মহাদেব পার্ব্বতীকে সেই কাঞ্চন-গোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া পঞ্চানন ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন, "আমার প্রদত্ত গোলক ত্যাগ করিলে কেন?"

উমা কহিলেন, "প্রভো, আপনার গোলক অবশ্য কোন অপূর্ব্ব শক্তিবিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি।"

গিরিশ বলিলেন, "ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু এবং আমি এই তিন জনে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ

করিয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতেছি, তাহার ব্যতিক্রমে কখন মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল হইবার, তাহা সেই সকল নিয়মাবলীর বলেই ঘটিবে। কাঞ্চনগোলকের কোন প্রয়োজন নাই। যদি ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়মভঙ্গদোষে লোকের অনিষ্ট হইবে। তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম। বসিয়া উহার কার্য্য দর্শন কর।"

কালীকান্ত বসু বড় বাবু। বয়স বৎসর পঁচিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ। কয় বৎসর হইল, পূর্ব্বোক্ত দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। তাঁহার পত্নী তাহার পিতৃভবনে ছিল। কালীকান্ত বাবু স্ত্রীর সম্ভাষণে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলেন। শ্বশুর বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি—গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রামে বাস। কালীকান্ত ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমাণ্টো বহিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে কালীকান্ত বাবু দেখিলেন, একটি স্বর্ণগোলক পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন, দেখিলেন, স্বর্ণ বটে। প্রীত হইয়া তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন। বলিলেন, "এটা সোনার দেখিতেছি, কেহ হারাইয়া থাকিবে। যদি কেহ খোঁজ করে, বাহির করিয়া দিব। নহিলে বাড়ী লইয়া যাইব। এখন রাখ।"

রামা বস্ত্রমধ্যে গোলকটি লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে পথে পোর্টমাণ্টো নামাইল। পরে কালীকান্ত বাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইল।

কিন্তু রামা আর পোর্টমাণ্টো মাথায় তুলিল না। কালীকান্ত বাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন। রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন রামা বলিল, "ওরে রামা!"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞা!" রামা বলিল, "তুই বড় বে-আদব, দেখিস্ যেন আমার শ্বশুরবাড়ী গিয়া বে-আদবি করিস্ না। তাহারা ভদ্রলোক।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে, তা কি পারি? আপনি হচ্ছেন মুনিব—আপনার কাছে কি বে-আদবি করিতে পারি?"

* * *

কৈলাসে গৌরী বলিলেন, "প্রভো, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার স্বর্ণগোলকের কি গুণ এ?"

মহাদেব বলিলেন, "গোলকের গুণ চিত্তবিনিময়। আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী, আমি ভাবিব, আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব। রামা ভাবিতেছে, আমি কালীকান্ত বসু, কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর, কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খান্সামা, রামাকে ভাবিতেছে, কালীকান্ত বাবু!"

কালীকান্ত বাবু যখন শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার শ্বশুর অন্তঃপুরে। কিন্তু বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। দ্বারবান্ রামদীন পাঁড়ে বলিতেছে, "আরে ও খান্সামাজি, তোম হঁয়া মৎ বইঠিও—তোম হামারা পাশ আও।" শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে—"যা বেটা মেড়ুয়াবাদী যা—তোর আপনার কাজ কর্ গে।"

দ্বারবান্ পোর্টমাণ্টো নামাইয়া দিল। কালীকান্ত বলিল, "দরওয়ানজি, বাবুকে অপমান করিও না, উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।"

দ্বারবান্ জামাই বাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিল, যেখানে জামাই বাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে উনি কোন ছদ্মবেশী বড়লোক হইবেন। দ্বারবান্ তখন ভক্তিভাবে রামাকে যুক্তকরে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, "গোসাঁই, কি কসুর মাপ কিজিয়ে?" রামা কহিল, "আচ্ছা, তামুক তেজ দেও।"

শ্বশুরবাড়ীর খান্সামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য। সেই বাঁধা হুঁকায় তামুক সাজিয়া আনিল। রামা, তাকিয়ায় হেলান দিয়া, তামাকু খাইতে লাগিল। কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া কলিকায় তামাকু খাইতে লাগিল। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কহিল, "দাদা ঠাকুর, এ কি?" কালীকান্ত কহিল, "ওঁর সাক্ষাতে কি তামাকু খাইতে পারি?"

উদ্ধব অন্তঃপুরে গিয়া সংবাদ দিল, "জামাইবাবু আসিয়াছেন—তাঁহার সঙ্গে এক জন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন—জামাই বাবু তাঁকে বড় মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্য্যন্ত খান না।"

কর্ত্তা নীলরতন বাবু শীঘ্র বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। কালীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে একটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল। রামা

আসিয়া নীলরতনের পায়ের ধূলা লইয়া কোলা-কুলি করিল। নীলরতন ভাবিল, সঙের লোকটা সত্যভব্য বটে,—জামাই বাবাজীকে কেমন দেখিতেছি।

নীলরতন বাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, কিন্তু কথাবার্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এ দিকে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল। কালীকান্ত বলিল, "বাপ রে, আমি কি বাবুর আগে জল খেতে পারি? আগে বাবুকে জল খাওয়াও, তার পর আমার হবে এখন। আমি মা ঠাকরুণ আপনাদের খাচ্ছিই ত।"

"মা ঠাকুরুণ" শুনিয়া পরিচারিকা মনে করিল, "জামাই বাবু আমাকে এক জন শাশুড়ী-টাশুড়ী মনে করিয়াছেন—না করবেন কেন, আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বই ত আর ছোট লোকের মেয়ের মত দেখায় না। ওঁরা দশটা দেখেছেন—মানুষ চিনতে পারেন—কেবল এই বাড়ীর পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না।" অতএব বিন্দী চাকরাণী জামাই বাবুর উপর বড় খুসী হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া বলিল, "জামাই বাবুর বিবেচনা ভাল, সঙের মানুষটি না খেলে কি তিনি খেতে পারেন—তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও, তবে জামাই খাবেন।"

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিলেন, সে "উপরি লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান হইতে পারে না। জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না। তা তার জায়গা হউক বাহিরে, আর জামায়ের জায়গা হউক ভিতরে।" গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল, "এ কি অলৌকিকতা?" এ দিকে দাসী কালীকান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল, ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকান্ত উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে ঘরের ভিতর কেন? আমাকে এইখানে হাতে ছুটো ছোলা-গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই।" শুনিয়া শালীরা বলিল, "বোসজা মশাই যে এবার অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছ দেখতে পাই।" কালীকান্ত কাতর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমাকে ঠাট্টা করেন কেন, আমি কি আপনাদের তামাসার যোগ্য?" এক জন প্রাচীনা ঠাকুরাণী-দিদি বলিল, "আমাদের তামাসার যোগ্য কেন?—আর তামাসার যোগ্য, তার

কাছে চল।" এই বলিয়া কালীকান্তের হাত ধরিয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।

সেখানে কালীকান্তের ভার্য্যা কামসুন্দরী দাঁড়াইয়া ছিল। কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া প্রভুপত্নী মনে করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

কামসুন্দরী দেখিয়া চন্দ্রবদনে মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "ও কি ও রঙ—এ আবার কোন্ ঠাট শিখিয়া আসিয়াছ।" শুনিয়া কালীকান্ত কাতর হইয়া কহিল, "আজ্ঞে, আমার সঙ্গে অমন সব কথা কেন—আমি আপনার চাকর—আপনি আমার মুনিব।"

রসিকা কামসুন্দরী বলিল, "তুমি চাকর, আমি মুনিব, সে আজ না কা'ল? যত দিন আমার বয়স আছে, তত দিন এই সম্পর্ক থাকিবে, এখন জল খাও।"

কালীকান্ত মনে করিল, "বাবা,—এঁর কথার ভাব যে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখতে পাই। তা, আমার সরাই ভাল।" এই ভাবিয়া কালীকান্ত পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছি'লেন, দেখিয়া কামসুন্দরী আসিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র ধরিল, বলিল, "ওরে আমার সোনার চাঁদ। আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক। আমার কাছ থেকে আর পলাতে হয় না।" এই বলিয়া কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে টানিতে লাগিল।

কালীকান্ত আন্তরিক কাতরতার সহিত হাতযোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই বৌঠাকুরাণি! আপনার সাত দোহাই—আমাকে ছাড়িয়া দিন—আপনি আমার স্বভাব জানেন না—আমি সে চরিত্রের লোক নই।" কামসুন্দরী হাসিয়া বলিল, "তুমি যে চরিত্রের লোক, আমি বেশ জানি—এখন জল খাও।"

কালীকান্ত বলিল, "যদি আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া থাকে, তবে সে ঠক—ঠকায় করিয়াছে। আপনার কাছে হাতযোড় করিতেছি, আপনি আমার গুরুজন, আমায় ছাড়িয়া দিন।"

কামসুন্দরী রসিকতাপ্রিয়, মনে করিল যে, এ একতর নূতন রসিকতা বটে। বলিল, "প্রাণাধিক, তুমি কত রসিকতা শিখিয়াছ, তাহা বুঝা যাইবে।" এই বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য টানিতে লাগিল।

মুহুর্ত্তমধ্যে, কালীকান্ত সর্ব্বনাশ হইল ভাবে

করিয়া "বাবা রে, গেলাম রে, আমার মেরে ফেলে রে" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। চীৎকার শুনিয়া গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌড়িয়া আসিল। মা, ভগিনী, পিসী প্রভৃতিকে দেখিয়া কামসুন্দরী স্বামীর বস্ত্র ছাড়িয়া দিল। কালীকান্ত অবসর পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

গৃহিণী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জানি—জামাই অমন ক'রে উঠলো কেন? তুই কি মেরেছিস্?"

বিস্মিতা কামসুন্দরী মর্ম্মপীড়িতা হইয়া কহিল, "মারিব কেন? আমি মারিব কেন? আমার যেমন পোড়া কপাল।" ক্রমে ক্রমে সুর কাঁদনিতে চড়িতে লাগিল—"আমার যেমন পোড়া কপাল—কোন্ আবাগী আমার সর্ব্বনাশ করেছে—কে ওষুধ করেছে," বলিতে বলিতে কামসুন্দরী কাঁদিয়া হাট লাগাইল।

সকলেই বলিল, "হাঁ, তুই মেরেছিস, নহিলে অমন ক'রে কাতরাবে কেন।" এই বলিয়া সকলে কামীকে "পাপিষ্ঠা" "ডাকিনী" ইত্যাদি-কথায় ভৎর্সনা করিতে লাগিল। কামসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভৎর্সিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল।

এ দিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বড় একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। নীলরতন বাবু স্বয়ং দ্বারবান্ ও উদ্ধব সকলে পড়িয়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে, কিল, লাথি, চড় চাপড়ের বৃষ্টির মধ্যে রামা চাকর কেবল বলিতেছে, "ছেড়ে দে রে, বাবা রে, জামাই মারে, এমন কখন শুনি নাই। আমার কি, তোদেরই মেয়েকে একাদশী করিতে হবে।" নিকটে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ চাকরাণী হাসিতেছে, সে সর্ব্বদা কালীকান্ত বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিত, সে রামা চাকরকে চিনিত, সেই বলিয়া দিয়াছে। কালীকান্ত বাবু মারপিট দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় বেড়াইতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "কি সর্ব্বনাশ হইল। বাবুকে মারিয়া ফেলিল।" ইহা দেখিয়া নীলরতন বাবু আরও কোপাবিষ্ট হইয়া রামাকে বলিতে লাগিলেন, "তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়াছিস্, মার বেটাকে জুতো।"

এই কথা বলায়, যেমন শ্রাবণমাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, তেমনি নির্দ্দোষী রামার উপর প্রহার-বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। মারপিটের চোটে বস্ত্রমধ্য হইতে লুকান স্বর্ণ-গোলকটি পড়িয়া গেল। দেখিয়া তরঙ্গ চাকরাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরতন বাবুর হস্তে দিল। বলিল, "ও মিন্সে চোর! দেখুন, ও একটা সোনার তাল চুরি করিয়া রাখিয়াছে।" "দেখি" বলিয়া নীলরতন বাবু স্বর্ণগোলক হস্তে লইলেন,—অমনি তিনি রামাকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় দিলেন। তরঙ্গও মাথায় কাপড় খুলিয়া, কোঁচা করিয়া পাদুকা হস্তে রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল।

উদ্ধব তরঙ্গকে বলিল, "তুই মাগী আবার এর ভিতর এলি কেন?"

তরঙ্গ বলিল, "কাকে মাগী বলিতেছিস্?"

উদ্ধব বলিল, "তোকে।"

"আমাকে ঠাট্টা?" এই বলিয়া তরঙ্গ মহা-ক্রোধে হস্তের পাদুকা দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল, উদ্ধবও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলোককে মারিতে না পারিয়া নীলরতন বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন দেখি কর্ত্তা মহাশয়, মাগীর কত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে জুতা মারে।" কর্ত্তা তখন একটুখানি ঘোমটা টানিয়া একটু রসের হাসি হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "তা মেরে-ছেন মেরেছেন, তুমি রাগ করিও না। মুনিব মারিতে পারেন।"

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ও আবার কিসের মুনিব—ও-ও চাকর, আমিও চাকর, আপনি এমনি আজ্ঞা করেন! আমি আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব? আমি এমন চাকরী করি না।"

শুনিয়া কর্ত্তা আবার একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি। বুড়ো বয়সে মিন্সের রস দেখ? আমার চাকর—আবার তুমি কিসে হ'তে গেলে?"

উদ্ধব অবাক্ হইল, মনে করিল, "আজ কি পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি?" উদ্ধব বিস্মিত হইয়া রামাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবর্দ্ধন ঘোষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল—তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। এ দিকে কর্ত্তামহাশয় গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক-পাশে দাঁড়াইলেন। গোবর্দ্ধনকে আস্তে আস্তে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "তুমি উহার ভিতর যাইও না।" গোবর্দ্ধন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া

অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল—সে কথা তাহার কানে গেল না, সে তরঙ্গের চুল ধরিতে গেল। "নচ্ছার মাগী, তোর হায়া নেই" এই বলিয়া, গোবর্দ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া তরঙ্গ বলিল, "গোবরা, তুইও কি পাগল হয়েছিস্ না কি? যা, গোরুর জাব দিগে যা।" শুনিয়া গোবর্দ্ধন তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উত্তম-মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া নীলরতন বাবু বলিলেন, "যা। পোড়া কপালে মিন্সে কর্ত্তাকে ঠেঙ্গিয়া খুন কর্লে।" এ দিকে তরঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া "আমার গায়ে হাত তুলিস?" বলিয়া গোবর্দ্ধনকে মারিতে আরম্ভ করিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া উঠিল। শুনিয়া পাড়ার প্রতিবাসী রাম মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম মুখোপাধ্যায় একটা সুবর্ণ-গোলক পড়িয়া আছে দেখিয়া গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি মহাশয়, এটা কি?"

কৈলাসে পার্ব্বতী বলিলেন, "প্রভো, আপনার গোলক সংবরণ করুন—ঐ দেখুন। গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রামের বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পত্নী সম্বোধনে কৌতুক করিতেছে। আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচারিকা তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাকে সম্মার্জনী প্রহার করিতেছে। এ দিকে বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায় আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে টপ্পা শুনাইতেছে! এ গোলক আর মুহূর্ত্তকাল পৃথিবীতে থাকিলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব আপনি ইহা সংবরণ করুন।"

মহাদেব কহিলেন, "হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এক্ষণে গোলক নিবারণ করিলাম। আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্ব্বার স্ব স্ব প্রকৃতিস্থ হইবে এবং যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও স্মরণ থাকিবে না। তবে লোকহিতার্থে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবীমধ্যে প্রচারিত করিবে।"

রামায়ণের সমালোচনা

কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত।

আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। অনেক সময়ে রচনা প্রায় নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় কবিদিগের তুল্য। হিন্দু কবির পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। গ্রন্থকার যে আর কিছু দিন যত্ন করিলে এক জন সুকবি হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই কাব্যগ্রন্থখানির স্থূল তাৎপর্য্য বানরদিগের মহাত্ম্য-বর্ণন। বানরেরা বোধ হয়, আধুনিক Boerwal নামা হিমাচলপ্রদেশবাসী অনার্য্য জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষ। অনার্য্য বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কাজয় ও রাক্ষসদিগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। আর্য্যেরা অসভ্য ও অনার্য্যেরা সভ্য ছিল।

রামায়ণে কিছু কিছু নীতিগর্ভ কথা আছে। বুদ্ধিহীনতার যে দোষ, তাহা কবি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক নির্ব্বোধ প্রাচীন রাজার চারিটি ভার্য্যা ছিল। বহু বিবাহের বিষময় ফল সহজেই উৎপন্ন হইল। বুদ্ধিমতী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্রের উন্নতির জন্য, অসভ্য বৃদ্ধকে ভুলাইয়া ছলক্রমে সপত্নীর গর্ভজাত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিল। জ্যেষ্ঠপুত্রও ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ আলস্য বশতঃ আপন স্বত্বাধিকার বজায় রাখিবার কোন যত্ন না করিয়া বুড়া বাপের কথায় বনে গেল। ইহার সহিত মহাতেজস্বী তুর্কবংশীয় ঔরঙ্গজেবের তুলনা কর, মুসলমান কেন এত কাল হিন্দুর উপর প্রভুত্ব করিয়াছে, বুঝিতে পারিবে। রাম গমনকালে আপনার যুবতী ভার্য্যাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। তাহাতে যাহা ঘটিবার ঘটিল।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক যে স্বভাবতই সতী, এই সীতার ব্যবহারই তাহার উত্তম প্রমাণ। সীতা যেমন গৃহের বাহির হইল, অমনই অন্য পুরুষ ভজনা করিল। রামকে ত্যাগ করিয়া রাবণের সঙ্গে লঙ্কার রাজ্যভোগ করিতে গেল। নির্ব্বোধ রাম পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। হিন্দুরা এই জন্যই স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের বাহির করে না।

হিন্দু স্বভাবের অসভ্যতার লক্ষণ আর একটি উদাহরণ। তাহার চরিত্র এরূপে চিত্রিত হইয়াছে।

যে, তাহার লক্ষ্মণকে কর্ম্মক্ষম বোধ হয়। অন্য জাতীয় হইলে সে এক জন বড় লোক হইতে পারিত, কিন্তু তাহার এক দিনের জন্যও সে দিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের পিছু পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন চেষ্টা করিল না। ইহা কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতার ফল।

আর একটি অসভ্য মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ রামায়ণ অকর্ম্মা লোকের ইতিহাসেই পূর্ণ। ইহা গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য। রাম পত্নীকে হারাইলে অনার্য্য (বানর জাতি) তাহার কাতরতা দেখিয়া দয়া করিয়া রাবণকে সবংশে মারিয়া সীতা কাড়িয়া আনিয়া রামকে দিল, কিন্তু বর্ব্বর জাতির নৃশংসতা কোথায় যাইবে? রাম স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে এক দিন পুড়াইয়া মারিতে গেল। দৈবে সে দিন সেটার রক্ষা হইল। পরে তাহাকে দেশে আনিয়া দুই চারি দিন মাত্র সুখে ছিল। পরে বর্ব্বর জাতির স্বভাবমূলক ক্রোধবশতঃ পরের কথা শুনিয়া সীতাকে তাড়াইয়া দিল। কয়েক বৎসর পরে, সীতা খাইতে না পাইয়া, রামের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাম তাহাকে দেখিয়া রাগ করিয়া মাটীতে পুতিয়া ফেলিল। অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপই ঘটে। রামায়ণের স্থূল তাৎপর্য্য এই।

ইহার প্রণেতা কে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। কিংবদন্তী আছে যে, ইহা বাল্মীকি-প্রণীত। বাল্মীকি নামে কোন গ্রন্থকার ছিল কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়। বল্মীক হইতে বাল্মীকি শব্দের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, অতএব আমার বিবেচনায় কোন বল্মীকমধ্যে এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে কি সিদ্ধান্ত করা যায়, দেখা যাউক।

রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। ইহা কৃত্তিবাস-প্রণীত। উভয় গ্রন্থে অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাও অসম্ভব নহে যে, বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাস হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে। ইহা স্বীকার করি। কিন্তু রামায়ণ নামটিই এ বিষয়ের এক প্রমাণ। "রামায়ণ" শব্দের সংস্কৃত কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় সদর্থ হয়। বোধ হয়, "রামায়ণ" শব্দটি "রামা যবন" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। কেবল "ব" কার লুপ্ত হইয়াছে। রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বল্মীকমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে গ্রন্থ বল্মীকমধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছে।

রামায়ণ গ্রন্থখানির আমরা কিছু প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। উহাতে অনেক গুরুতর দোষ আছে। আদ্যোপান্ত অশ্লীলতা-ঘটিত। সীতার বিবাহ, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, এ সকল অশ্লীলতা-ঘটিত না ত কি? রামায়ণে করুণ রসের অতি বিরল প্রচার। বানরকর্ত্তৃক সমুদ্র বন্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের মধ্যে করুণ রসাশ্রিত বিষয়। লক্ষ্মণভোজনে কিঞ্চিৎ বীররস আছে। বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগের কিছু হাস্যরস আছে। ঋষিগণ বড় রসিক পুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মের কথা লইয়া অনেক হাস্য পরিহাস করিতেন।

রামায়ণের ভাষা যদিও প্রাঞ্জল এবং বিশদ বটে, তথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিতে হইবে। রামায়ণের একটি কাণ্ডে যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাম হইয়াছে 'অযোধ্যাকাণ্ড।' গ্রন্থকার তাহা "অযোদ্ধাকাণ্ড" না লিখিয়া "অযোধ্যাকাণ্ড" লিখিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ অশুদ্ধ সংস্কৃত প্রায় দেখা যায়। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই বিশুদ্ধ সংস্কৃতে অধিকারী।

বর্ষ-সমালোচনা *

সংবাদ-পত্রের প্রথা আছে, নববর্ষ প্রবৃত্ত হইলে গত বর্ষের ঘটনা সকল সমালোচনা করিতে হয়। বঙ্গদর্শন সংবাদ-পত্র নহে, সুতরাং বঙ্গদর্শন বর্ষসমালোচনে বাধ্য নহে। কিন্তু আমাদের কি সাধ করে না? যেমন অনেকে রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় চলেন, যেমন অনেকে কালাবাঙ্গালী হইয়াও সাহেব সাজিবার সাধে কোট-পেণ্টেলুন আঁটেন, আমরাও তেমনি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা হইয়াও, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপশালী সংবাদপত্রের অধিকার গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

কিন্তু মনুষ্যজাতির এমনই দুরদৃষ্ট যে, যে যখন যে সাধ করে, তাহার সেই সাধে তখন বিঘ্ন ঘটে। নূতন বৎসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমরা লিখিতেছি অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন! সর্ব্বনাশ, এ যে

* এই প্রবন্ধ প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

কল্দর্পের রচনাসম্বন্ধে কোন নিয়মই মানে না—অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। অতএব আমরা, মনের সাধ মনে না মিটাইয়া, সে সাধে বিবাদে ইত্যাদি অনুপ্রাসের স্রোত সংবরণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ সালের সমালোচন করিব। অতএব হে গতবর্ষ! সাবধান হও, তোমাকে সমালোচন করিব।

গত বৎসরের রাজকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, এই বৎসরে তিন শত পঁয়ষট্টি দিবস ছিল, এক দিনও কম হয় নাই। প্রতি দিবসে ২৪টি করিয়া ঘণ্টা এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০টি করিয়া মিনিট ছিল। কোনটির আমরা একটিও কম পাই নাই। রাজপুরুষগণ তাহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে। অনেকে বলেন যে, এ বৎসরে গোটাকতক দিন কমাইয়া দিলে ভাল হইত, আমরা এ কথায় অনুমোদন করি না, দিন কমাইলে কেবল চাকুরিয়াদিগের বেতন লাভ, সংবাদপত্রলেখকদিগের শ্রমলাঘব, সাধারণের কোন লাভ নাই, (আমরা মাসিক, ১২ মাসের বারখানি কেহ ছাড়িবে না।) তবে, গ্রীষ্মকালটি একেবারে উঠাইয়া দিলে, ভাল হয় বটে। আমরা কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, বার মাসই শীতকাল থাকে, এমন একটি আইন প্রচারের চেষ্টা দেখুন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এ বৎসর সকলেরই এক এক বৎসর পরমায়ু চুরি গিয়াছে। কথাটায় আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমাদের ১১ বৎসর বয়স ছিল, এ বৎসর ১২ হইয়াছে! যদি পরমায়ু চুরি গেল, তবে এক বৎসর বাড়িল কি প্রকারে? নিন্দুক সম্প্রদায়ই এমত অযথার্থ প্রবাদ রটাইয়াছে।

এ বৎসর যে সুবৎসর ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, এ বৎসর অনেকেরই সন্তান জন্মিয়াছে। টিটিমেন্টেল ডিপার্টমেন্টের সুদক্ষ কর্মচারিগণ বিশেষ জানিয়াছেন যে, কাহারও কাহারও পুত্র হইয়াছে, কাহারও কন্যা হইয়াছে এবং কাহারও গর্ভস্রাব হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ বৎসর কতকগুলি মনুষ্য, অধিক নহে, রোগাদিতে মরিয়াছে। শুনিয়াছি যে, এ দেশীয় কোন মহাসভা পার্লিমেণ্টে আবেদন করিবেন যে, এই পুণ্যভূমি ভারতরাজ্যে, মনুষ্য না মরিতে পায়। তাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, যদি কাহারও নিতান্ত মরা আবশ্যক হয়, তবে সে পুলিসে জানাইয়া অনুমতি লইয়া মরিবে।

এ বৎসরে ফাইনান্সিয়ল্ ডিপার্টমেন্টের কাণ্ড অতি বিচিত্র—আমরা শ্রুত হইয়াছি যে, গবর্ণমেণ্টের আয়ও হইয়াছে, ব্যয়ও হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর হউক বা না হউক, বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের টাকা, হয় কিছু উদ্বর্ত্ত হইয়াছে, নয় কিছু অকুলান হইয়াছে, নয় ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। আগামী বৎসর (৭৬ সালে) টেক্স বসিবে কি না, তাহা এক্ষণে বলা যায় না; কিন্তু ভরসা করি, ৭৭ সালের এপ্রিল মাসে আমরা এ কথা নিশ্চিত বলিতে পারিব।

এবার বিচারালয়ে সকলের কার্য্যের আমরা বিশেষ সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। সত্য বটে যে, যে নালিশ করিয়াছে, তাহার বিচার হইয়াছে, বা হইবে, এমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহারা নালিশ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কোন বিচার হয় নাই। আমরা ইহা বুঝিতে পারি না; যেখানে সাধারণ বিচারালয়, সেখানে নালিশ করুক, বা না করুক, সর্ব্বত্র বিচার—বিচার চাই। কেহ রৌদ্র চাহুক বা না চাহুক, সর্ব্বত্র রৌদ্র সূর্য্যদেব করিয়া থাকেন, কেহ বৃষ্টি চাহুক বা না চাহুক, মেঘ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং কেহ বিচার চাহুক বা না চাহুক, বিচারকের উচিত গৃহে গৃহে ঢুকিয়া বিচার করিয়া আসেন। যদি কেহ বলেন যে, বিচারকগণ এরূপ বিচারার্থ গৃহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে গৃহস্থগণের সম্মার্জ্জনী সকল অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সম্মার্জ্জনীকে তাদৃশ ভয় করেন না—সম্মার্জ্জনীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হাকিমদিগের বিলক্ষণ পরিচয় আছে এবং প্রায় প্রত্যহ ইহার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হইয়া থাকে। যেমন ময়ূর সর্পপ্রিয়, ইঁহারাও তেমনি সম্মার্জ্জনী-প্রিয়, দেখিলেই প্রায় ভক্ষণ করিয়া থাকেন! আমরা এমনও শুনিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্টের অধস্তন কর্ম্মচারী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যেমন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের পুরস্কারের জন্য "অর্ডার অব্ দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" সংস্থাপিত করা হইয়াছে, সেইরূপ নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের জন্য "অর্ডার অব দি ব্রূম্ষ্টিক" সংস্থাপিত করা হউক। এবং বিশেষ বিশেষ গুণবান্ ডিপুটি এবং মুনসেফ প্রভৃতিকে বাছিয়া নাকলাইনের রক্ষিতে এই

মহাত্মাগুলিকে বাঁধিয়া তাঁহাদিগের গলদেশে লবমাল করিয়া দেওয়া হউক। তাঁদের চাপকান-চেন-চাদর-বিভূষিত সদাকম্পমান বক্ষে ইহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে। রাজপ্রসাদস্বরূপ প্রদত্ত হইলে ইহা যে সাদরে গৃহীত হইবে, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমাদের কেবল আশঙ্কা এই যে, এত উমেদওয়ার যুটিবে যে, কাঁটায় সঙ্কুলান করা ভার হইবে।

গত বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। সর্ব্বত্র সমান হয় নাই। ইহা মেঘদিগের পক্ষপাত বটে। যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশের লোক গবর্ণমেণ্টে এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যাহাতে সর্ব্বত্র সমান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভূত হউক। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার সদুপায় নিরূপণ জন্য একটি কমিটী সংস্থাপিত করা উচিত। কোন কোন মান্য সহযোগী বলেন যে, যদি সরকার হইতে মেঘদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের কোন দেশেই যাইবার আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতেও সুবিধা হইবে না—কেন না, বঙ্গদেশের মেঘ সকল অত্যন্ত সৌদামিনী-প্রিয়—সৌদামিনীগণকে ছাড়িয়া টাকার লোভেও দেশ-দেশান্তরে যাইতে স্বীকার করিবে না। আমরা প্রস্তাব করি যে, মেঘ-সকল এবোলিশ করিয়া দিয়া ভিস্তীর বন্দোবস্ত করা হউক। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এক এক জন চাপরাশী বা সুযোগ্য ডিপুটি এক এক জন ভিস্তীকে দীর্ঘ বংশদণ্ডে বাঁধিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া তুলিয়া ধরিবেক, ভিস্তী তথা হইতে জল ছড়াইয়া পারে ত নামিয়া আসিবে। ভাল হয় না?

আমাদের দেশের কামিনীগণ যে দেশ-হিতৈষিণী নন—নহিলে ভিস্তীর প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা যদি প্রাত্যহিক সাংসারিক কান্নাটা মাঠে গিয়া কাঁদিয়া আসেন, তাহা হইলেই অনায়াসেই কৃষিকার্য্যের সুবিধা হয়, ও মেঘ ডিপার্টমেণ্ট এবোলিশ করা যাইতে পারে। তবে আমরা লোকের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলার্থ বলি যে, অকাল-বৃষ্টির পরিবর্ত্তে নারীনয়নাশ্রুর আদেশ করিতে গেলে একটু পাকা রকম পুলিসের বন্দোবস্ত করা চাই। মেঘের কটাক্ষ বিদ্যুতে, মাঠের মাঝখানে, তারা-বুদ্ধির ছেলেদের কি হয় বলা যায় না, পুলিস থাকা ভাল।

শুনিলাম, শিক্ষাবিভাগে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক একটা কান-মাপা কাঠি প্রস্তুত করিয়াছে। তাহাদের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—তাহারা বলে, অধ্যাপকদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়গুলি মাপিয়া দেখিব—নহিলে তাঁহাদিগের নিকট পড়িব না। আমরা ভরসা করি, মাপকাঠি ছোট পড়িবে, এমত সম্ভাবনা কোথাও নাই।

যাহা হউক, দুর্ব্বৎসর হউক, সুবৎসর হউক, তিনটি নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা স্থির জানিতে পারিতেছি—তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

প্রথম, বৎসরটি চলিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে মতান্তর নাই।

দ্বিতীয়, বৎসর গিয়াছে, আর ফিরিবে না। ফিরাইবার জন্য কেহ কোন উদ্যোগ পাইবেন না। নিষ্ফল হইবে।

তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক! আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা। কেন না, আপনার ও আমার পঁচাত্তরেও ঘাস-জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস-জল। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ঘাস-জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

কোন "স্পেশিয়ালের" পত্র।

যুবরাজের সঙ্গে যে সকল "স্পেশিয়াল" আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন কোন বিলাতীয় সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। আমরা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। সে বিলাতীয় সংবাদপত্রের নামের জন্য যদি কেহ আমাদিগকে পীড়াপীড়ি করেন, তবে আমরা নাচার হইব। সংবাদপত্রের নাম আমরা জানি না এবং কোথায় দেখিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ নাই। পত্রখানির মর্ম্ম এই—

যুবরাজের সঙ্গে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ যেরূপ দেখিলাম, তাহা এই অবকাশে বর্ণনা করিয়া আপনাদিগকে আপ্যায়িত করিব, ইচ্ছা আছে। আমি এ দেশ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, অতএব আমার কাছে যেরূপ ঠিক সংবাদ পাইবেন, এমন অন্যের কাছে পাইবেন না। এ দেশের নাম বেঙ্গল, এ নাম কেন হইল, তাহা দেশী লোকে বলিতে পারে না। কিন্তু দেশী লোক এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহে, তাহারা জানিবে

কি প্রকারে? তাহারা বলে, পূর্ব্বে ইহার এক প্রদেশকে বঙ্গ বলিত, তৎপ্রদেশের লোককে এখনও বাঙ্গাল বলে,এ জন্ত এ দেশের নাম বাঙ্গালা। —কিন্তু এ দেশের নাম বাঙ্গালা নহে—ইহার নাম বেঙ্গল। তাহা আপনারা সকলেই জানেন। অতএব এ কথা কেবল প্রবঞ্চনা মাত্র, আমার বোধ হয়, বেঞ্জামিন গল Benjamin gall সংক্ষেপতঃ বেনগল নামক কোন ইংরেজ এই দেশ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত করিয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

রাজধানীর নাম "কালকাটা" Calcutta কাল এবং কাটা এই দুইটি বাঙ্গালা শব্দে এই নামের উৎপত্তি। এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কষ্ট নাই, এই জন্তই উহার নাম "কালকাটা।"

এ দেশের লোক কতকগুলি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি কিঞ্চিৎ গৌর। যাহারা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বোধ হয়, আফ্রিকা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিল, কেন না, সেই কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকেরই কুঞ্চিত কেশ, নরতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, কুঞ্চিত কেশ হইলেই কাফ্রি। আর যাহারা কিঞ্চিৎ গৌরবর্ণ, বোধ হয়, তাহারা উপরিকথিত বেন্‌গল্ সাহেবের বংশসম্ভূত।

দেখিলাম, অধিকাংশ বাঙ্গালী মাঞ্চেষ্টরের তন্তপ্রস্তুত বস্ত্র পরিধান করে। অতএব স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভারতবর্ষ মাঞ্চেষ্টরের সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত। এক্ষণে মাঞ্চেষ্টরের অনুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পরিয়া বাঁচিতেছে। ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। কি প্রকারে বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেহ কেহ আমাদিগের মত পেন্‌টুলূন পরে এবং কেহ কেহ তুর্কদিগের মত পায়জামা পরে এবং কেহ কাহার অনুকরণ করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে।

অতএব দেখ, ব্রিটিশ রাজ্য বেঙ্গল দেশে এক শত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য উলঙ্গ জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের যে কি পরিমাণে ধন এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাহা ইংরেজেই জানে। বাঙ্গালীতে বুঝিতে পারে, এত বুদ্ধি তাহাদিগের থাকা সম্ভব নহে।

দুঃখের বিষয় যে, আমি কয়দিনে বাঙ্গালীদিগের ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি নাই, তবে কিছু কিছু শিখিয়াছি, এবং গোলেস্তান এবং বোস্তান্ নামে যেই দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। এ দুইখানি পুস্তকের মূল মর্ম্ম এই যে, যুধিষ্ঠির নামে রাজা, রাবণ নামে আর এক জন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল। মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করেন। পরিশেষে তাঁহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন।

আমি কিছু কিছু বাঙ্গালা শিখিয়াছি। বাঙ্গালীরা হাইকোর্টকে হাইকোট বলে, গবর্ণমেণ্টকে গবর্ণমেণ্ট বলে, ডিক্রীকে ডিক্রী বলে, ডিসমিসকে ডিসমিস, রেলকে রেল বলে, ডোরকে ডোর, ডবলকে ডবল ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির একটি শাখা মাত্র।

ইহাতে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। যদি বাঙ্গালা ইংরেজির শাখাই হইল, তবে ইংরেজেরা এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে এ দেশে কোন ভাষা ছিল কি না? দেখ, আমাদিগের খৃষ্টের নাম হইতে ইহাদিগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে এবং অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক তৎপ্রণীত ভগবদ্গীতা বাইবেল হইতে অনুবাদিত। সুতরাং বাইবেলের পূর্ব্বে যে ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না, ইহা একপ্রকার স্থির। (১) তাহার পর কবে ইহাদিগের ভাষা হইল, বলা যায় না। বোধ করি, পণ্ডিতবর মক্ষমূলর মনোযোগ করিলে এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন। যে পণ্ডিত মীমাংসা করিয়াছেন যে, অশোকের পূর্ব্বে আর্য্যেরা লিখিতে জানিত না, সেই পণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম।

আর একটি কথা আছে। সার উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষমূলর পর্য্যন্ত প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, এ দেশে সংস্কৃত নামে আর একটি ভাষা আছে। কিন্তু এ দেশে আসিয়া আমি কাহাকেও সংস্কৃত কহিতে বা লিখিতে দেখি নাই। সুতরাং এ দেশে

(১) Mr. Lorinzer,

সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই। বোধ হয়, এটি সার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির কারসাজি। তাঁহারা পশারের জন্য এ ভাষাটি সৃষ্টি করিয়াছেন। (১)

যাহা হোক, উঁহাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব। তোমরা শুনিয়াছ যে, হিন্দুরা চারিটি জাতিতে বিভক্ত ; কিন্তু তাহা নহে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জাতি আছে, তাহাদের নাম নিয়ে লিখিতেছি।

১। ব্রাহ্মণ ২। কায়স্থ ৩। শূদ্র ৪। কুলীন ৫। বংশজ ৬। বৈষ্ণব ৭। শাক্ত ৮। রায় ৯। ঘোষাল ১০। টেগোর ১১। মোল্লা ১২। করাজী ১৩। রামায়ণ ১৪। আসাম মহাভারত ১৫। গোয়ালপাড়া ১৬। পারিয়া ডগস্।

বাঙ্গালীদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কারণেও মিথ্যা কথা বলে। শুনিয়াছি, বাঙ্গালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র। আমি অনেকগুলি বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তিনি কোন্ জাতি? সকলেই বলিল, তিনি কায়স্থ। কিন্তু তাহারা আমাকে ঠকাইতে পারিল না, কেন না, আমি সেই পণ্ডিতবর মক্ষমূলরের গ্রন্থে (২) পড়িয়াছি যে, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রাহ্মণ। দেখা যাইতেছে যে, "Mitra" শব্দ "Mitre"শব্দের অপভ্রংশ ; অতএব মিত্র মহাশয়কে পুরোহিতজাতীয়ই বুঝায়।

বাঙ্গালীদিগের একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যেরূপ লাখে লাখে তাহারা যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে, ঈদৃশ রাজভক্ত জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বাঙ্গালীরা স্ত্রীলোককে পরদানশীন করিয়া রাখে জানা আছে। ইহা সত্য বটে, তবে সত্য সর্ব্বত্র নয়। (৩) যখন কোন সাহেবের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখে, সাহেবের ছচমা দেখিলেই বাহির করিয়া আনে। আমরা যেরূপ কৌলিং-পিস লইয়া ব্যবহার করি, বাঙ্গালীরা পৌরাঙ্গনা লইয়া সেইরূপ করে ; যখন প্রয়োজন নাই, তখন বাক্সবন্দি করিয়া রাখে, শীকার দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের সীসের গুলীতে ছার পক্ষিজাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙ্গালীর মেয়ের নয়নবাণে কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে, বলিতে পারি না। আমি বাঙ্গালীর কন্যার অলঙ্করণের যেরূপ গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমরাও কৌলিংপিসটিকে দুই একখানা সোনার গহনা পরাইব—দেখি, পাখী ঘুরিয়া আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে কি না।

তবু নয়নবাণে কেন, শুনিয়াছি, বাঙ্গালীর মেয়ে নাকি পুষ্পবাণ-প্রয়োগেও বড় সুপটু। হিন্দু-সাহিত্যোক্ত পুষ্পশরে, আর এই বঙ্গ-কামিনীগণের পরিত্যক্ত পুষ্পশরে কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আমি জানি না, যদি থাকে, তবে বাঙ্গালীর মেয়েকে দুরাকাঙ্ক্ষিণী বলিতে হইবে। শুনিয়াছি, কোন বাঙ্গালী কবি নাকি লিখিয়াছেন, "কি ছার মিছার ধনু ধরে ফুলবাণ।" এখন কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিতে হইবে, "লক্ষ ছবি মিছার ফুল মারে ফুলবাণ।" যাহা হউক, ফুলবাণ সচরাচর প্রচলিত না হইয়া উঠে। বাঙ্গালার ইংরেজ টেঁকা ভার হইবে—আমার সর্ব্বদা ভয় করে, আমি এই গরীব দোকানদারের ছেলে, দু'টাকার লোভে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি—কে জানে, কখন্ বঙ্গকুলকামিনী-প্রেরিত কুসুমশর আসিয়া এই ছেঁড়া তাবু ফুটা করিয়া, আমার হৃদয়ে আঘাত করিবে, আমি অমনি ধপাস্ করিয়া চিৎপাত হইয়া পড়িয়া যাইব! হায়! তখন আমার কি হইবে! কে মুখে জল দিবে?

আমি এমত বলি না যে, সকল বাঙ্গালীর মেয়ে এরূপ কৌলিংপিস অথবা সকলেই এরূপ পুষ্পক্ষেপণী-প্রেরণে সুচতুরা। তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি জনরবে অবগত হইয়াছি। শুনিয়াছি, তাঁহারা নাকি শুভুনিয়োগানুসারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের যে চারিটি বেদ আছে—তাহার মধ্যে চাণক্য-শ্লোক

(১) সাবধান, কেহ হাসিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভুগাল্ড ইুয়র্ট যথার্থই এই মতাবলম্বী ছিলেন।

(২) Chips from a German Worship.

(৩) বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্রকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

সাধক বেদে (আমি এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে,—

আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি,

ইহার অর্থ এই, হে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার উন্নতির জন্ম তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর!

BRANSONISM. *

জন্ ডিক্‌সন সাহেবকে ফৌজদারী আদালতে ধরিয়া আনিয়াছে। সাহেব বড় কালো, তা হ'লে হয় কি, সাহেব ত বটে—পাড়াগেঁয়ে কাছারীতে বিচার দেখিতে অনেক রঙ্গদার লোক ছুটিয়া গেল। বিচার একটা দেশী ডিপুটীর কাছে হইবে। তাহাতে সাহেবের কিছু কষ্ট; তবে মনে মনে ভরসা আছে যে, বাঙ্গালীটা ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবে। ডিপুটী মহাশয়ের রকম দেখিয়াও তাই বোধ হয়, একটা সে-কেলে বুড়ো—নিরীহ রকম ভাল মানুষ জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে।

এ দিকে কনেষ্টবল মহাশয়েরা কতকটা ভয়ে ভয়ে সাহেব মহাশয়কে ডকস্থ করিলেন। সাহেব ডকস্থ হইয়াই একটু গরম হইয়া হাকিমের পানে চাহিয়া চোখ ঘুরাইয়া একটু বাঁকা বাঁকা বুলিতে বলিলেন, "সে হামাকে টোমরা হেথানে কেন আনিলো?"

হাকিম বলিল, "কি জানি সাহেব! কেন আনিলো—তুমি কি করেছ?"

সাহেব। যা করে না কেন, টোমার সাতে হামার কোন বাট হোবে না।

হাকিম। কেন সাহেব?

সাহেব। টুমি কালা বাঙ্গালী আছে।

হাকিম। তার পর?

সাহেব। হামি সাহেব আছে।

হাকিম। তা ত দেখ্‌ছি—তাতে কি হলো?

সাহেব। তোমার—কি বলে? সেটা নেই।

হাকিম। তবু ভাল—মাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাঁকা বাঁকা বুলি ধরেছিলে কেন? কি নেই?

সাহেব। সেই যাতে মোকদ্দমা করে—সে তুমি জানে না?

হাকিম। সাহেব—আমি ভাল মানুষ—তোমায় এখনও কিছু বলি নাই—কিন্তু আর "তুমি" "তুমি" করিও না—জরিমানা করিব।

সাহেব। টুমি মোর জরিমানা করিতে পারে না—হামি সাহেব আছে—তোমার সেই সেটা—কি বলে—সেটা নেই।

হাকিম। কি নেই সাহেব?

সাহেব। সেই যে—জুরিডিকেশন।

হাকিম। ওহো—Jurisdiction? বটে। তুমি কি বিলাতী সাহেব?

সা। হামি সাহেব আছে।

হা। রংটা এত কাল কেন?

সা। মুই কোয়েলার কাম করেছিল।

হা। তোমার বাপের নাম কি?

সা। বাপের নামে কোর্টের কি কাম আছে?

হা। বলি, সেটা জানা আছে কি?

সা। হামার বাপ বড় আদমি ছেলো—লেকেন নামটা এখন মনে পড়ছে না।

হাকিম। মনে কর না হয়। তোমার নামটা কি?

সাহেব। আমার নাম জান সাহেব—জান ডিক্‌সন।

হা। বাপের নাম ডিক্‌সন নয়?

সা। হোবে—ডিক্‌সন হোতে পারে—লেকেন—

বাদীর মোক্তার এই সময়ে বলিল, "হজুর, ওর বাপের নাম গোবর্দ্ধন সাহেব।"

সাহেব রাগ করিয়া বলিল, "গোবর্দ্ধন হইলো তা কি হইলো—তোমার বাপের নাম যে রামকান্ত—তোমার বাপ যে চূণা বেচিত—আমার বাপ বড় আদমি ছেলো।"

হাকিম। তোমার বাপ কি করিত?

সাহেব। বড় লোকের সাদি দিত।

হাকিম। সে আবার কি? ঘটকালি করিত না কি?

মোক্তার। আজ্ঞে না—বিবাহের বাজনায় জয়-ঢাক বাজে করিত।

অনেকে হাসিল। হাকিম জুরিসডিক্‌শনের আপত্তি নামঞ্জুর করিয়া, বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরিয়াদীকে তলব করায় রূপার পৈছা হাতে, মধ্য কালো-কোলো এক জন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহাকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, আর সে যেরূপ উত্তর দিল, নিম্নে লিখিতেছি;—

* Ilbert বিল-সম্বন্ধীয় বিবাদকালে ইহা লিখিত হয়।

প্রশ্ন। তোমার নাম কি?

উত্তর। রঙ্গিনী জেলেনী।

প্রশ্ন। তুমি কি কর?

উত্তর। বিল-খালে মাছ ধ'রে বেচি।

আসামী সাহেব কহিল, "ঝুটা বাত! ও সুঁটুকি মাছ বেচে।"

জেলেনী বলিল, "তাও বেচি। তাহাতেই ত তুমি মরেছ।"

প্রশ্ন। তোমার কিসের নালিশ?

উত্তর। চুরির নালিশ।

প্রশ্ন। কে চুরি করেছে?

(সাহেবকে দেখাইয়া) এই বাগ্দীর ছেলে।

সাহেব। মুই সাহেব আছে—মুই বাগ্দী নই।

প্রশ্ন। কি চুরি করেছে?

উত্তর। এই ত বলিলাম—এক মুঠা সুঁটুকি মাছ।

প্রশ্ন। কি রকমে চুরি করিল?

উত্তর। আমি ডালা পাতিয়া তাতে সুঁটুকি মাছ সাজাইয়া বেচিতেছিলাম—এক জন খদ্দের এলো, তার পানে ফিরে কথা কইতেছিলাম—এমন সময়ে সাহেব ডালা থেকে এক মুঠা মাছ তুলে নিয়ে পকেটে পূরিল।

প্রশ্ন। তার পর তুমি টের পেলে কেমন ক'রে?

উত্তর। পকেটের যে আধখানা বই ছিল না, তা সাহেবের মনে ছিল না, সুঁটুকি মাছ সব ফুটো দিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া সাহেব রাগ করিয়া বলিল, "না বাবুজি! ওর চুপড়িটাই ফুটো, মাছ বেরইয়ে পড়েছিল।"

জেলেনী বলিল, "ওর পকেটে দুই চারিটা মাছ পাওয়া গিয়াছিল।"

সাহেব বলিল, "সে মুই দাম দেবে ব'লে নিয়েছেলাম।"

সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল যে, ডিক্‌সন সাহেব সুঁটুকি মাছ চুরি করিয়াছেন। তখন হাকিম সাহেবের জবাব লিখিতে বসিলেন। সাহেব জবাবে কেবল এই কথা বলিলেন যে, কালা বাঙ্গালীর আমার উপর "জুরিডিকেশন নেই।" সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হাকিম তাহাকে এক হপ্তা কয়েদের হুকুম দিলেন। দুই চারি দিন পরে এই কথাটা কলিকাতার একটা ইংরেজ দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কানে গেল। পরদিন প্রভাতে সেই সম্পাদকের উক্তিময় নিম্নোদ্ধৃত লিডার দেখা গেল।

THE WISDOM OF A NATIVE MAGISTRATE.—A story of a lamentable failure of justice and race antipathy has reached us from the Mofussil. John Dickson an English gentleman of good birth though at present rather in straitened circumstances had fallen under the displeasure of a clique of designing natives headed by one Rungini Jeliani, a person, as we are assured on good authority, of great wealth, and considerable influence in native society. He was hauled up before a native Magistrate on a charge of some petty larceny which if the trial had taken place before a European magistrate, would have been at once thrown out as preposterous, when preferred against a European of Mr. Dickson's position and character. But Babu Jaladhar Gangooly, the ebony coloured Daniel before whose awful tribunal, Mr. Dickson had the misfortune to be dragged, was incapable of understanding that pretty larcenies, however congenial to sharp entellects of his own country, have never been known to be perpetrated by men born and bred on English soil, and the poor man was convicted on evidence the trumpery character of which was probably as well-known to the Magistrate as to the prosecutors themselves. The poor man pleaded his birth and his rights as a European British subject, to be tried by a magistrate of his own race, but the plea was negatived for reasons we neither know nor are able to conjecture. Possibly the Babu was under the impression that Lord Ripon's cruel and nefarious Government had already passed into law the Bill which is to authorize every man with a dark

skin lawfully to murder and hang every man with a white one. May that day be distant yet. Mea while we leave our readers o conjecture from a study of names Jaladhar and Jalani whether the tie of kindred which obviously exists between prosecutor and magistrate has had no influence in producing this extraordinary decision,"

এই লিডার বাহির হইলে পর উহা পড়িয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জলধর বাবুকে চাপরাশি পাঠাইয়া তলব করিয়া আনিলেন। গরীব ব্রাহ্মণ নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে হুজুরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সেলাম না করিতে করিতে সাহেব গরম হইয়া বলিলেন,--

"What do you mean Babu, by convicting a European British subject !"

Deputy. What European British subject, Sir ?

Magistrate. Read here. I suppose you can do that. I am going to report you to me Government for the piece of folly.

এই বলিয়া সাহেব কাগজখানা বাবুর কাছে ফেলিয়া দিলেন, বাবু কুড়াইয়া লইয়া পড়িলেন। সাহেব বলিলেন,

"Do you now understand ?"

Deputy. Yes, Sir, but this man was not a European British Subject.

Magistrate. How do you now that ?

Deputy. He was very dark.

Magistrate. Do you find it laid down in the law that a fair skin is the only evidence by which a man shall be adjudged to be a European subject ?

Deputy. No Sir.

Magistrate. Well, what other evidence did you take ?

এখন ডিপুটী বাবুটি বহুকালের ডিপুটী—জানিতেন যে, তর্কে তাঁহার জিত নিশ্চিত, কিন্তু তর্কে জিতিলেই বিপদ্। অতএব সুচতুর দেশী চাকুরের যাহা কর্ত্তব্য—তাহা করিলেন, তর্ক ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন,

"I do not presume to discuss the matter with you, Sir, I see I was wrong and I am very sorry for it."

এখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিতান্ত বোকা নহেন, ভিতরে ভিতরে একটু রসদার। এই কথা শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"Very sorry for what ?"

Deputy. For convictng a European British subject.

Magistrate. Why so ?

Deputy. Because it is very wrong for a native tot convict a European British subject.

Magistrate. Why very wrong ?

ডিপুটী সাহেবকে এক হাটে কিনিতে আর এক হাটে বেচিতে পারে। অমনি উত্তর দিল,

"Very wrong, because a European British subject can not commit a crime and a native cannot judge honestly."

Magistrate. Do you admit that ?

Deputy. I do not see why I should not, I try to do my duty to the best of my ability, but I speak of my countrymen generally.

Magistrate. You don't think your countrymen ought to try Europeans ?

Deputy. Most certainly they should not. The glorious British Empire will come to an end if they do.

Magistrate. Well Babu, I am glad to see you are so sensible. I wish all your countrymen were equally so, at least that all native magistrates were like you.

Deputy. Oh Sir ! how can you expect it, when there are men at the top of our service who think differently.

Magistrate. Are you not yourself near the top ? you must have served long.

Deputy. Unfortunately my claims to promotion have always been overlooked, I thought of speaking to you, Sir on the subject.

Magistrate. You certainly deserve

promction, I wll write to the Commissioner and see what can be done for yor.

ডিপুটী তখন দুই হাতে সেলাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে জয়েণ্ট সাহেব, বড় সাহেবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডিপুটী বাহির হইয়া গেল, জয়েণ্ট, দেখিলেন জয়েণ্ট বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"What could you have been saying to this fellow ?"

Magistrate, Oh ! He is very amusing.

Joint. How so ?

Magistrate. He is both fool and knave. He thinks of pleasing me by traducing his own countrymen.

Joint Ard did you tell him your mind ?

Magistrate. O no ! I promised him promotion, which I will try to for him. He has at least the merit of not being conceited, A concieted native is perfectly useless as a subordinate, and I prefer encouraging men to make a moderate estimate of their own merits.

এ দিকে, ডিপুটী ফিরিয়া আসিলে পর আর এক ডিপুটী বাবুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দোসরা ডিপুটী জলধরকে বলিলেন, "সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন না কি ?"

জলধর। হাঁ। কি পাপে পড়েছি !

২য়া ডিপুটী। কেন ?

জলধর। সেদিনকার সেই বাগদী বেটাকে কয়েদ দিয়াছিলাম বলিয়া, সাহেব বলে, গবর্ণমেণ্টে আমার নামে রিপোর্ট করিবে।

২য়া ডিপুটী। তার পর ?

জলধর। তার পর আর কি ?—প্রমোসনের রিপোর্ট করিবে এলেন।

২য়া ডিপুটী। সে কি ? কি মত্রে ?

জলধর। মন্ত্র আর কি ? দুটো মন-রাখা কথা।

হনুমদ্বাবু সংবাদ

একদা প্রাতঃসূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত কদলীকুঞ্জে শ্রীমান্ হনূমান্ বায়ু-সেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন, তাঁহার পরম রমণীয় লাঙ্গুলবল্লী চক্রে চক্রে কুণ্ডলীকৃত হইয়া, কখন পৃষ্ঠে, কখন স্কন্ধে, কখন বৃক্ষশাখায় শোভিত হইতেছিল। চারিপাশে মর্ত্তমান, চাঁপা, কাঁটালী প্রভৃতি নানাজাতীয় সুপক্ক এবং অপক্ক রম্ভা বৃক্ষ হইতে থরে থরে কাঁদিতে কাঁদিতে শোভা পাইয়া সুগন্ধে দিক্ আমোদিত করিয়াছিল। বীরবর, কখন কোন গাছ হইতে এক আধটা পাড়িয়া কখন আঘ্রাণ, কখন চুম্বন, কখন লেহন এবং কদাচিৎ চর্ব্বণ করিয়া কদলীজাতীয় ফলমাত্রের মাধুর্য্য সম্বন্ধে বহুতর মানসিক প্রশংসা করিতেছেন। এমত সময়ে দৈবযোগে বুট, কোট, পেণ্টালুন, চেন, চসমা, চুরুট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃত-মস্তকে এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত। হনূমানচন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "কে এ ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় এ কিষ্কিন্ধ্যা হইতে আসিতেছে। এরূপ পরানুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব।"

এই ভাবিয়া মহাত্মা পবনাত্মজ এক সরসচম্পক-কদলীবৃক্ষ হইতে উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ এক গুচ্ছ সুপক্ক কদলী উন্মোচন করিয়া আঘ্রাণ করিলেন এবং তাহার ঘ্রাণে পরিতুষ্ট হইয়া অতিথিসৎকারে তৎ-প্রয়োগ মনে মনে স্থির করিলেন। ইত্যবসরে সেই টুপিকোটপরিবৃত মোহন মূর্ত্তি বীরবরের সম্মুখাগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল। বলিল,—

"Good morning Mr Hanuman ! how do you do ? So glad to see you ! Ah ! I see you are at breakfast already."

হনূমান্ কহিলেন, "কিমিদং ? কিং বদসি ?"

বাবু।—What's that ! I suppose that is the Kishkinda patois ? It is a glorious country—is it not ? There is a land of every land the pride and so on as you know.

হনূমান্। কস্তং। কস্মাজ্জনপদৎ আগতোঽসি ?

বাবু। (জনান্তিকে)—

It seems most barbarous gibberish that precious lingo of his but I suppose

I most put up with it, (প্রকাশ্যে) My dear Mr. Monkey, I am ashamed to confess that I am not quite familiar with your beautiful vernacular. I dare say it is a very polished language. I presume you can talk a little English,

তখন সেই মহাবীর পবননন্দন সহসা মহাচক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া বৃহৎ লাঙ্গুলপাশ বিস্তারণ পূর্ব্বক তাহা বাবুজি মহাশয়ের গলদেশে অর্পিত করিলেন এবং কুণ্ডলী করিয়া জড়াইতে লাগিলেন। তখন বাবু মহাশয় হাঁ করিয়া ফেলিলেন, মুখের চুরোট পড়িয়া গেল। বলিলেন,—

"I say this seems somewhat—

লেজের আর পেঁচ।

"Semewhat unmannerly—to say the least—

আর এক পেঁচ।

"Dear Mr, Hanuman—you will hurt me"

আর এক পেঁচ।

"Kind good Mr, Hanuman."

হনূমান্ তখন বাবু মহাশয়কে লেজে করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া ফেলিলেন, বাবুর টুপি, চসমা এবং চাবুক পড়িয়া গেল, কোট-পকেট বাহির হইয়া চেন ঝুলিতে লাগিল। তখন বাবুর মুখ শুকাইল—ডাকিলেন, "ও হনূমান্ মহাশয়, ঘাট হয়েছে, ছাড়! ছাড়! ছাড়! রক্ষা কর, গরিবের প্রাণ যায়!"

তখন হনূমান্ বাবুর প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে ভূতলে স্থাপন পূর্ব্বক লাঙ্গুলপাশ হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করিলেন। অবসর পাইয়া বাবু টুপি, চসমা, চাবুক কুড়াইয়া পরিলেন। হনূমান্ বলিলেন, "মহাশয়! দুঃখিত হইবেন না। আপনার বুলি ইংরাজি, বেশ কিষ্কিন্ধ্যা এবং মুখটা পাহাড়ে রকম দেখিয়া আপনার জাতিনিরূপণার্থ আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়াছি, এক্ষণে—"

বাবু। এক্ষণে কি?

হনূ। এক্ষণে বুঝিয়াছি যে, আপনার জন্ম বঙ্গদেশীয় কোন মহিলার গর্ভে। এখন আপনি ক্লান্ত আছেন, একটা কদলী ভোজন করিবেন?

এখন বাবুজি, যেরূপ জিব শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে একটু নরম কদলী ভোজন অতি-শয় বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হইল—তিনি এখন প্রীত হইয়া উত্তর করিলেন—"With the greatest pleasure."

হনূ। আপনার যে দেশে জন্ম, কদলী এবং বার্ত্তাকু অন্বেষণে আমি মধ্যে মধ্যে সে দেশে গমন করিয়া থাকি; এবং তদ্দেশীয়া সুন্দরীগণ ষষ্ঠী মাসে যে সুস্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাও কদাপি বিনাহুমতিতে রামানুচর-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি। অতএব আমি বাঙ্গালা উত্তম বুঝি। অতএব মাতৃভাষাতেই আমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর।

বাবু। তার আশ্চর্য্য কি? আপনি কলা দিতে চাহিতেছেন? আমি অতিশয় আহ্লাদের সহিত আপনার কদলী ভক্ষণ করিব।

হনূমান্ তখন বাবু মহাশয়কে এক ছড়া কলা ফেলিয়া দিলেন। সে দেবদুর্লভ কদলী খাইয়া বাবু অতিশয় প্রীত হইলেন। হনূমান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কলা?"

বাবু। অতি মিষ্ট—delicious.

হনূ। হে টুপ্যাবৃত মহাপুরুষ! মাতৃভাষায় কথা কও।

বাবু। ওটা আমার ভুল হইয়াছে, এইবার আমাকে Excuse করুন—

হনূ। তাই বা কাকে বলে?

বাবু। আমাকে মাপ করুন—আমি বড় কি বলিব?—ইংরেজি কথাটা forgetful—তার বাঙ্গালা কি?

হনূ। বৎস! তোমার কথোপকথনে আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আরও কলা খাইতে পার। যত ইচ্ছা খাইতে পার। গাছে আছে, পাড়িয়া দিতেছি। আর আমা হইতে তোমার যদি কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তবে তাহাও আমাকে বল, আমি তৎসাধনে তৎপর হইব।

বাবু। ধন্যবাদ, হে আমার প্রিয় বানর মহাশয়! এক্ষণে আপনার প্রতি আমি অতিশয় বাধ্য বোধ করিব, আপনি যদি দয়ানুরূপে আমাকে একটি বিষয় বুঝাইয়া দেন।

হনূ। কি বিষয়, হে বিদ্বন্?

বাবু। সেই বিষয়, হনূমান্, যাহার অনুরোধে আপনার এখানে আসিয়াছি। আপনি রামরাজ্য দেখিয়াছেন। রামরাজ্যের মত রাজ্য না কি কখন হয় নাই—কেহ কেহ বলেন, সে সকল গল্প মাত্র, Fable,—

হনূ। (চক্ষু আরক্ত এবং দংষ্ট্রা বিস্তার)

রামরাজ্য গল্প! বেটা, তবে আমিও গল্প? তবে আমার এই লাঙ্গুলও একটা গল্প? দেখ, তবে কেমন গল্প!

এই বলিয়া মহাক্রোধে হনূমান্ সেই অনন্ত কুণ্ডলীকৃত মহালাঙ্গুল আবার বাবু বেচারার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। তখন বাবু বিশুষ্কবদনে বলিলেন, "থাম থাম হে মহালাঙ্গুল, তুমিও গল্প নও—তোমার লাঙ্গুল ত নহেই—সে বিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি। কাজে কাজেই তোমার রামরাজ্য গল্প নহে—The proof of the pudding is in the eating there of—

কথাটা কি, তুমি রামের দাস—আমি ইংরেজের দাস। তোমার রাম বড়, কি আমার ইংরেজ বড়? আমার ইংরেজ-রাজ্যে একটা নূতন জিনিস হইতেছে—তোমার রামরাজ্যে তা ছিল কি?

হনূ। জিনিসটা কি? সুপক্ক কদলী?

বাবু। তা না। Local self-government,

হনূ। সে কি?

বাবু। স্থানীয় আত্মশাসন। ছিল তোমাদের?

হনূ। ছিল না ত কি? স্থানীয় আত্মশাসন ত স্থানবিশেষে আত্মশাসন? তাহা আমরা সর্ব্বদাই করিতাম। আমার আত্মশাসন ছিল লাঙ্গুলে! লাঙ্গুল আমি আত্মশাসন না করিলে ত্রেতাযুগের অর্দ্ধেক লোক সমুদ্রে চুবনি খেয়ে মরিত। যখনই আমার লেজ সড় সড় করিত, ইচ্ছা হইত অমুকের গলায় দিই, তখনই আমি লাঙ্গুল-স্থানে আত্মশাসন করিতাম—লেজটাকে পদদ্বয়মধ্যে লুকায়িত করিতাম, এমন কি, যে দিন স্বয়ং রামচন্দ্র সীতাদেবীকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বলেন, সে দিন আমার এই স্থানীয় আত্মশাসন না থাকিলে—এই লাঙ্গুল রামচন্দ্রের গলাতেই যাইত—আমার স্থানীয় আত্মশাসনগুণে লেজ পদদ্বয়মধ্যে বিস্তৃত হইল। আরও আমরা যখন লঙ্কা অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম, "তখন আহারাভাবে আমাদের সকলেরই আত্মশাসন উদরে নিহিত হইয়া সে অঞ্চলে স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

বাবু। মহাশয়ের বুঝিবার ভুল হইতেছে—সেইরূপ আত্মশাসনের কথা বলিতেছি না।

হনূ। শোনই না, স্থানীয় আত্মশাসন বড় ভাল, যথা—স্ত্রীলোকের আত্মশাসন রসনায় হইলে উত্তম স্থানীয় আত্মশাসন হইল! ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আত্মশাসন শুনিয়াছি না কি, ছানা-সন্দেশের হাঁড়ীতে স্থানীয় হইলেই বড় ভাল হয়। তোমাদের আত্মশাসন—

বাবু। কোথায়? পৃষ্ঠে?

হনূ। না। তোমাদের পৃষ্ঠ শাসনাস্ত্রের ক্ষেত্র বটে। কিন্তু তোমাদের আত্মশাসনের যথার্থ ক্ষেত্র তোমাদের চক্ষু দুইটি।

বাবু। সে কি রকম?

হনূ। তোমাদের কান্না পাইলেই তোমরা কাঁদ না। সে ভাল। রাত্রিদিন ঘ্যান-ঘ্যান, প্যান-প্যান করিলে প্রভুগণ জ্বালাতন হইবার সম্ভাবনা।

বাবু। সে যাহাই হউক, আমি সে অর্থে স্থানীয় আত্মশাসনের কথা বলিতেছিলাম না।

হনূ। তবে কি অর্থে?

বাবু। শাসন কাহাকে বলে, জানেন ত?

হনূ। অবশ্য। তোমাকে চড় মারিলে তুমি শাসিত হইলে। এই ত শাসন?

বাবু। তা নয়, রাজ্যশাসন জানেন না?

হনূ। তা জানি। কিন্তু সে অর্থে, তুমি নিজে রাজা না হইলে আত্মশাসন করিবে কি প্রকারে?

বাবু। (স্বগত) একেই বলে বাঁদুরে বুদ্ধি। (প্রকাশ্যে) যদি রাজা দয়া করিয়া আপনার কাজ আমাদের কিছু ছাড়িয়া দেন?

হনূ। তা হ'লে সে রাজারই লাভ। তিনি আপনার কাজ পরের ঘাড়ে দিয়া পাটরাণী নিয়ে রঙ্গ করুন, আর আমরা তাঁর খাটুনি খেটে মরি। এই বুঝি তোমাদের রামরাজ্য? হা রাম!

বাবু। কথাটা এখনও আপনার বোধ হয় নাই। Freedom—liberty কাহাকে বলে, জানেন?

হনূ। কিষ্কিন্ধ্যার কলেজ ও সব শিখায় না।

বাবু। freedom বলে স্বাধীনতাকে। স্বাধীনতা কাহাকে বলে, জানেন ত?

হনূ। আমি বনের পশু, স্বাধীনতা জানি না ত কি তুমি জান?

বাবু। ভাল। তা যে পরিমাণে মনুষ্য স্বাধীন হইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

হনূ। অর্থাৎ যে পরিমাণে মনুষ্য পশুভাব প্রাপ্ত হইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

বাবু। মহাশয়! রাগ করিবেন না; কিন্তু এ কথাগুলি নিতান্ত হনূমানের মত হইয়াছে।

হনূ। আমি ত তাহাই, বাবুর মত কথাগুলি কি শুনি।

বাবু। স্বাধীনতাশূন্য মনুষ্য-জন্মই পশু-জন্ম। পরাধীনেরা গো-মহিষাদির ন্যায় রজ্জুবদ্ধ হইয়া তাড়িত হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের রাজ-পুরুষেরা আজন্ম স্বাধীন—free-bron.

হনু। আমাদের মত।

বাবু। আত্মশাসন সেই স্বাধীনের লক্ষণ।

হনু। আমরাও সেই লক্ষণবিশিষ্ট। আমাদের মধ্যে আত্মশাসন ভিন্ন রাজশাসন নাই। আমরা পৃথিবীমধ্যে স্বাধীন জাতি। তোমরা কি আমাদের মত হ'তে চাও?

বাবু। ছি! ছি! বুঝিলাম, বাঁদরে আত্মশাসন বুঝিতে পারে না।

হনু। ঠিক কথা ভাই, আইস, দুই জনে। কদলী ভোজন করি।

গ্রাম্য কথা

প্রথম সংখ্যা, পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়।

টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আমি ছাতি মাথায়, গ্রাম্য পথ দিয়া হাঁটিতেছি। বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিল। তখন পথের ধারে একখানা আটচালা দেখিয়া তাহার পয়চালার নীচে আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, ভিতরে কতকগুলি ছেলে বই হাতে বসিয়া পড়িতেছে। এক জন পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পড়াইতেছেন। কান পাতিয়া একটু পড়ানটা শুনিলাম। দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ। একটু উদাহরণ দিতেছি। পণ্ডিত মহাশয় এক জন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কি হয়?"

ছাত্রটি কিছু মোটা বুদ্ধি, নাম শুনিলাম ভোঁদা। ভোঁদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আজ্ঞা, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভুক্ত হয়।"

পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের মূর্খতা দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে "মূর্খ!" "গর্দ্দভ!" প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত বাক্যে অলংকৃত করিলেন। ছাত্রও কিছু গরম হইয়া উঠিল, বলিল, "কেন পণ্ডিত মহাশয়! ভুক্ত শব্দ কি নাই?"

পণ্ডিত। থাকিবে না কেন? ভুক্ত কিসে হয়, তা কি জানিস্ না?

ছাত্র। না, জানব না কেন? ভাল করিয়া চিবিয়া গিলিয়া ফেলিলেই ভুক্ত হয়।

পণ্ডিত। বেল্লিক! বানর! তাই কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি?

তখন ভোঁদার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ছাত্র রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল রাম, তুমিই বল দেখি, ভুক্ত শব্দ কি প্রকারে হয়?"

রাম বলিল, "আজ্ঞা, ভুজ ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া ভুক্ত হয়।"

পণ্ডিত মহাশয় ভোঁদাকে বলিলেন, "শুন্‌লি রে ভোঁদা! তোর কিছু হবে না।"

ভোঁদা রাগিয়া বলিল, "না হয় না হোক—আপনার যেমন পক্ষপাত।"

পণ্ডিত। পক্ষপাত আবার কি রে হনূমান্?

ভোঁদা। ওর কপালে "ভুজো", আমার কপালে ভূ?

ছাত্র যে সুচর্ব্বণীয় "ভুজো" এবং অদৃষ্টের তারতম্য স্মরণ করিয়া অভিমান করিয়াছে, পণ্ডিত মহাশয় তাহা বুঝিলেন না। রাগ করিয়া ভোঁদাকে এক ঘা প্রহার করিলেন এবং আদেশ করিলেন, "এখন বল্ ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি হয়?"

ভোঁদা। (চোখে জল) আজ্ঞে, তা জানি না।

পণ্ডিত। জানিস্ নে? ভূত কিসে হয়, জানিস্ নে?

ভোঁদা। আজ্ঞে, তা জানি। মলেই ভূত হয়।

পণ্ডিত। শূওর! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভূত হয়।

ভোঁদা এক্ষণে বুঝিল। মনে মনে স্থির করিল, মরিলেও যা হয়, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে তা হয়। তখন সে বিনীতভাবে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে, ভূ ধাতুর ক্ত করিলে কি শ্রাদ্ধ করিতে হয়?"

পণ্ডিত মহাশয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না, বিরাশী সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। ছাত্র পুস্তকাদি ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিয়া গেল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছিল, রঙ্গ দেখিবার জন্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ভোঁদার মাতার গৃহ বিদ্যালয় হইতে বড় বেশী দূর নয়। ভোঁদা গৃহপ্রবেশকালে কান্নার স্বর দ্বিগুণ বাড়াইল এবং আছাড়িয়া পড়িল। দেখিয়া ভোঁদার মা তার কাছে এসে সাথনায় প্রবৃত্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে বাবা?"

ছেলে মাকে জেজ্ঞাসিয়া বলিল, "এখন আমি

হয়েছে বাবা! এমন স্কুলে আমায় পাঠাইয়াছিলি কেন পোড়ারমুখী?”

মা। কেন, কি হয়েছে, বাবা?

ছেলে। পোড়ারমুখী এখন বলেন, কি হয়েছে বাবা! শীগ্‌গীর তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক। শীগ্‌গীর হোক! আমি তোর শ্রাদ্ধ করি।

মা। সে আবার কি বাপ! কাকে বলে?

ছেলে। শীগ্‌গীর তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক। শীগ্‌গীর হোক্‌।

মা। সে কি মরাকে বলে বাপ?

ছেলে। তা না ত কি? আমি তাই বল্‌তে পারি নাই ব’লে পণ্ডিত মশাই আমায় মেরেছে।

মা। অধঃপেতে মিন্‌সে! আক্কেল নেই! আমার এই এক রত্তি ছেলে, আর কত বিদ্যা হবে। যে কথা কেউ জানে না, তাই বল্‌তে পারে নি ব’লে ছেলেকে মার! আজ মিন্‌সেকে আমি একবার দেখ্‌বো।

এই বলিয়া গাছ-কোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা পণ্ডিতমহাশয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন। আমিও পিছু পিছু চলিলাম। সেই স্বপুত্রবতীকে অধিক দূর যাইতে হইল না। তখন পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিতমহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। তখন ভোঁদার মা বলিল, “হাঁ গা পণ্ডিত মহাশয়, যা কেউ জানে না, আমার ছেলে তাই বল্‌তে পারে নি ব’লে কি এমন মার মারতে হয়?”

পণ্ডিত। ওগো, এমন কিছু শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ভূত কেমন ক’রে হয়?

ভোঁদার মা। ভূত হয় গলা না পেলেই। তা ও সব কথা ও ছেলেমানুষ কেমন ক’রে জানবে গা? ও সব কথা আমাদের জিজ্ঞাসা কর।

পণ্ডিত। ওগো, সে ভূত নয় গো।

ভোঁদার মা। তবে কি গোভূত?

পণ্ডিত। সে সব কিছু নয় গো, তুমি মেয়েমানুষ কি বুঝবে? বলি, একটা ভূত শব্দ আছে।

ভোঁদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনেছি, তা ও ছেলেমানুষ, ওকে কি ও সব কথা ব’লে ভয় দেখাতে আছে?

আমি দেখিলাম যে, এ পণ্ডিতে পণ্ডিতে সমস্যা, মিটিবে না। আমি এ মজের অংশ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, “মহাশয়, ও স্ত্রীলোক, ওর সঙ্গে বিচার ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে বরং এ বিষয়ের কিছু বিচার করুন।”

পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া, একটু সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, “আপনি প্রশ্ন করুন।”

আমি বলিলাম, “আচ্ছা, ভূত ভূত করিতেছেন, বলুন দেখি ভূত কয়টি?”

পণ্ডিত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “ভাল, ভাল। পণ্ডিত পণ্ডিতের মত কথা কয়! শুন্‌লি মাগী?” তার পর আমার দিকে ফিরিয়া, এমনই মুখখানা করিলেন, যেন বিদ্যার বোঝা নামাইতেছেন। বলিলেন, “ভূত পাঁচটি।”

তখন ভোঁদার মা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, “তবে রে মিন্‌সে? তুই এই বিদ্যায় আমার ছেলে মারিস্! ভূত পাঁচটা! পাঁচ ভূত না বারো ভূত?”

পণ্ডিত। সে কি, বাছা! ও ঠাকুরটিকে জিজ্ঞাসা কর, ভূত পঞ্চ। ক্ষিত্যপ—

ভোঁদার মা। বারো ভূত নয় তো আমার এতটা বিষয় খেলে কে? আমি কি এমনই দুঃখী ছিলাম?

ভোঁদার মা তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তখন তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক বলিলাম, “উনি যা বলিলেন, তা হ’তে পারে। অনেক সময়েই শুনা যায়, অনেকের বিষয় লইয়া ভূতগণ আপনাদিগের পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করে। কখন শোনেন নাই, অমুকের টাকাটায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতেছে?”

কথাটা শুনিয়া, পণ্ডিত মহাশয় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, আমি ব্যঙ্গ করিতেছি, কি সত্য বলিতেছি। কেন না, বুদ্ধিটা কিছু স্থূল। তাঁকে একটু ভেকপানা দেখিয়া আমি বলিলাম, “মহাশয়, এ বিষয়ের প্রমাণ-প্রয়োগ ত সকলই অবগত আছেন। মনু বলিয়াছেন,—

“কৃপণানাং ধনঞ্চৈব পোষ্যকুষ্মাণ্ডপালিনাম্।
ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ॥”*

পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃতজ্ঞান ঐ ভূ ধাতুর উপর ক্ত পর্য্যন্ত। কিন্তু এ দিকে বড় ভয়, পাছে সেই শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে, বিশেষতঃ ভোঁদার মার সম্মুখে

---

* অস্যার্থঃ—কৃপণদিগের ধন আর যাঁহারা পোষ্যপুত্ররূপ কুষ্মাণ্ডগুলি প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগের ধন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

আমার কাছে পরাস্ত হয়েন। অতএব যেমন শুনিলেন, "মৃতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ" অমনই উত্তর করিলেন, "মহাশয়, যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন। বেদেই ত আছে, 'অস্তি গোদাবরী-তীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ'।" শুনিয়া ভোঁদার মা বড় তুষ্ট হইল এবং পণ্ডিত মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিল, "তা বাবা! তোমার এত বিদ্যা, তবু আমার ছেলেকে মার কেন?"

পণ্ডিত। আরে বেটি, তোর ছেলেকে এমনই বিদ্বান্ করিব বলিয়াই ত মারি। না মারিলে কি বিদ্যা হয়?

ভোঁদার মা। বাবা! মারিলে যদি বিদ্যা হয়, তবে আমাদের বাড়ীর কর্ত্তাটির কিছু হলো না কেন, ঝাঁটার বল, কোস্তার বল, আমি ত কিছু-তেই কসুর করি না।

পণ্ডিত। বাছা! ও সব কি তোদের হাতে হয়! ও আমাদের হাতে!

ভোঁদার মা। বাবা! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসুর নাই। দেখিবে?

এই বলিয়া ভোঁদার মা একগাছা বাখারী কুড়াইয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয় এরূপ হঠাৎ অধিক বিদ্যালাভের সম্ভাবনা দেখিয়া সেখান হইতে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে প্রস্থান করিলেন। শুনিয়াছি, সেই অবধি পণ্ডিত মহাশয় আর ভোঁদাকে কিছু বলেন নাই। ভূ ধাতু লইয়া পাঠশালায় আর গোলযোগ হয় নাই। ভোঁদা বলে, "মা এক বাখারীতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূতছাড়া করিয়াছে।"

গ্রাম্য কথা

দ্বিতীয় সংখ্যা।—ধর্ম্ম-শিক্ষা।

THEORY

"পড় বাবা, মাতৃবৎ পরদারেষু।"

ছেলে। সে কাকে বলে বাবা?

বাপ। এই যত স্ত্রীলোক—পরের স্ত্রী, সবাইকে আপনার মা মনে করিতে হয়।

ছেলে। তারা সবাই আমার মা?

বাপ। হাঁ বাবা, তা বৈ কি।

ছেলে। বাবা, তবে তোমার বড় আপদ হলো। আমার মা হ'লে তারা তোমার কে হলো, বাবা?

বাপ। ছি ছি! ছি! অমন কথা কি বলতে আছে! পড়।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।"

ছেলে। অর্থ কি হলো বাবা?

বাপ। পরের সামগ্রীকে লোষ্ট্রের মত দেখবে।

ছেলে। লোষ্ট্র কি?

বাপ। মাটির ঢেলা।

ছেলে। বাবা, তবে ময়রা বেটাকে আর সন্দেশের দাম না দিলেও হয়। মাটির ঢেলার আর দাম কি?

বাপ। তা নয়। পরের সামগ্রী মাটির মত দেখবে—নিতে যেন ইচ্ছা না হয়।

ছেলে। বাবা, কুমারের ব্যবসা শিখলে হয় না?

বাপ। ছি বাবা! তোমার কিছু হবে না দেখছি। এখন পড়—

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥"

ছেলে। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কি বাবা?

বাপ। এই আপনার মত সকলকেই দেখবে।

ছেলে। তা হইলেই তা হলো। যদি পরকে আপনার মত ভাবি, তা হ'লে পরের সামগ্রীকে আপনারই সামগ্রী ভাবতে হবে, আর পরের স্ত্রীকেও আপনার স্ত্রী ভাবতে হবে।

বাপ। দূর হ! পাজি বেটা—ছুঁচো বেটা (ইতি চপেটাঘাত)

II. PRACTICE.

(১)

কাদম্বিনী নাম্নে কোন প্রৌঢ়া কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছে। তখন অষ্টমবর্ষীয় একটি বালক তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ছেলে। বলি, মা!

কাদম্বিনী। কেন, বাছা! আহা, ছেলেটির কি মিষ্ট কথা গো! কান জুড়ায়।

ছেলে। মা, সন্দেশ খেতে একটা পয়সা দে না মা!

কাদম্বিনী। বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, পয়সা কোথা পাব বাবা?

ছেলে। মিথ্যে বেটি? দুখপুকী! ছেঁড়াভাতি! কাঁড়হুকী!

কাদ। আ মলো! কাদের এমন পোড়ার-মুখো ছেলে!

ছেলে। দিবিনে বেটি! (ইতি প্রহার এবং কলসী ধ্বংস)

(পরে ছেলের বাপ সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত)

বাপ। এ কি রে বাঁদর?

ছেলে। কেন, বাবা! এ যে আমার মা। মার সঙ্গে যেমন করি, ওর সঙ্গেও তেমন করেছি, "মাতৃবৎ পরদারেষু।" কই মাগি, -বাবাকে দেখে তুই ঘোমটা দিলি নে?

(২)

ময়রা আসিয়া ছেলের বাপের কাছে নালিশ করিল যে, ছেলের জ্বালায় আর দোকান করা ভার। ছেলে দোকান লুঠ করিয়া সকল মিঠাই-মণ্ডা লইয়া আসে। গোয়ালা আসিয়া ক্ষীর-ছানা সম্বন্ধে সেইরূপ নালিশ করিল।

বাপ তখন ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার আরম্ভ করিলেন। ছেলে বলিল, "মার কেন বাবা?"

বাপ। মারব না? তুই পরের দ্রব্যসামগ্রী লুটে-পুটে আনিস।

ছেলে। বাবা, চোরের ভয় হয়েছে, তাই ঢিল কুড়িয়ে জমা করেছি—পরের সামগ্রী ত ঢিল।

(৩)

সরস্বতীপূজা উপস্থিত। বাপ প্রাতঃকালে ছেলেকে বলিলেন, "যা, একটা ডুব দিয়ে এসে অঞ্জলি দে— নহিলে খেতে পাবি নে।"

ছেলে। খেয়ে বিকালে অঞ্জলি দিলে হয় না?

বাপ। তাও কি হয়! খেলে কি অঞ্জলি দেওয়া হয় রে পাগল?

ছেলে। তবে এ বছরের অঞ্জলি আর বছর একেবারে দিলে হয় না? এবার বড় শীত।

বাপ। তা হয় না—সরস্বতীকে অঞ্জলি না দিলে কি বিদ্যা হয়?

ছেলে। একটা বছর কি ধারে বিদ্যে হয় না?

বাপ। দূর মূর্খ! না, ডুব দিয়ে আস্ গে যা। অঞ্জলি দেওয়া হ'লে ছুটো ভাল সন্দেশ দেব এখন।

"আচ্ছা" বলিয়া ছেলে নাচিতে নাচিতে ডুব দিতে গেল। বড় শীত—তেমনি বাতাস—জল কন্‌কনে। তখন ছেলে ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘাটে একটা পাঁচ বছরের বাগদীর ছেলে রহিয়াছে দেখিয়া, তাহাকে ধরিয়া, গোটা দুই চুবনি দিল। তার পর তাহাকে জল হইতে তুলিয়া টানিয়া বাপের কাছে ধরিয়া আনিল, "বাবা! নেয়ে এসেছি।"

বাপ। কই বাপু,—কই নেয়েছ?

ছেলে। এই বাগদী ছোঁড়াটাকে চুবিয়ে এনেছি।

বাপ। বড় কাজই করেছ—তুই নেয়ে এসেছিস্ কই?

ছেলে। বাবা "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" ওতে আমাতে কি তফাৎ আছে? ওর নাওয়াতেই আমার নাওয়া হয়েছে। এখন সন্দেশ দাও।

পিতা বেত্রহস্তে পুত্রের পিছু পিছু ছুটিলেন। পুত্র পলাইতে পলাইতে বলিতে লাগিল, "বাবা শাস্ত্র জানে না।"

কিছু পরে সেই সুশিক্ষিত বালকের পিতা শুনিলেন যে, সে ও পাড়ার শিরোমণি ঠাকুরের টোলে গিয়া শিরোমণি ঠাকুরকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়াছে। ছেলে ঘরে এলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার এ কি করেছিস্?"

ছেলে। কি করি বাবা! তুমি ত ছাড়বে না—বেত মারিবেই মারিবে, তাই আপনা আপনি সেই বেত খেয়েছি।

পিতা। সে কি রে বেটা? আপনা আপনি কি? শিরোমণি ঠাকুরকে মেরেছিস্ যে।

ছেলে। বাবা আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু—শিরোমণি ঠাকুরে আর আমাতে কি আমি তফাৎ দেখি?

পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ছেলেকে আর লেখাপড়া শিখাইবেন না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর

—•—

DRAMATIS PERSONÆ,

১। উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু।

২। তস্য ভার্য্যা।

উচ্চশিক্ষিত। কি হয়?

ভার্য্যা। পড়ি শুনি।

উচ্চ। কি পড়?

ভার্য্যা। যা পড়িতে জানি। আমি তোমার ইংরাজিও জানি না, ফারসীও জানি না, ভাগ্যে যা আছে, তাই পড়ি।

উচ্চ। ছাই-ভস্ম বাঙ্গালাগুলো পড় কেন? ওর চেয়ে না পড়া ভাল যে।

ভার্য্যা। কেন?

উচ্চ। ওগুলো সব immoral obscene, filthy.

ভার্য্যা। সে সব কাকে বলে?

উচ্চ। immoral কাকে বলে জান—এই ইয়ে হয় অর্থাৎ যা moralityর বিরুদ্ধ।

ভার্য্যা। সেটা কি চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ?

উচ্চ। না না—এই কি জান—ওর আর বাঙ্গালা কোথা পাব? এই যা moral নয়—তাই আর কি?

ভার্য্যা। মরাল কি রাজহংস?

উচ্চ। ছি ছি! O woman! thy name is stupidity.

ভার্য্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। বাঙ্গালা কথায় ত আর অত বুঝান যায় না—তবে আসল কথাটা এই যে, বাঙ্গালা বই পড়া ভাল নয়।

ভার্য্যা। তা, এই বইখানা নিতান্ত মন্দ নয়, গল্পটা বেশ।

উচ্চ। এক রাজা আর দুয়ো সুয়ো দুই রাণীর গল্প? না নল-দময়ন্তীর গল্প?

ভার্য্যা। তা ছাড়া কি গল্প হ'তে নেই?

উচ্চ। তা ছাড়া তোমার বাঙ্গালায় আর কিছু আছে না কি?

ভার্য্যা। এটা তা নয়। এতে কাটলেট আছে, ব্রাণ্ডি আছে, বিধবার বিবাহ আছে—বৈষ্ণবীর গীত আছে।

উচ্চ। Exactly, তাই ত বল্‌ছিলাম, ও ছাইভস্মগুলো পড় কেন?

ভার্য্যা। কেন, পড়িলে কি হয়?

উচ্চ। পড়িলে demoralize হয়।

ভার্য্যা। সে আবার কি? যেমোরাজা হয়?

উচ্চ। এমন পাপও আছে! demoralize, কি না—চরিত্র মন্দ হয়।

ভার্য্যা। স্বামী মহাশয়! আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ডি মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া ও কাজ হয়, তারা এমনই কুচরিত্রের লোক যে, তাদের মুখ দেখিলেও পাপ আছে। আপনার বন্ধুবর্গ ডিনারের পর যে ভাবার কথাবার্ত্তা কন—শুনিতে পাইলে খানসামারাও কানে আঙ্গুল দেয়। আপনি যাদের বাড়ী মুরগি-মটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে, তাহারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্ত কোন ভয় নাই—আর আমি গরীবের মেয়ে, একখানা বাঙ্গালা বই পড়িলেই গোল্লায় যাব?

উচ্চ। আমরা হলেম Brass pot, তোমরা হলে Earthen pot.

ভার্য্যা। অত পটপট কর কেন? কইমাছ ছাঁকা তেলে পড়েছে নাকি? তা হোক, একবার এই বইখানা একটু পড় না।

উচ্চ। (শিহরিয়া ও পিছাইয়া) আমি ও সব ছুঁয়ে hand contaminate করি না।

ভার্য্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। ও সব ছুঁয়ে হাত ময়লা করি না।

ভার্য্যা। তোমার হাত ময়লা হবে না, আমি ঝাড়িয়া দিতেছি।

(ইতি পুস্তকখানি আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান। মানসিক ময়লা ভয়ে ভীত উচ্চশিক্ষিতের হস্ত হইতে পুস্তকের ভূমে পতন।)

ভার্য্যা। ও কপাল! আচ্ছা, তুমি যে বইখানাকে অত ঘৃণা করুচো, কই, তোমার ইংরেজেরাও তত করে না। ইংরেজে নাকি এই বইখানা তরজমা করিয়া পড়িতেছে।

উচ্চ। ক্ষেপেছ?

ভার্য্যা। কেন?

উচ্চ। বাঙ্গালা বই ইংরেজিতে তরজমা? এমন আষাঢ়ে গল্প তোমায় কে শোনায়? বইখানা sidi-tious ত নয়? তা হ'লে Government তরজমা করান সম্ভব। কি বই ওখানা?

ভার্য্যা। বিষবৃক্ষ।

উচ্চ। সে কাকে বলে?

ভার্য্যা। বিষ কাহাকে বলে, জান না? তারই বৃক্ষ।

উচ্চ। বিষ, এক কুড়ি।

ভার্য্যা। তা নয়, আর এক রকমের বিষ আছে, জান না? যা তোমার জ্বালায় আমি এক দিন খাব।

উচ্চ। ও হো Poison! Dear me! তারই গাছ—উপযুক্ত নাম বটে—কেন! কেন!

ভার্য্যা। এখন গাছের ইংরেজি কি বল দেখি?

উচ্চ। Tree,

ভার্য্যা। এখন দুটা কথা এক কর দেখি?

উচ্চ। Poison Tree! ওহো বটে বটে! Poison Tree-বলিয়া একখান ইংরেজি বইয়ের

কথা কাগজে পড়িতেছিলাম বটে। তা সেখানা কি বাঙ্গালা বইয়ের তরজমা ?

ভার্য্যা। তোমার বোধ হয় কি ?

উচ্চ। আমার Idia ছিল যে, Poison Tree একখানা ইংরেজি বই, তারই বাঙ্গালা তরজমা হয়েছে। তা যখন ইংরেজি আছে, তখন আর বাঙ্গালা পড়বে কেন ?

ভার্য্যা। পড়াটা ইংরেজি রকমেই ভাল—তা কেতাব নিয়েই হোক, আর গেলাস নিয়েই হোক, তা তোমাকে ইংরেজি রকমেই পড়িতে দিয়েছি। এই বইখানা দেখ দেখি। এখানা ইংরেজির তরজমা —লেখক নিজে বলিয়াছেন।

উচ্চ। ও সব বরং পড়া ভাল। কি ইংরেজির বইয়ের তরজমা Robinson Crusoe না Watt on the Improvement of the mind ?

ভার্য্যা। ইংরেজি নাম আমি জানি না, বাঙ্গালা নাম ছায়াময়ী।

উচ্চ। ছায়াময়ী ? সে আবার কি ? দেখি (পুস্তক হস্তে লইয়া) Dante by fove.

ভার্য্যা। (টিপি টিপি হাসিয়া) তা ওখানা ভাল বুঝিতে পারি না—পোড়া বাঙ্গালীর মেয়ে, ইংরেজির তরজমা বুঝি, এত বুদ্ধি ত রাখিনে—ওটা তুমি আমায় বুঝিয়ে দেবে ?

উচ্চ। তার আর আশ্চর্য্য কি ? Dante lived in the fourteenth century অর্থাৎ তিনি fourteenth centuryতে flourish করেন।

ভার্য্যা। ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করেন ? এত বড় কবি ?

উচ্চ। কি পাপ ! fourteen মানে চৌদ্দ।

ভার্য্যা। চৌদ্দ সুন্দরীকে পালিশ করেন ? তা চৌদ্দই হোক, আর পনরই হোক, সুন্দরীকে আবার পালিশ করা কেন ?

উচ্চ। বলি, চৌদ্দ সেঞ্চুরিতেই বর্ত্তমান ছিলেন।

ভার্য্যা। তিনি চৌদ্দ সুন্দরীতে বর্ত্তমান থাকুন, আর চৌদ্দ শ সুন্দরীতেই বর্ত্তমান থাকুন, বইখানা কিসের কথা।

উচ্চ। আগে অথরের লাইফটা জান্‌তে হয়। তিনি Florence নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানে বড় বড় appointment hold করিতেন।

ভার্য্যা। পোটম্যান্টো হলদে করিতেন। আমাদের এই কালো পোটম্যান্টোটা হলদে হয় না ?

উচ্চ। বলি, বড় বড় চাকরি করিতেন। পরে Guelph ও Ghibilljne দিগের বিবাদে—

ভার্য্যা। আর হাড় জালিও না, বইখানা একটু বুঝাও না।

উচ্চ। তাই বুঝাইতেছিলাম। অথরের লাইফ না জানিলে বই বুঝিবে কি প্রকারে ?

ভার্য্যা। আমি দুঃখী বাঙ্গালীর মেয়ে, আমার অত ঘটার কাজ কি ? বইখানার মর্ম্মটা বুঝাইয়া দাও না।

উচ্চ। দেখি, বইখানা কি রকম লিখেছে দেখি,

(পরে, পুস্তক গ্রহণ করিয়া প্রথম ছত্র পাঠ)

"সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কালিমা"

তোমার কাছে অভিধান আছে ?

ভার্য্যা। কেন, কোন্ কথাটা ঠেকিল ?

উচ্চ। গগন কাকে বলে ?

ভার্য্যা। গগন বলে আকাশকে।

উচ্চ। "সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কালিমা"—নিবিড় কাহাকে বলে ?

ভার্য্যা। ও হরি ! এই বিদ্যাতে তুমি আমাকে শিখাবে ? নিবিড় বলে ঘনকে। এও জান না ? তোমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে না ?

উচ্চ। কি জান, বাঙ্গালা-কাঙ্গালা ও সব ছোট লোকে পড়ে, ও সব আমাদের মাঝখানে চলন নেই। ও সব কি আমাদের পোষা পায় ?

ভার্য্যা। কেন, তোমরা কি ?

উচ্চ। আমাদের হলো polished society —ও সব বাজে লোকে লেখে, বাজে লোকে পড়ে —সাহেব লোকের কাছে দর নেই—polished societyতে কি ও সব চলে ?

ভার্য্যা। তা মাতৃভাষার উপর পালিশ বাবুর এত রাগ কেন ?

উচ্চ। আমার মা ম'রে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন—তাঁর ভাষার সঙ্গে এখন আর সম্পর্ক কি ?

ভার্য্যা। আমারও ত ঐ ভাষা—আমি ত ম'রে ছাই হই নাই।

উচ্চ। yes for thy sake, my jewel, I shall do it—তোমার খাতিরে একখানা বাঙ্গালা বই পড়িব। কিন্তু mind, একখানা বৈ আর নয়।

ভার্য্যা। তাই মন্দ কি ?

উচ্চ। কিন্তু এই ঘরে দ্বার দিয়ে পড়ব—কেহ না টের পায়।

ভার্য্যা। আচ্ছা, তাই।

(বাছিয়া বাছিয়া এরকম অশ্লীল এবং কুরুচিপূর্ণ অথচ সরল পুস্তক স্বামীর হস্তে প্রদান, স্বামীর তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ সমাপন।)

ভার্য্যা। কেমন

স্বামী। বেড়ে। বাঙ্গালায় যে এমন বই হয়, তা আমি জানিতাম না।

ভার্য্যা। (ঘৃণার সহিত) ছি! এই বুদ্ধি তোমার পার্লিশ বাজী? তোমার পার্লিশ বজীর চেয়ে আমার চাপড়াবজী, শীতলবজী অনেক ভাল।

NEW YEARS' DAY.

Dramatis Personæ

শ্যাম বাবু।

রাম বাবু।

রাম বাবুর স্ত্রী (পাড়াগেঁয়ে মেয়ে)

(রাম বাবু ও শ্যাম বাবুর প্রবেশ)

(রাম বাবুর স্ত্রী অন্তরালে)

শ্যাম বাবু। গুডমর্ণিং রাম বাবু—হা ডু ডু?

রাম বাবু। গুডমর্ণিং শ্যাম বাবু—হা ডু ডু?

(উভয়ের প্রগাঢ় করমর্দন)

রাম বাবু। I wish you a happy new year and many many returns of the same.

শ্যাম বাবু। The same to you.

(শ্যাম বাবুর তথাবিধ কথাবার্ত্তার জন্য অন্যত্র প্রস্থান ও রাম বাবুর অন্তঃপুর প্রবেশ)

রাম বাবুর স্ত্রী। ও কে এসেছিল?

রাম বাবু। ঐ ও বাড়ীর শ্যাম বাবু।

স্ত্রী। তা তোমাদের হাতাহাতি হচ্ছিল কেন?

রাম বাবু। সে কি, হাতাহাতি কখন্ হ'ল?

স্ত্রী। ঐ যে, তুমি তার হাত ধ'রে বেঁকুরে দিলে, সে তোমার হাত ধ'রে বেঁকুরে দিলে? তোমার লাগে নি ত?

রাম। তাই হাতাহাতি! কি পাপ! ওকে বলে shakings hands, ওটা আদরের চিহ্ন।

স্ত্রী। বটে, ভাগ্যে আমি তোমার আদরের পরিবার নই! তা তোমার লাগে নি ত?

রাম। একটু নোক্‌সা লেগেছে, তা কি করতে আছে?

স্ত্রী। আহা, তাই ত! মুচ্‌কে গেছে যে! অদ্য-পেতে ভাল করা দিলে! সকালবেলা কাপড় আমার বাড়ীতে হাত-কাড়াকাড়ি করতে এসেছেন! আমার নাকি ছটোছটী খেলা হবে? অল্পপেতে, ছিলেদের সঙ্গে ও সব খেলা খেলিতে পারে না।

রাম। সে কি? তোমার কথা কখন্ হ'ল?

স্ত্রী। ঐ যে যেও বল্লে, "হাডু ডু ডু।" তুমিও বল্লে হাডু ডু ডু। তা, হাঁ ডু ডু ডু খেল্‌বার কি আর তোমাদের বয়স আছে?

রাম। আঃ, পাড়াগেঁয়ের হাতে প'ড়ে প্রাণটা গেল। ওগো, হাঁ ডু ডু ডু নয়, হাঁ ডু ডু—অর্থাৎ how do ye do? উচ্চারণ করিতে হয়, হাঁ ডু ডু।

স্ত্রী। তার অর্থ কি?

রাম। তার মানে তুমি কেমন আছ?

স্ত্রী। তা কেমন ক'রে হবে? সে তোমায় জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কেমন আছ, তুমি ত কৈ তার কোন উত্তর দিলে না,—তুমি সেই কথাই পাল্‌টিয়া বলিলে।

রাম। সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্য-রীতি।

স্ত্রী। পাল্‌টে বলাই সভ্য-রীতি? তুমি যদি আমার ছেলেকে বল, লেখাপড়া করিস্ নে কেন রে ছুঁচো? সেও কি তোমাকে পাল্‌টে বল্‌বে, লেখাপড়া করিস্ নে কেন রে ছুঁচো? এইটা কি সভ্যরীতি?

রাম। তা নয় গো, তা নয়। কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর না দিয়া পাল্‌টে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কেমন আছ। এইটা সভ্যরীতি।

স্ত্রী। (যোড়হাতে) আমার একটি ভিক্ষা আছে। তোমার ছবেলা অসুখ—আমায় দিনে পাঁচবার তোমার কাছে খবর নিতে হয়, তুমি কেমন আছ। আমায় যেন তখন হা ডু ডু বলিয়া তাড়াইয়া দিও না! আমার কাছে সভ্য নাই হইলে।

রাম। না, না, তাও কি হয়? তবে এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল।

স্ত্রী। তা ব'লে দিলেই জানতে পারি। বুঝিয়ে দাও না? আচ্ছা, শ্যাম বাবু এলো আর কিচির-মিচির ক'রে বল্লে আর চ'লে গেল। যদি হাঁ ডু ডু ডু খেলার কথা বলতে আসে নি, তবে কি করতে এসেছিল?

রাম। আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন, তাই বৎসরের আশীর্বাদ করতে এসেছিল।

স্ত্রী। আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন? আমার শ্বশুর-শাশুড়ী ত ১লা বৈশাখ থেকে নূতন বৎসর ধরিতেন।

রাম। আজ ১লা জানুয়ারী—আমরা আজ থেকে নূতন বৎসর ধরি।

স্ত্রী। শ্বশুর ধরিতেন ১লা বৈশাখ থেকে, তুমি ধর ১লা জানুয়ারী থেকে, আমার ছেলে বোধ করি ধরিবে ১লা শ্রাবণ থেকে।

রাম। তাও কি হয়? এ যে ইংরেজের মুলুক—এখন ইংরেজি নূতন বৎসরে আমাদের নূতন বৎসর ধরিতে হয়।

স্ত্রী। তা ভালই ত, তা নূতন বৎসর ব'লে এতগুলা মদের বোতল আনিয়েছ কেন?

রাম বাবু। সুখের দিন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমোদ করে খেতে দেতে হ'য়।

স্ত্রী। তবু ভাল। আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমাদের বৎসর-কাবারে বুঝি এই রকম কলসী উৎসর্গ করতে হয়। ভাবছিলাম, বলি বারণ করব যে, আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর উদ্দেশে ও সব দিও না।

রাম। তুমি বড় নির্বোধ।

স্ত্রী। তা ত বটে! তাই আরও কথা জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাই।

রাম। আবার কি জিজ্ঞাসা করিবে?

স্ত্রী। এত কপি, শালগম, গাজর, বেদানা, পেস্তা, আঙ্গুর, ভেটকিমাছ সব আনিয়েছ কেন? খেতে কি এত লাগবে?

রাম। না। ও সব সাহেবদের ডালি সাজিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রী। ছি, ছি, এমন কর্ম্ম করো না। লোকে বড় কুকথা বলবে।

রাম। কি কথা বলিবে?

স্ত্রী। বলবে, এদের বৎসর কাবারে কলসী উৎসর্গও আছে, চোদ্দপুরুষকে ভুজ্যি উৎসর্গ করাও আছে

[ইতি প্রহারভয়ে গৃহিণীর বেগে প্রস্থান।

(রাম বাবুর উকীলের বাড়ী গমন এবং হিন্দুর divorce হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা)।

সম্পূর্ণ